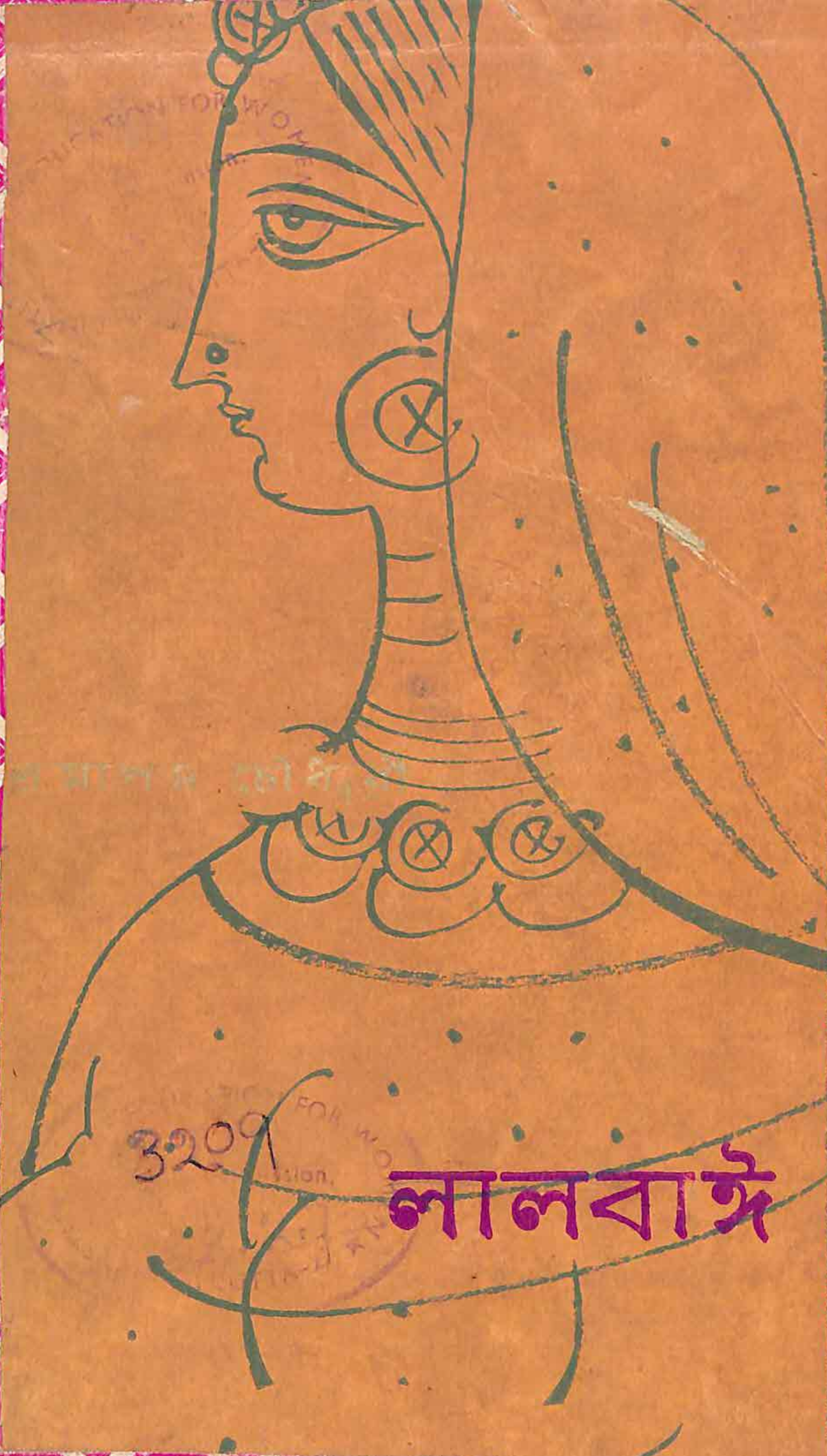


লালবাঈ

धर्म्मार्थकाममोक्षाणाम् उपदेशसमन्वितम् ।
पुरावृत्तकथायुक्तं इतिहासं प्रचक्षते ॥

ভূমিকা

'লালবাঈ' ইতিহাস নয়, উপন্যাস। যাঁরা এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস জানতে আগ্রহী, কিংবা যাঁরা নিজেরাই বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক, তাঁদের জন্যে এ বই লেখা হয় নি। তা সত্ত্বেও প্রতিটি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যরস ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই অধুনাপ্রাপ্য নূতন তথ্যের আলোকে কিছু সংশোধনও করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যরসই আমার কাছে প্রধান, তাই স্থানবিশেষে ইতিহাসকে নির্দয়ভাবে উপেক্ষা করেছি।

—লেখক

লালবাঈ

রমাপদ চৌধুরী

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ	: ১লা	বৈশাখ	১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ	: ১৫ই	শ্রাবণ	১৩৬৩
তৃতীয় মুদ্রণ	; ১৫ই	অগ্রহায়ণ	১৩৬৩
চতুর্থ সংস্করণ	: ২৭শে	বৈশাখ	১৩৬৪
পঞ্চম মুদ্রণ	: ২৫শে	শ্রাবণ	১৩৬৪
ষষ্ঠ সংস্করণ	: ২২শে	শ্রাবণ	১৩৬৫
সপ্তম মুদ্রণ	: ২৫শে	বৈশাখ	১৩৬৬
অষ্টম সংস্করণ	: ১৫ই	জ্যৈষ্ঠ	১৩৬৭
নবম মুদ্রণ	: ১৫ই	অগ্রহায়ণ	১৩৬৭
দশম সংস্করণ	: ১০ই	শ্রাবণ	১৩৭০
একাদশ মুদ্রণ	: ২৫শে	বৈশাখ	১৩৭২
দ্বাদশ সংস্করণ	: ২২শে	জ্যৈষ্ঠ	১৩৭৫
ত্রয়োদশ মুদ্রণ	: ২৫শে	শ্রাবণ	১৩৭৯

প্রকাশক
গোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস
প্রচ্ছদপট
সমীর সরকার

আট টাকা

উৎসর্গ

আওরঙ্গজেব-শাসিত ভারতের নিষিদ্ধ কলা সঙ্গীতকে
যাঁদের সাধনা সেদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলো
এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সঙ্গীতকে নবজীবন দান করে
যাঁরা বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করে গেছেন,
সেই তানসেন-বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ
সঙ্গীত-ভগীরথ রাজা রঘুনাথ সিংহ
ও বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার অন্যান্য উত্তরসাধকদের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের

এখনই, পিকনিক, বনপলাশির পদাবলী, পরাজিত সম্রাট, দরবারী, এই পৃথিবী পান্থনিবাস, প্রথম প্রহর, দ্বীপের নাম টিয়ারঙ, অরণ্য আদিম, আরো একজন, জনৈক নায়কের জন্মান্তর, গল্প-সমগ্র।

এক

ইতিহাসের চেয়ে বিচিত্র উপন্যাস আর নেই। কতো সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, কতো নৃশংস হত্যা আর গৌরবময় আত্মত্যাগ, কতো রোমাঞ্চকর ঘটনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিষ্ণুপুর অধ্যায় বোধহয় সবচেয়ে চমকপ্রদ। মল্লভূমের রাজধানী বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। মানভূম, বীরভূম, শূরভূম, সেনভূম, বলভূম, সামন্তভূম, শিখরভূম ও তুঙ্গভূম—এই আটটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিলো সেদিনের মল্লভূম সাম্রাজ্য, আর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিমল্ল রঘুনাথ। তারপর যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করে এসেছেন মল্লবংশের রাজারা। এই বংশেরই উনবিংশতিতম রাজা জগৎমল্ল প্রত্যুম্নপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে আনলেন বিষ্ণুপুরে। একদিকে খরস্রোত দামোদর আর অন্যদিকে গভীর শালবন, যেন প্রকৃতিই এ রাজ্যকে দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল বহু শতাব্দী ধরে। দিল্লীর সিংহাসনে পাঠান শক্তির অবসান ঘটেছে, অভ্যুত্থান হয়েছে মোগলশক্তির; কত যুদ্ধবিগ্রহ হিংসা হানাহানি; সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ্য সেদিন কোনো বিধর্মী নবাবের আনুগত্য স্বীকার করেনি। দিল্লীর কোনো বাদশাহ, গৌড়ের কোনো সুবাদার নবাব কোনোদিন বিষ্ণুপুরের প্রকৃত স্বাধীনতা অপহরণের দুঃসাহস দেখায়নি।

দিল্লীর সিংহাসনে যখন বাদশাহ আকবর, তখন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে ছিলেন বীর হাম্বীর। দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারের বাইরে কামানের শ্রেণী গর্জন করে উঠেছিলো সেদিন দাউদ খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। দুর্গের উত্তর দিকের পরিখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো

দাউদ খাঁর সৈন্যদের মৃতদেহে। বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পরাজয়ের শোণিতরঞ্জিত স্মৃতি বহন করে আজও টিকে আছে সেই পরিখা, বিষ্ণুপুর অধিবাসীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে তার নাম। পরিখা নয়, মুণ্ডমালার ঘাট হয়ে বেঁচে আছে সেই স্মৃতি। তারপরও একটি শতাব্দী পার হয়ে এসে দেখতে পাই, বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন মল্লবংশের রাজা দুর্জন সিংহ। শৌর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীতে, বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয়। বহু অর্থব্যয়ে মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করলেন দুর্জন সিংহ, কিন্তু সে-বিগ্রহ একদিন বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গেলো। সুতানুটির মিত্রপরিবারের কাছে গচ্ছিত মদনমোহন বিগ্রহ ফিরিয়ে আনতে পারেননি মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ। যেমন, রঘুনাথ সিংহকে যবনযুবতী লালবাঈয়ের লালসার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি তাঁর পাটরানী চন্দ্রপ্রভা।

লালবাঈ! বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চরিত্র। আর রাজা রঘুনাথ সিংহের নিষিদ্ধ প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন লালবাঁধ।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই লালবাঁধ দীঘি থেকে পাওয়া গেলো কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান—লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো।

আজও বোধহয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়; অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্নপ্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, পুবের লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, আর পশ্চিমের যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন যবনকন্যার প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান—এই লালবাঈয়ের জীবনকাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে।

ভারতের সিংহাসনে তখন আওরঙ্গজেব বাদশাহ গাজী; বাংলার মসনদে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। উড়িষ্যায় তখনও পাঠানশক্তির ভস্মাবশেষে ধোঁয়া উঠছে থেকে থেকে, ইংরেজ বণিকের দল কুঠির পর কুঠি গড়ছে বাংলায়, বঙ্গোপসাগরে পর্তুগীজ জলদস্যু, আর বাংলার পশ্চিম প্রান্তসীমায় কখনো-সখনো এসে পৌঁছচ্ছে বর্গী লুটেরার অত্যাচার।

লালবাঈয়ের জীবনকাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হবে, আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে, বিবিবাজারের ঈদের মেলায়। কালো বোরখায় শরীর-লুকোনো এক রূপসী বাঁদীর পিছনে পিছনে।

বিবিবাজারের সওদা হয়ে এসেছিলো এক দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী, এসে স্বপ্ন দেখেছিল বেগম হওয়ার।

স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন!

আজও পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে একটা করুণ কান্নার সুর শোনা যায়। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সে-দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে অনেকে, সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ভয়ে, বিস্ময়ে, অপার্থিব এক পুলকে।

বিবিবাজারের লোকও হঠাৎ সেদিন এমনি ভাবেই চমকে উঠেছিল। প্রথমবার চমকে উঠেছিলো ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সুদর্শন আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

বিবিবাজার তখন জমজমাট। সারা ভারতের চতুর্দিক থেকে লোক এসে জমেছে। কেউ এসেছে সওদা বেচতে, কেউ বা সওদা

করতে। পুবে বেগমসাহেবার কবর থেকে পশ্চিমের মতিঝিল অবধি সারি সারি তাঁবু। চাঁদনি রাতে মনে হয় যেন ঘাসের গালিচায় সারি সারি সাদা-পালক পায়রা বসে আছে। লোকজনের গুঞ্জরন তো নয়, যেন অবিশ্রান্ত বকম্-বকম্।

দূর সিন্ধু উপত্যকা থেকে এক দল বালুচ সওদাগর এসে জটলা পাকিয়েছে একদিকে। আঠারো জোড়া উট বসে বসে পিঠের কুঁজ কাঁপিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আর গনগনে আগুনের ওপর ওলটানো কড়াইয়ের মতো বিরাট একখানা তাওয়ায় রুটি সেঁকছে কয়েকজন। কেউ বা উটের দুধ জ্বাল দিচ্ছে।

ওদিকের তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে একজোড়া চোখ উঁকি দিচ্ছিলো বহুক্ষণ থেকে। হাবশী প্রহরীটা পাক দিয়ে আমগাছের আড়াল হতেই কালো বোরখায় সারা শরীর ঢেকে বেরিয়ে এলো সে দ্রুত পায়ে। তারপর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তরতর করে এগিয়ে গেলো মতিঝিলের দিকে।

কি একটা শব্দে যেন ফিরে তাকালো হাবশীটা। ছুটে এসে দ্রুত অপস্রিয়মান কালো বোরখার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। কোমরের ছুরিটা তার ঝকঝক করে উঠলো জ্যোৎস্নায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সশব্দে খাপে ভরে ফেললো ছুরিটা। বীভৎস হাসিতে ভরে উঠলো তার মুখ।

কিন্তু কালো বোরখার চোখ কিছুই জানতে পারলো না। কয়েক পলক ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে একটা উটের আড়ালে। নিঃসন্দিগ্ধ হলো। না, কেউ বোধহয় লক্ষ্য করেনি তাকে।

এবার পথ চিনে যেতে পারলেই সে সবকিছু জানতে পারবে।

একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় সে। একটি প্রশ্নের উত্তরেই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

কিন্তু বিবিবাজারে তখনও লোক চলাচল কমেনি। আলো নেবেনি একটিও।

প্রতিটি তাঁবুর সামনে মশাল জ্বলছে দাউ-দাউ করে। আর ওদিকের দোকানে সারি সারি চিরাগবাতি। আলোয় আলো চতুর্দিক। শুধু মতিঝিলের সড়কের দু'পাশে ঘুমন্ত তাঁবু। মশালের সারি নিবে এসেছে ওদিকে। হট্টগোল যেন একটু কম।

গুনগুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে একটি মধ্যবয়সী বারাঙ্গনা। সুসজ্জিতা স্তিমিত-যৌবনা কোনো মাড়বার-নন্দিনী হয়তো। পোশাকে পরিচ্ছদে ভিন-প্রদেশী বলেই মনে হয়।

কালো বোরখার অচেনা খাতুন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো তার দিকে।—শোনো।

ফিরে দাঁড়ালো সেই বারাঙ্গনা।

—ফকিরসাহেবের চবুতরাটা কোনদিকে বলতে পারো? ফিসফিস করে প্রশ্ন করলে সে।

কৌতুকের হাসি ফুটলো বারাঙ্গনার মুখে। আপাদমস্তক বোরখার ওপর চোখ বুলিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধে পরা কাচের জলচুড়িগুলো ডানহাতে ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলে, কোন ফকিরসাহেব? পেশোয়ারের সুফীবাবা?

—উঁহু। যিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন।

উত্তর শুনে কৌতুকের হাসি হাসলো মাড়বার-বারাঙ্গনা।

বললে, জ্যোতিষাচার্য? যিনি কোষ্ঠীবিচার করেন, সামুদ্রিক গণনা জানেন? ঐ বাঈজী তল্লাট পার হয়ে, রাধামাধব মন্দিরের পাশে। বলে পথ দেখিয়ে দিলো সে।

কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁক নিলো সোনারপট্টির দিকে।

তাঁবু, তাঁবু আর তাঁবু। কিন্তু এদিকের তাঁবুগুলো আলোয় ঝলমল। কিংখাবের পর্দা ঝুলছে তাঁবুর দরজায়, সামনে সশস্ত্র নজরদার টহল দিচ্ছে। বাতাসে দুলছে রেশমী রং-ঝলমল পর্দা, আর তারই ফাঁকে দেখা যায় কাশ্মীরী গালিচার ওপর স্বর্ণালঙ্কার বিছিয়ে রেখে খরিদ্দারের সঙ্গে দরদস্তুর করছে শেঠের দল। গন্ধকের পোড়া গন্ধ

আসছে থেকে থেকে। সারা ভারত থেকে এসেছে স্বর্ণকারের দল, ঈদের মেলায় বসে খদ্দেরের রুচিমত অলঙ্কার বানিয়ে দিয়ে কয়েকশো মোহর লুটে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। কয়েকটা তাঁবুতে হীরে জহরতের পসরা সাজানো। সামনে হুঁশিয়ার হাঁকছে বাদশাহী রক্ষী, হাতে তাদের গাদা বন্দুক। বাইরে এক জায়গায় লাঠিয়ালরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের খেয়ালখুশিতে বিশ্বাস নেই হিন্দু বেসাতিদারদের। তাই লাঠিয়ালের দল সঙ্গে এনেছে তারা। রাহাজানি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

হীরে জহরতের পরেই জীবন্ত জহরতের পসরা। বারোশো বাঈজী আর বারাঙ্গনা আসে বিবিবাজারের ঈদের মেলায়। লক্ষ্ণৌ আর কাশ্মীরের সুরসাধিকা বাঈজী, মাড়বার আর অযোধ্যার রূপসী বারবধূর দল, দক্ষিণী আর আরাকানী কুন্তক রতিসঙ্গিনী।

মতিঝিলের ওপারে জানোয়ারবাগ। উটের সারি নিয়ে এসেছে বালুচ সওদাগরের দল, মহীশূর থেকে এসেছে হাতির সারি। আরবী সওদাগরের দল এনেছে তেজী ঘোড়া। কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া, মুনিয়া। পশুজগৎকে পণ্য করে নিয়ে এসেছে দেশবিদেশের বণিকেরা।

মতিঝিলের ওপার থেকে হিংস্র পশুর চিৎকার আর কলরব ভেসে আসে মাঝে মাঝে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে অল্পবয়সী বারবনিতার দল। আতর অগুরু, দিলবাহার খুসবু খরিদ করতে করতে চমকে ফিরে তাকায়।

একদল পর্তুগীজ ওদিকে মশলা আর তামাকের দোকান দিয়েছে। তার পাশে ফরাসী বেসাতিদার।

শাল কিংখাব জামদানি জামিয়ার। রেশম আর জহরত। বাঈজী আর বারনারী। সারা ভারতের রাজা বাদশা, বিলাসী ভূস্বামী আর দস্যুপতি ভুঁইয়ারা ছুটে এসেছে বিবিবাজারে। বিলাস সামগ্রী নিয়ে যাবে শতপত্নীর মনোরঞ্জনের জন্যে, রূপযৌবনের সন্ধান পেলে কেউ

বা তুলে নিয়ে যাবে নিজের অন্দরমহলে। ইতরের দল এসেছে একরাত্রির আনন্দ লুটে নিয়ে যেতে।

হ্যাঁ, আরেকটা হাট আছে এক প্রান্তে। শুধু বাঈজী আর বারাঙ্গনা নয়, বান্দা আর বাঁদী। যুদ্ধবন্দী আর লুটতরাজ-করে-পাওয়া মেয়ে-পুরুষদের আনা হয় বাঁদীবাজারে নিলামে বেচে দিয়ে যাবার জন্যে। জোয়ান চেহারার বান্দাদের কিনে নিয়ে যায় অনেকে, যুবতী বাঁদীদের নিয়ে যায় বিলাসী বণিকের দল। সাধারণ পণ্যের মতোই কয়েকটি মোহরের পরিবর্তে আজীবন স্বত্ব বর্তায় তাদের ওপর।

আজীবন স্বত্ব। জীবনে কতো মনিবের লালসার ক্ষুধা মিটিয়ে হাটে হাটে বেচাকেনা হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে। যৌবন আর স্বাস্থ্য অটুট থাকলে হাটে হাটে দর উঠবে তার, কয়েক বছরের মধ্যে বহু মনিবের হাত বদলে অযোধ্যার বাঁদী হয়তো নিজেকে আবিষ্কার করবে আফগান সওদাগরের ঘরে। বার্ধক্যে কেউ পাবে মুক্তি, অর্থাৎ অনাহার মৃত্যু। তবু পাখির মতো উড়ে পালাতে ভয় পায় তারা, জানে পলাতকা বাঁদীর একমাত্র দণ্ড দাসব্যবসায়ীর কাফ্রী চরের হাতে মৃত্যু। জানে কোনো বাদশাহী আইন তাকে আশ্রয় দেবে না। কাজীর বিচারে সে শুধুই পণ্য, মনিবের আজ্ঞাধীন।

কালো বোরখার রহস্যময়ী সওদা বেচতে আসেনি, সওদা করতে আসেনি। নিজেই এসেছে বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে।

অন্য এক অভিজ্ঞ বাঁদীর কাছে, মণিবান্নুর কাছে শুনেছে সে বাঁদীজীবনের ভবিষ্যৎ। শুনেছে মনিবের নৃশংস অত্যাচার আর কাফ্রী অনুচরদের নির্দয় ব্যবহারের কথা।

তাই ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহে দাসব্যবসায়ীর কড়া নজর ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কালো বোরখার রহস্যময়ী।

আগ্রার হীরাবাঈ তাকে পছন্দ করে গেছে, নব্বই মোহর কিম্মত দিতে স্বীকার করে গেছে নিলামদারকে।

হীরাবাঈ! সেখানেও কি আছে এমনি নির্দয় হাবশী প্রহরী আর খোজা অনুচর? কে জানে।

ভবিষ্যৎ জানার উৎসুক আগ্রহে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো সে বাঈতল্লাট পার হয়ে।

বারবনিতাদের পল্লী থেকে বীভৎস হাসি ভেসে আসছে মদ্যপ কামচারীদের। উগ্র আতরের গন্ধ আর ঝুমঝুম ঝুমঝুম নাচের তালে তালে সুকণ্ঠ সঙ্গীত ভেসে আসছে কোনো এক কাঞ্চনীর তাঁবু থেকে। বাঈজী নয়, কাঞ্চনী। কাঞ্চনের মতোই তাদের রূপের জলুস, কাঞ্চনই তাদের ক্ষণিক বিশ্রম্ভের মূল্য।

কালো বোরখা উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে চকিতে চেয়ে দেখলে একবার। চোখ-ঝলসানো রূপযৌবন আর দুর্মূল্য বেশবাস। ঘুঙুরের তালে তালে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ।

দ্রুত পায়ে তাঁবুটা পার হতেই রাধামাধবের মন্দিরটা চোখে পড়লো তার। একটা গাছের ঈষৎ অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো।

হ্যাঁ, ইনিই সেই ফকির সাহেব। একটা বেদীর ওপর বসে আছেন, আর চতুর্দিকে অসংখ্য নারীপুরুষ। গ্রাম্যচাষী, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, রূপজীবিনী।

জ্যোতিষাচার্যের পাশে পুঁথিপত্র, সামনে খড়ি দিয়ে আঁকা পতাকীচক্র। একজন শ্রেষ্ঠীর কোষ্ঠীবিচার করছিলেন গণৎকার। তাঁর পিছনে দু'টি মশাল জ্বলছে দাউদাউ করে। সামনে কর্পূর-প্রদীপ।

কালো বোরখার রহস্যময়ী গাছের আড়াল থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তন্ময় হয়ে।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলো সকলে। বকের পালকের মত সাদা ধবধবে একটি আরবী ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে এদিকে।

প্রথমবার চমকে উঠেছিল ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সকলে চমকে উঠলো আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

কে এই সুদর্শন তরুণ! সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান কি সে জানে না? বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

ভয়ে চিৎকার করে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো বারাঙ্গনাপল্লীর মেয়েপুরুষ। মুসলমান বাদশাহী রক্ষীর দল পরস্পর কানাকানি করলো, কে এই তরুণ? চেহারা দেখে কাফের বলেই মনে হয়, কিন্তু ও কি জানে না, সম্রাট আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছেন, কোনো হিন্দু কাফের দামী ঘোড়ায় চড়তে পাবে না? জানে না, হাতি, পালকি আর মূল্যবান ঘোড়া শুধু বাদশাহের স্বধর্মীদের জন্যে?

তবু কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না তারা।

ক্রমশ সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার কাছে এগিয়ে এলো, একেবারে জ্যোতিষাচার্যের চবুতরার কাছে। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো সকলে। বেশবাস আর তার সুপুরুষ চেহারা দেখেই বুঝলো, কোনো রাজবংশের রক্ত বইছে তার ধমনীতে।

চবুতরার সামনে এসে লাফিয়ে মাটিতে নামলো সাদা ঘোড়ার সওয়ার।

জ্যোতিষাচার্যও উঠে দাঁড়ালেন। সস্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তাঁর মুখ।—রঘুনাথ, তুমি এখানে?

রঘুনাথ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে আলিঙ্গন করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, বসো রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের সংবাদ জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি আমি। কি সংবাদ, বলো।

রঘুনাথ মৃদু হেসে বললে, আপনার সন্ধানেই এসেছি গুরুদেব, বিষ্ণুপুর যাবার আমন্ত্রণ জানাতে।

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই বোধ হয় অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, অপেক্ষা করো রঘুনাথ।

তারপর ইঙ্গিতে বিদায় নিতে বললেন জনতাকে।

একে একে সকলেই বিদায় নিলো। কিন্তু কালো বোরখার রহস্যময়ী তখনও দাঁড়িয়ে রইলো গাছের আড়ালে। না, ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহেই নয়। সুদর্শন যুবকটির আকর্ষণে। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ। রূপের? যৌবনের? না, অদৃষ্টের?

ধীরে ধীরে মোহগ্রস্তের-মতো এগিয়ে গেলো সে। সুমধুর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো বোরখার-ভেতর থেকে।—ফকির-সাহেব!

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন জ্যোতিষাচার্য। আর রঘুনাথের চোখ পড়লো গারারার নীচে দু'টি সুন্দর পায়ের ওপর। সুশুভ্র পায়ে কালো বান্দাছাপ দেখে শিউরে উঠলো রঘুনাথ।

—কি চাও মা? জ্যোতিষাচার্য প্রশ্ন করলেন সস্নেহে।

উত্তর এলো, নসীব জানতে চাই ফকিরসাহেব।

—বসো। তোমার করকোষ্ঠী দেখাও মা।

—কিন্তু আমি নজরানা দিতে পারবো না ফকিরসাহেব। দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র আমি, বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছি।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন। বললেন, ভয় নেই মা, বিনা দক্ষিণাতেই তোমার করকোষ্ঠী বিচার করবো আমি।

—মেহেরবানি আপনার। উত্তর এলো মৃদুস্বরে।

সঙ্গে সঙ্গে বোরখার ভেতর থেকে একটি সুডোল সুন্দর হাত বেরিয়ে এলো। আর সুমিষ্ট কণ্ঠের অনুরোধ এলো, আমাকে স্পর্শ করবেন না ফকিরসাহেব, আমি দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে!

জ্যোতিষাচার্যের কানে গেলো না তার কথা, তন্ময় নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর ঝুঁকে পড়লো পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর করপুটের ওপর। বিস্ময় আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটলো তাঁর মুখে চোখে। যবনকন্যার কররেখার দিকে মাথা নুয়ে পড়লো তাঁর, লক্ষ্য করলেন না কালো বোরখার আড়াল থেকে দু'টি মোহগ্রস্ত চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রূপবান রঘুনাথের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুললেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, রঘুনাথ, এমন অদ্ভুত কররেখা আমি কখনো দেখিনি।

আর যবনকন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি তো বিধবা নও মা।

—না ফকিরসাহেব, বেওয়া নই আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, জীবনে কোনোদিন তুমি বিধবা হবে না মা।

—শাদি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, বিবাহের কথা জানতে চেয়ো না কন্যা।

—ফকিরসাহেব, বাঁদীবাজার থেকে লুকিয়ে এসেছি আপনার কাছে শুধু এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায়। হতাশার স্বর ফুটে উঠলো বাঁদীর কণ্ঠস্বরে।

জ্যোতিষাচার্য বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, লগ্নের সপ্তমে বহু পাপ-গ্রহদৃষ্ট শনি রয়েছে কন্যা, তোমাকে আজীবন অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু, কিন্তু একটি অদ্ভুত রেখা রয়েছে শুক্রের স্থানে, তুমি···

হঠাৎ চুপ করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, তোমার ললাটের রেখা না দেখলে তো বলা যাবে না কন্যা। যদি আপত্তি না থাকে···

—না ফকিরসাহেব, আপত্তি নেই। শুধু হাবশী নজরদারের চোখ ফাঁকি দেবার জন্যেই বোরখায় মুখ ঢেকেছি আমি।

মুখের ওপর থেকে দু'টি সুন্দর হাতে বোরখা তুলে ধরলো বাঁদী। রঘুনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বাঁদীর মুখের দিকে। এও কি সম্ভব! বাঁদীবাজারের সওদা হয়ে এসেছে এই যবনকন্যা? এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অদৃষ্টে আছে শুধুই দাসীবৃত্তি? এ তিলোত্তমা কি করে সম্ভব হলো দরিদ্র যবনের ঘরে? এ যে উর্বশীর যৌবন তার শরীরের ছন্দে!

মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইলো রঘুনাথ।

আর বাঁদীর ললাট-লিখন পরীক্ষা করতে করতে জ্যোতিষাচার্য

বললেন, তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একদিন একটি রাজ্যপরিচালনা করবে তুমি! কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শিউরে উঠলো বাঁদী। উঠে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষাচার্যকে কুর্নিশ করলো সসম্মানে, তারপর পুনরায় বোরখায় মুখ ঢেকে তরতর করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো বাঁদীবাজারের পথে।

রঘুনাথ তখনও অনিমেষ নয়নে অপস্রিয়মান বাঁদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

—মিথ্যা ঔৎসুক্য দেখিয়ো না রঘুনাথ। জ্যোতিষাচার্য গুরুগম্ভীর স্বরে সাবধান করলেন।

লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরালো রঘুনাথ। তারপর জ্যোতিষাচার্যকে বিষ্ণুপুর প্রাসাদে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। সাদা ঘোড়ার সওয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

দুই

বিবিবাজার! এ নাম বহুবার শুনেছি লালী। স্বপ্ন দেখেছে বিষণ্ণ বিকেলের দীঘির ঘাটে বসে বসে, যেন এক অচেনা নবাবজাদা ঘোড়-সওয়ার হয়ে এসে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তুলে নিয়ে গেছে তাকে, বেগমের তক্তে বসিয়েছে।

তারপর আবদার ধরেছে যেন লালী, বিবিবাজারের ঈদের হাটে যাবার।

তা শুনে রাজী হয়েছে নবাবজাদা, আদেশ দিয়েছে বিবিবাজারে একটা দিন হবে মিনাবাজার! দেশবিদেশের মেয়েরা এসে হাট বসাবে সেদিন, সওদা বেচবে সওদা করবে শুধু মেয়েরা। কতো দেশের রানী আর রাজকন্যা, শাহজাদী আর বেগমসাহেবা। আর সকলের কৌতূহলী চোখের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেসে হেসে হেলে দুলে ঘুরে বেড়াবে লালী। এক দোকান থেকে আরেক দোকানে। রাজ্যের যতো হীরে জহরত, জামিয়ার জামদানি, শাল আর মসলিনের ওড়না, সব কিনবে সে।

সে স্বপ্ন যে এমন ভাবে সার্থক হবে, কে ভেবেছিলো।

ঠগী ডাকাতের অত্যাচারের কথা শুনেই এসেছিলো এতোদিন। জমিদারের ঘরে বান্দা আর বাঁদীও দেখেছে, কিন্তু তারা যে এমন জানোয়ারের মতো হাটে বেচাকেনা হয়, আগে কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

রহিমগঞ্জের পীরের দরগায় মানত করতে এসেছিলো লালীর মা, লালীকে সঙ্গে নিয়ে। দূর-দূর গ্রাম থেকে কতো লোকই তো এসেছিলো। চলছিলো গরুর গাড়ির সারি। কখন রাত নেমে এসেছে খেয়ালই হয়নি। গল্পগুজবে মেতে গিয়েছিলো সবাই।

হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করে চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললো ঠগী লুটেরার দল। বাধা দিতে গিয়ে পুরুষগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, লাঠির বাড়ি খেয়ে। সোনাদানা, মালপত্র যা-কিছু ছিলো সব কেড়ে নিয়ে তাদের দলকে-দল চালান দিয়ে দিলো বজরায়। শুধু ছাড়া পেলো অথর্ব বুড়োবুড়ীরা।

রায়ের ঘাট থেকে চম্পারনের কুঠি, চম্পারন থেকে বিবিবাজার। খোজা সর্দারের হাত বদলে এই ঈদের মেলায়।

হিন্দু কাফেরদের ওপর জিজিয়া বসানোর খবর শুনে খুশী হয়েছিলো লালী, গ্রামের অন্যসব মুসলমানদের মতোই। আওরঙ্গজেব বাদশাহ গাজী যেদিন ফরমান দিলো ঃ কোনো কাফের হাতিতে চড়তে পাবে না, পালকি ব্যবহার করতে পাবে না, দামী ঘোড়ায় চড়তে পাবে না—সেদিন অন্য সকলের মতো লালীও খুশী হয়েছিলো। কিন্তু বাঁদীবাজারে এসে সব ভুল ভেঙে গেলো। হিন্দু আর মুসলমান নয়। শুধু হু'টি ধর্ম, ধনী আর দরিদ্র।

তা না হলে মুসলমান ঠগীর হাতে লুঠ হলো কেন তাদের সর্বস্ব, মুসলমান নিলামদার কেন কিনে নিলো তাদের চম্পারনের কুঠি থেকে।

আর এই হাবশী প্রহরী, সেও তো মুসলমান। তবে কেন এমন অমানুষিক অত্যাচার করে সে বান্দা আর বাঁদীদের ওপর।

বান্দাছাপের দিনটার কথা মনে পড়লো তার, জ্যোতিষাচার্যের চবুতরা থেকে ভীতত্রস্ত পায়ে বাঁদীছাউনির দিকে ফিরে আসতে আসতে।

সারি সারি তাঁবু আর হোগলার ছাউনি। হাজার হাজার বান্দা আর বাঁদী। একদিকে হিন্দু, আরেকদিকে মুসলমান। কেউ এসেছে যুদ্ধবন্দী হয়ে, জয়ী যোদ্ধার লুটের মাল হিসাবে, কেউ বা চালান এসেছে ঠগীদের বজরায়। সব এসে মিলেছে একই নিলামদারের হাতে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে, খরিদ্দার এসে নেড়েচেড়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, দরদস্তুর করে চলে যায়। দু-চারজন দু-চারজন করে চলে যায় নতুন মনিবের সঙ্গে।

দুনিয়ায় এতো রকম চেহারা আছে জানতো না লালী। জানতো না, পুরুষের চেয়ে খোজাদের দাম বেশী। জানতো না, বাঁদীদের রূপ-যৌবনের চেয়ে কৌমার্যের দাম দ্বিগুণ।

নিলামদারের খাস বান্দা খোজাগুলোর চোখ দেখলেও ভয় হয় লালীর। বান্দাছাপের দিনটা মনে পড়লে ভয়ে আঁতকে ওঠে ও।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো সকলে, আর সামনের একটা জ্বলন্ত চুল্লীতে একরাশ লোহার শিক গরম হয়ে উঠছিলো। তারপর একে একে প্রত্যেকের পায়ে হাবশীটা বান্দাছাপ লাগিয়েছিলো উত্তপ্ত লোহার শলাকা ছুঁইয়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলো সকলে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো কয়েকজন। লালীও।

জ্ঞান হয়ে দেখেছিলো, শুধু পায়েই নয়, হাতের বাজুতেও উল্কি এঁকে দিয়েছে কে।

বান্দাছাপ!

মণিবানু বলেছিলো, এ ছাপ আর কোনোদিন মুছবে না লালী। পালিয়ে গেলেও বাদশার আইন ধরে নিয়ে এসে ফিরিয়ে দেবে মালিকের কাছে। আর নয়তো নিলামদারের চর ছুরি বসাবে বুকে।

এই বীভৎস ভবিষ্যতে কোনো আশার আলো দেখতে পাবে ভেবেই ফকিরসাহেবের খোঁজে বেরিয়েছিলো লালী, অন্য বাঁদীর বোরখা ধার নিয়ে।

কিন্তু কি অদ্ভুত কথাই না বললেন ফকিরসাহেব। "অনূঢ়া" শব্দটা এই প্রথম শুনলো লালী, তবু অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না। শাদি নয়, সব বাঁদীর মতোই তাকেও হয়তো শরীর বেচতে হবে।

মণিবানুর কথাটা মনে পড়লো লালীর।

—এক মনিব শাদির সামিল, লালী। মণিবানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলেছিলো। বলেছিলো, বাঁদী হয়েও মনিব বদল হবে না এমন সৌভাগ্য কার হয়! সুরত বদলালেই অন্য মনিবের কাছে বেচে দেবে, আর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে, কিংবা অকর্মণ্য হয়ে গেলে বলবে, মুক্তি দিলাম।

মুক্তি অর্থাৎ মৃত্যু।

তার চেয়ে সত্যিই যদি আগ্রার হীরাবাঈ তাকে কিনে নিয়ে যায়!

নব্বই মোহর দর দিয়ে গেছে হীরাবাঈ! নব্বই মোহর! এতো দাম দিয়ে বাঁদী কেনে না কেউ, মণিবাঈর কাছে শুনেছে লালী।

তবু লোভ যায়নি নিলামদারের। লালী রূপসী। লালী কুমারী। কৌমার্যের মূল্য নাকি আরো অনেক বেশী।

অনিশ্চিত ভাবনায় তন্ময় হয়ে পথ চলছিলো লালী। কোনো দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাঁদী-ছাউনির কাছে পৌঁছে গেছে সে ততোক্ষণে। চকিতচোখে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে তাঁবুর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে বোরখায় টান পড়লো।

চট্ করে ফিরে দাঁড়ালো সে।

সেই হাবশী প্রহরী! মসিকৃষ্ণ দৈত্যের মতো চেহারাটা দু'হাতে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে আনলো তাকে। মুখে তার বীভৎস লোলুপ হাসি। বাধা দিতে চেষ্টা করলো লালী, কিন্তু দৈত্যের শক্তির কাছে অবশ হয়ে গেলো তার সারা শরীর।

এক টানে বোরখা ছিঁড়ে ফেললো হাবশীটা। তারপর দু'টি কামার্ত হাতের পীড়নে বুকের কাছে টেনে নিলো লালীকে। তার অবশ শরীরকে দু'হাতে তুলে নিয়ে অন্ধকারের দিকে পা বাড়ালো হাবশী প্রহরী।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো লালী।

মুহূর্তের মধ্যে একটা হট্টগোল শোনা গেলো।

বাঁদীছাউনি থেকে ছুটে এলো নিলামদার, খোজা বান্দার দল।

নিলামদারের গম্ভীর ডাক শুনে আলিঙ্গন শিথিল করে দিলো হাবশী। ছিটকে দূরে সরে এলো লালী।

নিলামদার ইশারায় কি যেন বললো খোজা বান্দাদের উদ্দেশে, পরক্ষণেই লোহার শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো তারা হাবশীটাকে। তারপর চাবুকের পর চাবুক পড়লো তার পিঠে। রক্তের রেখা ফুটে উঠলো ক্রমে ক্রমে। তবু এতোটুকু কাতরোক্তি শোনা গেলো না।

নিলামদার বাঁধন খুলে দিতে বললো।

আর তার বাঁধন খুলে দিতেই লালী সেদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

একটা ক্রূর কুটিল হাসি ফুটে উঠলো হাবশীর মুখে। তর্জনী তুলে শুধু একবার শাসালো সে লালীকে।

মণিবানুকে জড়িয়ে ধরে তাঁবুর ভেতর ছুটে পালালো লালী।

তিন

হীরাবাঈয়ের তাঁবুতে তখন ঘুঙুর বেজে চলেছে অবিরাম ছন্দে। মোহরের পর মোহর ঝরে পড়ছে সোনার রেকাবিতে। আসমানী ওড়নার গায়ে সল্‌মা আর চুমকি চমক দেয়। ওড়না নয়, যেন নীল আসমানের গায়ে তারার ঝিকিমিকি। নারেঙ্গী রঙের আঙিয়ার গায়ে কশ্মীরী কল্কার ছন্দ নাচে যৌবন-অঙ্গের তালে তালে। সুর্মা-চোখের হঠাৎ হাতছানি লোভ জাগায়। রক্ত নাচায়। নাচের ঘূর্ণি ওঠে হীরাবাঈয়ের চঞ্চল পায়ে, ঘুঙুরের বোল ফোটে ঝুমুরঝুম ঝুমুরঝুম। কোকিলকণ্ঠ গজল গানের রেশ নেশা ছড়ায় সুরাবিভোর চোখে।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম লাল মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন হীরাবাঈয়ের লঘুছন্দ শরীরের দিকে। হাতে গজদন্তের কারুকার্য করা ফরসির নল।

তামাকে আতরের ছিটে দিয়ে সরে গেলো হুকাবরদার। হীরাবাঈয়ের খাস বাঁদীর ইশারায় সোনার রেকাবিতে এলো বাগদাদী সুরার পানপাত্র।

মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের চোখ জুড়ে আসছে তখন। বামন চেহারার ভাঁড়টা তালে তালে বিচিত্র ভঙ্গি করছে।

—অ্যাই! হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো শোভা সিংহ।

তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে অস্ফুটে বললো, কমবখ্‌ত্‌!

সারেঙ্গীর সুরের মূর্ছনা আর নাচের ঘূর্ণি হঠাৎ থেমে পড়লো।

শোভা সিংহের কাছে এসে বসলো হীরাবাঈ। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে বললে, আমার ইনাম, রাজাবাহাদুর!

—রাজবাহাদুর? হো-হো করে হেসে উঠলেন বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম।

নিজেই যাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলেন হীরাবাঈয়ের জলসায়, সেই শোভা সিংহ কিনা রাজাবাহাদুর! সামান্য ভূমিপতি হলো রাজাবাহাদুর, রাজা কৃষ্ণরাম সামনে বসে থাকতে!

হীরাবাঈ অপাঙ্গে তাকিয়ে একটা মধুর কটাক্ষ হানলে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দিকে।

বললে, আপনার কাছে আর কি ইনাম চাইবো মহারাজবাহাদুর, আপনি এসেছেন এ গরিবখানায়, এই তো ইনাম।

খুশীর হাসি ফুটলো কৃষ্ণরামের চোখে।

রাজা কৃষ্ণরামকে মহারাজবাহাদুর বলেছে বাঈজী। শোভা সিংহকে বলুক রাজাবাহাদুর।

নেশার চোখে হাত তুলে কৃষ্ণরাম অস্ফুটে বললেন, জহুরী বুলাও।

জহুরী বোধহয় হাজির ছিলো পর্দার আড়ালে।

আখরোট কাঠের পেটিটা নিয়ে এসে সামনে রাখলো সে। তারপর সেটা খুলে ফেলতেই ঝাড়লণ্ঠনের তীব্র আলোয় ঝলমল করে উঠলো হীরে পান্নার সুন্দর একটি চন্দ্রহার।

হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রইলো শোভা সিংহ, তারপর হীরাবাঈয়ের কটী ঘিরে পরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ঠিক হায়, এই নাও ইনাম।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার! বলে ইশারা করলেন জহুরীকে।

জহুরী ছুটে গেলো।

কৃষ্ণরাম বললেন, ও হার আমার, আমি ইনাম দেবো হীরাকে। হীরাকে হীরা ইনাম দেবো!

জহুরী হেসে বললে, তা হলে নিলাম হোক হুজুর।

—হ্যাঁ, নিলাম! শোভা সিংহ তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বললে।

রাজা কৃষ্ণরাম ঘাড় নেড়ে বললেন, কায়েম! বলে সোনার রেকাবীতে পাঁচটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন খাজাঞ্চীর হাত থেকে মোহরের থলিটা কাছে টেনে নিয়ে।

দশটা মোহর ছুঁড়ে দিলে শোভা সিংহ।

একটি মোহর একশো মোহরের প্রতিশ্রুতি। রাজ্যে ফিরে গিয়ে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবার বাক্‌দান। কিন্তু নিলামের নেশায় তখন দু'জনেই বেহুঁশ হয়ে গেছে। নিলামের দর উঠছে তো উঠছেই।

রেশমী থলি থেকে এক মুঠো মোহর বের করে ছুঁড়ে দিলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

শোভা সিংহ ছুঁড়ে দিলে সমস্ত থলিটাই।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম।

ডাক ছাড়লেন, জামিন!

নেশা ছেড়ে গেলো শোভা সিংহের। অপমানে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো।

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এতো বড়ো অপমান? শোভা সিংহকে জামিন দিতে হবে কোনো শ্রেষ্ঠী এনে? মেদিনীপুরের ভূম্যধিকারী শোভা সিংহের প্রতিশ্রুতিই কি জামিন নয়?

হীরাবাঈ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো।

—হীরা কি কসুর করলো রাজাবাহাদুর!

—কসুর? ক্রোধান্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক ঝট্‌কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো শোভা সিংহ।

আর হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন রাজা কৃষ্ণরাম। সে হাসি জ্বালা ধরিয়ে দিলো শোভা সিংহের সর্বাঙ্গে। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে এ অপমানের।

বিবিবাজার ছেড়ে ঘোড়া ছুটলো। মেদিনীপুর নয়, উড়িষ্যার পথে। রহিম খাঁ। শোভা সিংহ মনে মনে বললে, পাঠান রহিম

খাঁ আমার বন্ধু, মোগলের দাস রাজা কৃষ্ণরামকে এ অপমানের মূল্য দিতে হবে একদিন।

শোভা সিংহ যখন ঘোড়া ছুটিয়ে উড়িষ্যার পথে চলেছে, তখন বিষ্ণুপুরের যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ তার সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দামোদরের তীর ঘেঁষে চলেছে বন-বিষ্ণুপুরের পথে।

ক্ষণিকের জন্যে দেখা রূপসী মুসলমানীকে কিছুতেই যেন মন থেকে দূর করতে পারছে না রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে লোভ জেগে ওঠে, বাঁদীবাজারে ফিরে গিয়ে কালো বোরখার তিলোত্তমাকে কিনে আনতে ইচ্ছে হয়।

পরমূহূর্তেই লোভ দমন করতে হয়। বিধর্মী নারীর প্রতি লোভ হিন্দুযুবরাজের পক্ষে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। রঘুনাথ নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যিই কি অন্যায়? বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বিষ্ণুপুরের কাছে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে, মানুষকে মানুষ বলেই জেনেছে রঘুনাথ। শ্রীচৈতন্যদেব তো যবনকে শিষ্যত্ব দিতে অস্বীকার করেননি। আর মদনমোহনের কাছে প্রেমই সারবস্তু, প্রেমই সত্য।

তবে কি বিবিবাজারের অনিন্দ্যসুন্দরী এক বাঁদীর প্রেমে আবদ্ধ হলো রঘুনাথ?

অপরিচিতা এক রূপসীর কথা ভাবতে ভাবতেই মোহগ্রস্তের মতো ছুটে চলেছিলো রঘুনাথ। অকস্মাৎ চোখে পড়লো, এক সারি রাজহাঁস তীব্র গতিতে ভেসে চলেছে খরস্রোত দামোদরের বুকে।

পথিমধ্যে এক পান্থশালায় রাত্রিযাপন করে ফিরে চলেছে রঘুনাথ। পিতা দুর্জন সিংহ অসুস্থ, বিষ্ণুপুরে পৌঁছতে হবে অবিলম্বে।

ঘোড়ার গতিবেগ তাই বাড়িয়ে দিলো। স্পষ্ট হয়ে উঠলো রাজহাঁসের দল। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখলো, রাজহংস নয়, এক বহর

বজরা ভেসে চলেছে সুশুভ্র পাল তুলে। দেখলো, একটি সুসজ্জিত মধুকরকে কেন্দ্র করে চলেছে রাজবল্লভ, সমুদ্রফেনা আর শঙ্খচূড়। তারও সামনে কয়েকটি বালাম, সারেঙ্গা আর শ্লুপ। মধুকরের কাহনে রঙঝলমল গালিচা পাতা, গুদস্তা আর ইসকায় রুপোর পাত। আর পালের গায়ে বর্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্ন।

কৃষ্ণরাম তখন গল্প শুনছিলেন আলাপনীর কাছে। বিবিবাজারে কেনা পণ্যসামগ্রীতে বোঝাই হয়ে চলেছে তাঁর নৌকার সারি। মনের ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিলো গতরাত্রির তুচ্ছ কলহ। হীরাবাঈয়ের জলসার অঘটন।

মধুকরের ওপর থেকে অন্যমনস্কভাবে তীরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ কৃষ্ণরাম দেখতে পেলেন সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে। দূর থেকে আরোহীকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু মোগলরাজ্যের বুকের ওপর এই দুর্মূল্য আরবী ঘোড়ায় চড়ার দুঃসাহস যার, তাকে যবন বলে মনে হলো না। বেশবাস দেখে স্বধর্মী বঙ্গবাসী বলেই মনে হলো তাঁর।

আলাপনী এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, কৃষ্ণরামের মন তার কাহিনীর সূত্র হারিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে সাদা ঘোড়ার সওয়ারের দিকে।

হঠাৎ রাজা কৃষ্ণরামের বিস্মিত চোখে চোখ পড়তেই গল্প থামালো আলাপনী। নিজের মনেই কি এতোক্ষণ গল্প বলে চলেছিলো সে? কৃষ্ণরাম শুনছেন না তার কাহিনী?

আহত চোখ তুলে আবার তাকালো সে। গল্পবলার চাতুর্যের জন্যে তার খ্যাতি দেশব্যাপী। ত্রিপুরারাজের আমন্ত্রণে গিয়ে কৃষ্ণরাম রাজদরবারে দেখা পেয়েছিলেন তার, এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মুখে কাহিনী শুনে যে, নিজের দরবারের সম্পদ বাড়িয়েছিলেন তাকে ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে উপহার চেয়ে। কাশীর মাঘোৎসবে সারা ভারতের রাজপরিবার থেকে এসেছিলো দক্ষ আলাপনীর দল। তাদের মধ্যে গল্প বলার অপূর্ব চাতুর্যের জন্যে যার নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো

দেশে দেশে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখতো, সেই আলাপনীর কাহিনীর সূত্র হারিয়ে কৃষ্ণরাম বিস্মিত চোখে কার দিকে তাকিয়ে আছেন ?

গল্প থামতেই কৃষ্ণরামের তন্ময়তা ভাঙলো। বললেন, কাদম্বরী, সওয়ারকে দেখে হিন্দু মনে হয় যেন ?

কাদম্বরী সায় দিলো তাঁর কথায়—হ্যাঁ, মহারাজ !

কৃষ্ণরাম বললেন, বহরদারকে বলো, ওঁকে আমার মধুকরে আমন্ত্রণ জানাতে।

কাদম্বরী উঠে এসে হুকুম জানালো বহরদারকে, যার তত্ত্বাবধানে চলছিল সমগ্র নৌবহর।

সঙ্গে সঙ্গে বহরদারের হুকুমে একটা বালাম ছুটলো তীরের দিকে। আর ঘাটে এসে নোঙর ফেললো কৃষ্ণরামের মধুকর।

তীর থেকে মধুকরে উঠে এলো রঘুনাথ, কৃষ্ণরামের আমন্ত্রণে। কাদম্বরী সসম্মানে অভিবাদন করে রঘুনাথকে কৃষ্ণরামের কাছে নিয়ে গেলো।

পরিচয় পেয়ে রঘুনাথকে পাশে বসালেন কৃষ্ণরাম।

তারপর সুরার পাত্র এগিয়ে দিলেন। প্রাথমিক আলাপের পর সহাস্যে বিবৃত করলেন শোভা সিংহের ঔদ্ধত্য।

বললেন, উচ্চাশার কোনো সীমা নেই রঘুনাথ। মেদিনীপুরের সামান্য ভূমিপতি শোভা সিংহ, রাজা হবার স্বপ্ন দেখে। জহরতের নিলাম ডাকে রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

রঘুনাথ বিচলিত বোধ করলো বিবিবাজারে হীরাবাঈয়ের মুজরার ঘটনা শুনে।

বিবিবাজারের ইতিহাসও তো এমনি এক ঘটনা থেকেই।

দায়ুদ খাঁ ফিরছিলেন আগ্রা থেকে। পালকিতে ছিলো তাঁর

বেগম। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে। সামনে পিছনে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ গতিবেগ থামলো পালকির। লাগাম টেনে ধরতে হলো দায়ুদ খাঁকে।

সামনের পথ রোধ করে চলেছেন অযোধ্যার নবাব। হাতির পিঠে চড়ে ছত্রের মেলায় চলেছেন তিনি।

বেগম উষ্মা প্রকাশ করলো বাঁদীর কাছে, বাঁদী জানালো, মালিকা বেগম রুষ্ট হয়েছেন, জানতে চান তিনি, কার এমন দুঃসাহস যে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়!

আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো দায়ুদ খাঁর। জেদের বশবর্তী হয়ে বললেন, পালকি ঘোরাও। ছত্রের মেলায় যাবো আমরাও।

সঙ্গে সঙ্গে খবর রটে গেলো। ছত্রের মেলায় যত হাতি এসেছে সব কিনে ফেলবেন দায়ুদ খাঁ।

সে খবর শুনলেন অযোধ্যার নবাব। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। পাঠান দায়ুদ খাঁ কিনবে ছত্রের হাতি? নিলামদারকে ডেকে বললেন, দায়ুদ খাঁ যেন একটা হাতিও কিনতে না পায়।

নিলামদারের রেকাবিতে সেদিনও এমনি মোহরের পর মোহর জমেছিলো। কিন্তু অযোধ্যার নবাবের কাছে হার মেনেছিলেন দায়ুদ খাঁ।

অপমানে রাগে ফিরে আসতে হয়েছিলো তাঁকে।

এসে পত্তন করেছিলেন বিবিবাজার। অথচ সেই বিবিবাজারই চলে গেলো আলমগীরের রাজত্বে। পাঠান দায়ুদ খাঁর সাম্রাজ্য সঙ্কীর্ণ হতে হতে কোনো রকমে টিকে রইলো শুধু উড়িষ্যায়।

তাই রঘুনাথ বললে, অহঙ্কারের পতন অনিবার্য, দায়ুদ খাঁর মতো শোভা সিংহকেও নিঃস্ব হতে হবে একদিন।

কৃষ্ণরাম বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন, তা নয় রঘুনাথ। আমি ভাবছি বাংলার কথা। সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বিষ্ণুপুরই চিরকাল স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর-সবই মোগলের

পদানত। মোগল বাদশার অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওদিকে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার, এদিকে মোগলের। এ সময়ে স্থবাদার শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যথাসাধ্য মোগল অত্যাচারও কমাতে হবে সদ্ভাবের স্থযোগ নিয়ে। এ সময়ে যদি শোভা সিংহ বিদ্রোহ করে···

—বিদ্রোহ? চমকে উঠলো রঘুনাথ।

কৃষ্ণরাম বললেন, হ্যাঁ রঘুনাথ, আমি খবর পেয়েছি শোভা সিংহ বিবিবাজার থেকে উড়িষ্যার পথে চলেছে। সম্ভবত রহিম খাঁর সন্ধানে। পাঠান রহিম খাঁ মোগলের শত্রু, তার শিবিরের দিকে চলেছে শোভা সিংহ। কিন্তু একজন হিন্দু ভূমিপতিও যদি বিদ্রোহ করে, তা হলে পর্তুগীজ আর মগ দস্যুদের অত্যাচার বেড়ে যাবে, আর শায়েস্তা খাঁ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে আসবে চট্টগাঁ থেকে।

রঘুনাথ হেসে বললে, চট্টগাঁ? চট্টগাঁ অধিকার করেছে শায়েস্তা খাঁ। খবর পেয়েছি, চট্টগাঁ এখন ইসলামাবাদ। পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুরা বিতাড়িত হয়েছে সেখান থেকে।

কৃষ্ণরাম বললেন, সত্য হলে শুভসংবাদ। হিংস্রপশুর অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে বাংলার সীমান্তবাসীরা। কিন্তু এ সাফল্য স্থবাদার শায়েস্তা খাঁকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে রঘুনাথ, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে বাংলার হিন্দু প্রজার ওপর শায়েস্তা খাঁর সমস্ত নৃশংসতা নেমে আসবে।

রঘুনাথ হেসে বললে, শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলে সে-বিদ্রোহ দমনের ভার নিলাম আমি, রাজা কৃষ্ণরাম।

তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলো রঘুনাথ।

চার

প্রয়োজন হলে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞা করলো রঘুনাথ, তারপর কৃষ্ণরামের মধুকর থেকে বিদায় নিয়ে বিষ্ণুপুরের পথ ধরলো।

নিয়তি হয়তো গোপনে হাসলো রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা শুনে।

শৌর্য আর সত্যাশ্রয়ের আদর্শে গড়ে উঠেছে রঘুনাথ, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সতর্কে পদক্ষেপ করার কথা তাই উদয় হলো না তার মনে। যুক্তি নয়, হৃদয়ের ইচ্ছাই তাকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করলো।

অনুশোচনা হলো না তার জন্য, খুশী-মনেই বিষ্ণুপুরের পথে পুনরায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

ছু'পাশে শাল শিমুলের ঘন অরণ্য ভেদ করে শাহী সড়কের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চললো রঘুনাথের ঘোড়া। ক্রমশ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হলো খরস্রোত দামোদরের স্থিরবিদ্যুৎ। রজতাভ এক প্রাগৈতিহাসিক অজগরের মতো মনে হলো দূরের দামোদরকে। শাহী সড়কের ছু'পাশে শাল শিমুলের ঘন সবুজ অরণ্যে যেন উজ্জ্বল বসন্তের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাম্রাভ পাতায় ছেয়ে গেছে বন বনান্ত। আর গোধূলি-সন্ধ্যার আকাশের গায়ে ছোঁয়া লেগেছে সেই কুসুমাগ্নির। হয়তো বা রঘুনাথের মনের যৌবনেও।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল সেই রূপসী বাঁদীর মুখখানি শুধু বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, গুনগুন সুর তোলে।

—মিথ্যা ঔৎসুক্য দেখিও না রঘুনাথ!

জ্যোতিষাচার্য সাবধান করে দিতেই লজ্জায় অপ্রতিভ রঘুনাথের

মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিলো। লাল মেঘ নয়, আকাশের গায়েও বুঝি সেই শরমাতুর রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে।

খরদ্বিপ্রহরের ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছিলো রঘুনাথ। কিন্তু বিশ্রাম নিতে সাহস হলো না। দূরের দিকচক্রবালে মেঘ জমে উঠেছে। বাতাসের গায়ে আর্দ্র স্পর্শ। কালবৈশাখীর দুরন্ত গতিতে যেন মেঘ ছুটে আসছে, ক্রমশ ঢেকে ফেলছে লাল মেঘের ছায়া। পলাশের শীর্ষে তাম্রবর্ণ নতুন পাতার শিখা সন্ধ্যার ছায়ায় ম্লান হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বিষ্ণুপুর আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। তাই ক্লান্ত শরীরেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে রঘুনাথ। মনের মধ্যে গুনগুন করে শুধু একটি অজানা অচেনা নারীর মুখশ্রী। বাঁদীবাজারের এক যবনীর রূপ।

হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় দুরন্ত বেগে ছুটে এলো দূর দিগন্ত থেকে। সনসন শব্দে কেঁপে উঠলো অরণ্যভূমি। গাছের শাখায় শাখায় ঘা খেয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেজে উঠলো ঝড়ের তালে তালে। উন্মত্ত ঐরাবতের মতো একরাশ কালো মেঘের দৈত্য যেন ছুটে এলো হঠাৎ।

ধারাবর্ষণ শুরু হলো। প্রবল বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেলো রঘুনাথের।

পাহাড়ের পর পাহাড়। শাহী সড়ক ছেড়ে সর্পিল আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে, চড়াই উতরাই পার হয়ে কদমে কদমে ছুটে চললো রঘুনাথের সুশিক্ষিত আরবী ঘোড়া।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষ্ণুপুরে ফিরে যেতে হবে। বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহ রোগশয্যায় পড়ে আছেন। পিতার রোগশয্যার পাশে ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো রঘুনাথ।

মায়ের আদেশ মনে পড়লো রঘুনাথের। জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েই ফিরে আসার আদেশ দিয়েছেন রাজমহিষী। উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি অসুস্থ স্বামীর জন্য।

অন্ধকার খাড়াই পথ বেয়ে ছুটে চলেছিলো রঘুনাথের সাদা ঘোড়া।

পাহাড়ী ঢালু বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পিছনে তাকালো রঘুনাথ। কানে আসছে সুমিষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ।

অস্পষ্ট একটা মূর্তি চোখে পড়লো।

লাগাম টেনে ধরলো রঘুনাথ।

অন্ধকার পথে একজন সংবাদবাহী ছুটে আসছে যেন। হাতের লাঠিতে ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে চলেছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বিষ্ণুপুরের পথ ধরলো রঘুনাথ। সংবাদবাহীকে বাদশাহী সওয়ানে নেগার মনে হওয়ায় আর অপেক্ষা করলো না।

বিষ্ণুপুর প্রাসাদের আলোকমালা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন চোখের সামনে। বিড়াই নদীর তীর ধরে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলো।

দ্বাররক্ষী নত মস্তকে অভিবাদন জানিয়ে পথ ছেড়ে দিলো যুবরাজকে।

রঘুনাথ কুশল প্রশ্ন করলো প্রাসাদের।

রক্ষী বিষণ্ণ কণ্ঠে জানালো, মহারাজার অবস্থা সঙ্কটজনক। রাজবৈদ্য গোপনে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

দূর থেকে গানের রেশ ভেসে আসছে তখন।

রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, এ দুঃসময়ে গান কেন প্রাসাদে?

রক্ষী উত্তর দিলে, মদনমোহনের মন্দিরে সঙ্কীর্তনের আদেশ দিয়েছেন রানীমা। মহারাজার মঙ্গলের জন্যে অষ্টপ্রহরের ব্যবস্থা হয়েছে, যুবরাজ।

সঙ্কীর্তন!

প্রাসাদের কাছে এসে প্রহরীর হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেলো রঘুনাথ।

সঙ্কীর্তনে আকাশ বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে। কীর্তনীয়ার দলকে ঘিরে বসেছে রাজপরিবারের সকলে, সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবের দল।

আর কীর্তনমঞ্চের বেদীতে দুর্জন সিংহের পত্নী, বিষ্ণুপুরের রানীমা। রাজপ্রাসাদের অসূর্যম্পশ্যাও কীর্তনের সুরে সুর মিলিয়ে দেয় এখানে। বীর হাম্বীরের রানী সুদক্ষিণাও এমনিভাবে ভক্তির আনন্দে মিশে যেতেন প্রজাদের সঙ্গে।

মৃদঙ্গ আর অনুচ্চনাদ খোল করতালের মৃদু মধুর ধ্বনি যেন এক কল্পরাজ্যের আবেশ এনেছে মন্দির-প্রাঙ্গণে। গৌরচন্দ্রিকার নিঃসঙ্গ সঙ্গতে ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে যায় রঘুনাথ।

বেদীর ওপর রসাবিষ্ট ঢুলুঢুলু নয়নে গান গেয়ে চলেন রাজমহিষী।

মায়ের ভাবাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে রঘুনাথের সর্বশরীর।

রাজমহিষী নয়, যেন দেবীমূর্তি। কোলে রূপবান কিশোর গোপাল সিংহ, গোপাল বেশে সজ্জিত। ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার রসকলি, শরীরে বৃন্দাবনী অঙ্গবাস, কৃষ্ণচূড়া কবরীতে রক্তিম পুষ্পের স্তবক। পদলহরীর মাধুর্য যেন তাঁর নিরাভরণ দু'টি মসৃণ বাহুর ছন্দমুদ্রায় ঝরে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। মুখে প্রীতিপূর্ণ ভাবাবেশ। মৃদু মৃদঙ্গ বাজে। 'কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত। কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত!'

ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে আসে গীতমঞ্চ। শুধু শান্ত স্নিগ্ধ রাজমহিষীর কণ্ঠ-স্বর ভেসে আসে। তন্ময় হয়ে যায় রঘুনাথ। অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। রাজপত্নীর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে, আর কণ্ঠে শান্ত সঙ্গীত: 'বিপরীত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব, বান্ধব কুন্তল ভার। গাঁথি দুহুঁক হিয়ে পুন পহিরায়ব টুটল মোতিম হার।'

কীর্তনের পদ গুনগুন করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন রাজমহিষী। সভার কাছে বিদায় নমস্কার জানিয়ে মদনমোহনের মন্দিরে প্রণাম রেখে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

ঐশ্বর্যের বেশ নয়, সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবীর মতোই অঙ্গে তাঁর বৃন্দাবনী শাড়ি, কণ্ঠে স্বুবর্ণ তুলসীহার, মাথায় কৃষ্ণচূড়া কবরী, আর মুখে চন্দনের পুষ্পকলি, স্বগৌর বাহুতে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। কণ্ঠের সঙ্গীতের সঙ্গে শরীরের ছন্দও যেন নেচে চলে মধুর আবেশে।

কীর্তনীয়াদের ধীরস্বর পদলহরী ভেসে আসে—

হরি হরি কব, নব-পল্লব-শয়নে।

রতি-রণ-ছরমে, ঘরমে ছহুঁ বৈঠব, বীজন কিশলয় বিজনে॥

লোচন-খঞ্জন কাজরে রঞ্জব নব-কুবলয় ছুই কানে।

সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব, অলক করব নিরমানে॥

কিশোর গোপালকে 'জরিয়া' দাসীর হাতে দিয়ে ধীরে ধীরে রাজমহিষী এসে দাঁড়ালেন ছুর্জন সিংহের শয্যাকক্ষে। পিছনে রঘুনাথ।

সভাপণ্ডিত রাজবৈদ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিলেন রোগশয্যার পাশে। দাসীর দল পাখার বাতাস করছিলো বিষ্ণুপুররাজের শিয়রের কাছে।

রাজমহিষীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো রাজবৈদ্য।

ছুর্জন সিংহের শিয়রে পূজাপুষ্প স্পর্শ করিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রঘুনাথকে দেখতে পেলেন রাজমহিষী।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো রঘুনাথ। রাজমহিষী অস্ফুট কণ্ঠে আশিস উচ্চারণ করে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেবের সন্ধান পেয়েছো রঘুনাথ?

রঘুনাথ ধীরস্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ। কাজ শেষ করেই ফিরে আসবেন গুরুদেব।

পরক্ষণেই রঘুনাথের সিক্ত বেশবাসের দিকে চোখ পড়লো রানী-মার। বললেন, বেশ বদলে ফেলবে যাও রঘুনাথ, বিশ্রাম নেবে যাও।

বিদায় নিয়ে বেশ পরিবর্তন করে সঙ্গীত-কক্ষে এসে ঢুকলো

রঘুনাথ। রাজসিক বিলাসের মধ্যে বিশ্রাম চায় না রঘুনাথ। সঙ্গীতই তার বিশ্রাম, সঙ্গীতই সাধনা।

মখমলের গালিচায় শরীর এলিয়ে বসলো রঘুনাথ। শবরী দাসীকে ইঙ্গিত করতেই তানপুরা এনে দিলো সে।

তানপুরাটা কাছে টেনে নিয়ে ক্লান্ত হাতে টুং-টাং টুং-টাং ধ্বনি তুললো। ধীরে ধীরে গজল গানের সুর ফুটলো রঘুনাথের কণ্ঠে, বোল ফুটলো তানপুরার তারে।

কিন্তু মনের মতো তান খুঁজে পাচ্ছে না রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় এসে মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছে। কি এক অনাস্বাদিত পুলক।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল এক রূপসী বাঁদীকে দেখে জীবনে এই কি প্রথম নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলো সে! যবন-কন্যার রূপের ঝলকে কি যেন দাহ, কি এক অবোধ্য বেদনা।

অন্যমনস্কভাবে আবার তানপুরায় সুর তুলতে যাচ্ছিলো রঘুনাথ, হঠাৎ সম্মুখের সুবৃহৎ আয়নায় গদাধর চক্রবর্তীর প্রতিচ্ছবি পড়লো।

—এসো চক্রবর্তী। ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে গদাধর চক্রবর্তীকে কাছে বসতে বললো রঘুনাথ।

পরমুহূর্তেই রঘুনাথ দেখলে গদাধরের পিছনে কিশোর কৃষ্ণমোহন। গদাধরের শিষ্য। তাকেও ইশারায় আসন নিতে বললে রঘুনাথ।

রঘুনাথ তানপুরার তারে ধ্বনির তরঙ্গ তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলো, দিল্লীর খবর পেয়েছো চক্রবর্তী?

—পেয়েছি যুবরাজ। সঙ্গীত-সরস্বতীকে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চান আওরঙ্গজেব।

রঘুনাথ হেসে বললে, সুখবর বন্ধু। এই সুযোগ, সঙ্গীত-সরস্বতী এবার হয়তো বিষ্ণুপুরে এসে অধিষ্ঠিতা হবেন! কিন্তু ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ?

চক্রবর্তী বললো, হ্যাঁ, রাজী হয়েছেন দিল্লী ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে। ওস্তাদ পীর বক্সও রাজী হয়েছেন। কিন্তু…

বাকী কথাটুকু বলতে বিব্রত বোধ করলো গদাধর। কি ভাবে বলবে কথাটা। যে-বেতন একমাত্র আলমগীরের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য কি তা বহন করতে পারবে?

রঘুনাথ বুঝতে পারলো, কেন এ সঙ্কোচ।

বললো, থামলে কেন গদাধর, বলো, কি দক্ষিণা চেয়েছেন তাঁরা।

গদাধর লজ্জিতভাবে বললে, মাসিক পাঁচশো টাকা চেয়েছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। পীর বক্স সাহেবও…

রঘুনাথ হেসে বললে, চক্রবর্তী, মল্লশিবের পুজোয় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারে বিষ্ণুপুর, তা হলে সঙ্গীত-সরস্বতীর পুজোয় সামান্য হাজার টাকা দিতে পারবে না? লোক পাঠাও চক্রবর্তী, আমন্ত্রণ জানাও তাঁদের।

কৃষ্ণমোহন খুশী হয়ে বললে, সে ভার আমি নিলাম গুরুজী, এখন গান শুরু করুন যুবরাজ।

রঘুনাথ হাসলে।—চক্রবর্তীর সামনে আমাকে গান গাইতে বোলো না কৃষ্ণমোহন। দেবদত্ত কণ্ঠের কাছে আমার গান সুরের অপমান।

চক্রবর্তী ক্ষুব্ধ হলো। বললে, এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না যুবরাজ। সামান্য শিক্ষার্থী আমি। গুরুর পদে বরণ করতে চাই ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে। তবেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে আমার।

রঘুনাথ গদাধরকে তানপুরা এগিয়ে দিয়ে বললে, না চক্রবর্তী, তুমিই গাও। আমার মন আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে? কিন্তু কেন? প্রশ্ন করতে পারলো না কেউই। অথচ সে-কথা প্রকাশ করে বলতে পারলে হয়তো গোপন হৃদয়ের যন্ত্রণার লাঘব হতো, হয়তো স্বস্তি পেতো রঘুনাথ।

বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ীর চটুল চোখ মনে পড়লো আবার।

রঘুনাথের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দেখতে পেলো গদাধর, দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যই হয়তো তানপুরা তুলে নিলো। ধীরে ধীরে সুরের মূর্ছনায় ভরে গেলো সমস্ত পরিবেশ। রঙ্গনাথের সুরট চৌতাল: কাহে ব্রজ ছোড় চলি আয় জাওঅত…

গান শেষ করে গদাধর দেখলে ক্লান্ত রঘুনাথের কপালে স্বেদবিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে। সামনের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রঘুনাথ।

মৃদু হেসে কৃষ্ণমোহনকে ইশারা করলো গদাধর, তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলো। প্রাসাদের বাইরে এসে যমুনাবাঁধের পাড়ে গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো দু'জনে।

কৃষ্ণমোহন বয়সে তরুণ। কিন্তু রাজ্যের স্বপ্ন তার চোখে। মল্লবীরের রাজত্ব এই বন-বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের প্লাবন আনতে হবে। শুধু অসুরের শক্তি নয়, সুরের বন্যাতেও যেন চতুর্দিকে ভেসে যায় বিষ্ণুপুরের খ্যাতি।

আর এতোদিন পরে সে সুযোগ বুঝি ঘটলো। রাজা দুর্জন সিংহ রোগশয্যায়, রাজকবিরাজ গোপনে হতাশা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যুবরাজ রঘুনাথ সিংহাসন পাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। তখন, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ রঘুনাথের চেষ্টায় নিঃসন্দেহে নতুন জোয়ার আসবে সঙ্গীতের পৃথিবীতে।

কৃষ্ণমোহন বললে, আশ্চর্য সঙ্গীতপ্রীতি রঘুনাথের! পাঁচশো টাকা মাসোহারার কথা শুনেও এতোটুকু বিচলিত হলেন না যুবরাজ।

গদাধর মাথা নাড়লে কৃষ্ণমোহনের কথায় সম্মতি জানিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সেই জন্যেই বড়ো ভয় হয় কৃষ্ণমোহন।

—ভয় ? বিস্মিত হলো কৃষ্ণমোহন।

গদাধর বললে, বড়ো ভয় হয় কৃষ্ণমোহন, সিংহাসন পেয়ে যখন রাজকোষের দৈন্য চোখে পড়বে, তখন হয়তো অত্যাচারী হয়ে উঠবেন যুবরাজ, কিংবা অমিতব্যয়ী আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবেন। এক কথায় উনি ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্সকে আনাতে বললেন, কিন্তু এ তো বিচক্ষণতা নয় কৃষ্ণমোহন। যুবরাজের উচিত ছিলো রানীমার পরামর্শ গ্রহণ করা, উচিত ছিলো দেওয়ানজীর অনুমতি গ্রহণ করা।

কৃষ্ণমোহন উত্তর দিলো, মিথ্যা দুশ্চিন্তা আপনার, যুবরাজ সঙ্গীতের ভক্ত বলেই এতো সহজে রাজী হয়েছেন, বিষয়ান্তরে হয়তো এতো সহজে রাজী হতেন না।

গদাধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কি জানি! বিবাহের পর হয়তো পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। শুনেছি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সঙ্গে যুবরাজের বিবাহ দিতে চান রানীমা।

কৃষ্ণমোহন বললে, কিন্তু বর্ধমানরাজ কি…

গদাধর হেসে উত্তর দিলো, রাজনীতিতে সবই সম্ভব কৃষ্ণমোহন। জ্যোতিষাচার্য বিবিবাজারের মেলা থেকে বিষ্ণুপুরে আসবেন, তারপর কন্যার কোষ্ঠীবিচার করে যদি সম্মতি দেন…

জ্যোতিষাচার্যের গণনা! জ্যোতিষাচার্যের কোষ্ঠীবিচার!

বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষবংশের গণনাকে বড়ো ভয় পায় সকলে। বড়ো নির্দয় সে গণনা। বড়ো বেশী অভ্রান্ত।

দূরে বিড়াই নদীর তীরে দৈবজ্ঞপল্লী চাকদহের আকাশে তখন মৃদু মৃদু ঢোলকের আওয়াজ উঠছে। আর যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠছে দুলে দুলে।

সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেলো কৃষ্ণমোহন।

দৈবজ্ঞের গণনায় ভুল ছিলো না সেদিন। ভুল অর্থ বুঝেছিলেন মল্লরাজ বীর হাম্বীর। কুঞ্জ দৈবজ্ঞ আর বিদুর দৈবজ্ঞ সেদিন

রাজসভায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিচার করতে করতে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বলেছিলেন, মহারাজ, বিষ্ণুপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে বহুমূল্য রত্ন। ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন-ঐশ্বর্য আজ সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করে চলেছে, এ ঐশ্বর্য বিষ্ণুপুর-রাজ্য কোনোদিন ভোগ করেনি, সারা ভারতে এ রত্নের তুলনা মিলবে না।

বীর হাম্বীর বিচলিত হয়ে উঠলেন সে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। দৈবজ্ঞদের বিদায় দিয়ে বিশ্রামকক্ষে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, বিশ্রাম-কক্ষ থেকে অন্দরমহলে।

দাসীদের পরিচর্যা অসহ্য মনে হলো তাঁর। রানী সুদক্ষিণার মধুর হাস্য দেখে বিরক্তি বোধ করলেন। তখন ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলেছে তাঁর মনে।

তুলনাহীন রত্ন-ঐশ্বর্য! কল্পনার চোখে বীর হাম্বীর দেখলেন, দু'হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মণিমুক্তা মাণিক্য, হীরে আর জহরত বিলিয়ে দিচ্ছেন তিনি অন্দরমহলের দাসীদের উদ্দেশ্যে। আর সবচেয়ে মূল্যবান কণ্ঠহারটি যেন পরিয়ে দিচ্ছেন রানী সুদক্ষিণার গলায়।

বিচলিত মনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দেহরক্ষীর উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন রাজা বীর হাম্বীর।

দেহরক্ষী ছুটে এলো।

বীর হাম্বীর বললেন, পঞ্চাশজন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে তৈরী হতে বলো। বলেই ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

প্রাসাদের সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলো, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন বিষ্ণুপুররাজ, আর তাঁর পিছনে পিছনে পঞ্চাশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী।

দস্যুর লোভ জেগে উঠেছে তখন তাঁর উষ্ণ রক্তে। দৈবজ্ঞের নির্দেশ অভ্রান্ত—জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের লোভে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বীর হাম্বীর, রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের দিকে।

নির্দিষ্ট পথের পাশে গোপনে বসে রইলো পঞ্চাশজন অনুচর। রত্নের প্রতীক্ষায়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। কিন্তু কোনো পথিকের দেখা নেই। তবে কি দৈবজ্ঞের গণনা ভুল?

তরবারি বের করে প্রতিজ্ঞা করেন বীর হাম্বীর, জ্যোতিষীর গণনা ভুল প্রমাণিত হলে এই তরবারিই তার শাস্তি দেবে। গণনা যদি সত্য হয়, তা হলে এই তরবারিই সে-রত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে, রাজকোষের সম্পদ বাড়াবে।

অধৈর্য আবেগ চেপে গোপনে বসে থাকেন মল্লরাজ, প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়ে আসে।

হঠাৎ এক সারি ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন বীর হাম্বীর। তিনটি গরুর গাড়ি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ঈপ্সিত রত্ন কি থাকতে পারে এই দরিদ্র যাত্রীদের কাছে? কে জানে, হয়তো দস্যুর সন্দেহ নিরসনের জন্যেই এই দারিদ্র্যের ছদ্মবেশ!

আনন্দে অধীর হয়ে বীর হাম্বীর অনুচরদের ইশারা করলেন। চতুর্দিক থেকে বজ্র-গর্জনে লাফিয়ে পড়লো অনুচরের দল।

রত্নপেটিকার সঙ্গে আরোহীদেরও বন্দী করে নিয়ে এলেন বীর হাম্বীর।

কিন্তু প্রাসাদে এসে পেটিকার আবরণ উন্মোচন করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

রত্ন? হ্যাঁ, অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার। হীরে জহরত নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য পাণ্ডুলিপি। বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব-চূড়ামনি শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গুরুস্থানীয়দের আদেশে কৃষ্ণের প্রিয় দুঃখী শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য এবং নরোত্তম ঠাকুর এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলেছেন গৌড়ে।

লজ্জায় অনুশোচনায় শ্রীনিবাসের পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চাইলেন বীর হাম্বীর। বললেন, গুরুদেব, মার্জনা করুন এ নির্দয় দস্যুকে,

পরিত্রাণের পথ দেখান। অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি সত্য, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিন আমাকে।

দীক্ষা নিয়েছিলেন বীর হাম্বীর, আর সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো সেদিন। বিষ্ণুপুরের নাম হয়েছিলো গুপ্ত-বৃন্দাবন।

কিন্তু দস্যুরাজ বীর হাম্বীর ভক্তিরসে অবগাহন করেও তাঁর মনের পাপ ধুয়ে ফেলতে পারলেন না।

বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরী করালেন কালাচাঁদের বিগ্রহ। কিন্তু সে বিগ্রহে প্রাণের সন্ধান পেলেন না তিনি। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অনুসন্ধান করে বেড়ালেন এমন এক মূর্তি যার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ মিলবে।

পরিব্রাজক বীর হাম্বীর হঠাৎ একদিন খুঁজে পেলেন মদনমোহনের বিগ্রহ। বৃষভানুপুরে ধরণী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়ে দেখতে পেলেন সেই মনোহর মূর্তি, দেখে মুগ্ধ হলেন বীর হাম্বীর। লোভ জেগে উঠলো তাঁর দস্যুহৃদয়ে।

মদনমোহনকে নিশীথের অন্ধকারে বুকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে এলেন তিনি, এনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

মদনমোহন এসেছেন সত্য। প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিষ্ণুপুর রাজ্যে। অত্যাশ্চর্য এক প্রেমের বাণী শুনতে পেয়েছে কৃষ্ণমোহন। কিন্তু কবে মুরলীধরের বংশীধ্বনিতে সঙ্গীতের প্লাবন আসবে বিষ্ণুপুরে? অনুশোচনায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো কৃষ্ণমোহন। প্রেমের দেবতা মদনমোহনকে চায় সে সুরের দেবতারূপে।

সঙ্গীতসাধনার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই দিনের পর দিন কেটে চলে তিন সঙ্গীত-সাধকের। গদাধর চক্রবর্তী, রঘুনাথ, কৃষ্ণমোহন।

সেদিনও এমনি এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে বাঁশী

বাজাতে শুরু করলো কৃষ্ণমোহন, আর কল্পনার চোখে দেখলো, যেন বাঁশীর সুরে ছুটে এসেছেন শ্রীরাধিকা, আর শ্রীরাধার পিছনে মুরলীধর।

বাঁশী শুনতে শুনতে হঠাৎ গদাধর বলে উঠলো, আসবে সে! আসবে।

—কে আসবে গদাধর ?

পিছন থেকে কে যেন কৌতুকের কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

চমকে ফিরে তাকালো ছু'জনেই। আবছা অন্ধকারে যমুনাবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ঋজু মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে গদাধর বললে, গুরুদেব, আপনি!

পাঁচ

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বিদায় জানিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো হীরাবাঈ। আহত অভিমানে ফুলে ফুলে উঠলো, অশ্রু টলমল করলো তার চোখের কোণে।

তার রূপের মোহমন্ত্র ব্যর্থ হলো শোভা সিংহের কাছে। তার বিনীত অনুরোধকে উপেক্ষা করলো মেদিনীপুরের সামান্য এক ভূম্যধিকারী।

উন্মত্ত আস্ফালনে কাঞ্চনীর আসরের সৌজন্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে চলে গেলো শোভা সিংহ।

চিৎকার আর হট্টগোল শুনে ছুটে এলো আশপাশের বাঈজীর দল। উঁকি মারলো কিংখাবের পর্দা সরিয়ে। কৌতুকের চোখে। হীরাবাঈয়ের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চরোল বিদ্রূপের হাসি হাসলো তারা।

তাদের বাঁকা হাসির বিদ্যুৎ এসে বিঁধলো হীরাবাঈয়ের বুকে।

মনে হলো জীবনে সে এমন অপমানিত বোধ করেনি কখনো। তার সুর্মা-টানা চোখের চটুল কটাক্ষের কাছে বশ মেনেছে কতো রাজা বাদশা, কতো শ্রেষ্ঠী আর ফিরিঙ্গী বণিক। তার মুজরার সুর ভেঙে দিয়ে যেতে সাহস পায়নি কেউ।

অথচ সামান্য এক ভুঁইয়া কিনা হীরাবাঈয়ের আসরে দম্ভের আস্ফালন দেখিয়ে তার সম্মান মাটিতে লুটিয়ে দিলো।

বাঈতল্লাটে এসে জমেছিলো সারা হিন্দুস্থানের নামী বাঈজীর দল। কাশ্মীরী এবং কুমায়ুনী, দিল্লী আর লক্ষ্ণৌ, যোধপুরী আর দক্ষিণী—হাজারো ঘরানার সুরসুন্দরীদের সামনে হীরাবাঈয়ের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেলো এক তুচ্ছ তালুকদার।

সহ-সাধিকাদের সামনে হীরাবাঈয়ের অপমান করে গেলো শোভা সিংহ। সাধারণ বেশ্যার ঘরেও মত্তপ ইয়ারদোস্তরা এভাবে ঈর্ষা আর কলহের বীজ বুনে দিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হয়। বাঈজীর আসরের রীতিনীতি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেলো শোভা সিংহ।

লজ্জায় অপমানে অন্য অন্য কাঞ্চনীদের কাছে মনে মনে ছোটো হয়ে গেলো হীরাবাঈ। সব গৌরব টলে পড়লো তবল্‌চী অযোধ্যাপ্রসাদের সামনে। আপন ঐশ্বর্যের জলুসে বারে বারে যার চোখ ঝলসে দিতে চায়, তাচ্ছিল্যের আঘাত হানতে চায় যাকে, তারই চোখের সামনে হীরাবাঈয়ের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গেলো শোভা সিংহ।

তাই রেশমী রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে ওস্তাদ সৌকত খাঁকে বললে, তাঁবু তুলতে বলো ওস্তাদজী, আগ্রায় ফিরে যাবো আমি।

বুড়ো সৌকত খাঁ মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, কেন বেটি, মেলা শেষ হবার আগেই ফিরে যাবি কার ওপর রাগ করে?

হীরাবাঈ কান্নার স্বরে বললে, শোভা সিংহ আমার ইজ্জত ভেঙে দিয়ে গেছে ওস্তাদজী।

ইজ্জত।

সত্যি, ওস্তাদ সৌকত খাঁ হীরাবাঈয়ের আসরে এমন ঘটনা কখনো দেখেনি! বাঈজীর আসরের আদব জানে না কাফের?

হীরাবাঈ বললে, শোভা সিংহকে এর জবাব পেতে হবে ওস্তাদজী, হীরাবাঈয়ের ইজ্জতকে যেমন সে ধুলোয় লুটিয়েছে, এমনি ধুলোয় লুটিয়ে দেবো তার শিরোপা।

এই প্রতিশোধের বাসনা নিয়েই কি বিবিবাজারের কালো বোরখার রহস্যময়ী বাঁদীকে কিনে নিলো হীরাবাঈ? কে জানে।

নিলামদারের হাতে গুনে গুনে একশো মোহর তুলে দিয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বাঁদীকে কিনে নিলো হীরাবাঈ।

নৃত্যনটীর সুডোল বাহুর আলিঙ্গনে সহানুভূতির আশ্রয় পেলো লালী। ফিসফিস করে হীরাবাঈ জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার বহিন?

বহিন? চমকে উঠলো বাঁদী।

ভয়ভীরু স্বরে বললে, লালী।

মৃদু হাসলো হীরাবাঈ।—লালী, না লয়লী?

তারপর ধীরে ধীরে বললে, বাঁদী নও তুমি, তুমি আমার বহিন। আমার এ গরিবখানা আজ থেকে লালীর দৌলতখানা হয়ে উঠবে।

শুনে অপ্রতিভ হাসি হাসলে লালী।

কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি হীরাবাঈয়ের দৌলত। চোখ ঝলসে গেলো তার। হীরাবাঈয়ের তাঁবুর জলুস দেখেই চোখ ঝলসে গিয়েছিলো, আগ্রার অট্টালিকা দেখে বিমূঢ় হয়ে গেলো সে।

নারীর পায়ে এতো ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে পারে পুরুষ, জানতো না। জানতো না, নবাবী রঙমহলের বাইরেও এমন রত্নালঙ্কারের ছড়াছড়ি।

একশো মোহর দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে এলো হীরাবাঈ। নিয়ে এলো আগ্রার হীরামহলে।

'আজ থেকে তুমি বাঁদী নও, আমার বহিন তুমি।'

শুনে লালী বিস্মিত হয়েছিলো সেদিন। ভেবেছিলো সুরাসক্তা হীরাবাঈয়ের খেয়াল হয়তো। হয়তো বা রাত পোহালেই সব ভুলে যাবে, ক্রোধে ফেটে পড়বে হীরাবাঈ তার এই রাত্রির বিভ্রান্তির জন্যে।

ছাদের ওপর নরম গালিচায় শুয়ে হীরাবাঈ তাকিয়ে ছিলো অন্ধকার আকাশের দিকে, আকাশের ক্ষীণালোক তারার দিকে।

নিঃশব্দ অন্ধকারে হীরাবাঈয়ের পাশে অস্বস্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে

বসে ছিলো লালী। চোখ ছিলো অট্টালিকার ওপর নুয়ে-পড়া দেওদার গাছের পাতায়, পাতার ফাঁকে উঁকি দেওয়া ভাঙা চাঁদের ম্লান আলোর দিকে। তন্ময় হয়ে নিজের বিচিত্র অতীত ইতিহাস ভাবছিলো লালী। দুঃখের, আশঙ্কার জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে এ কোন রহস্যের আশ্রয়ে এসেছে সে!

হঠাৎ লালীর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো হীরাবাঈ। আবার বললে, বাঁদী নও তুমি লালী, তুমি আমার বহিন।

চমকে উঠলো লালী। দেওদার গাছের শাখায় একটা রাত-পাখি ঝটপট করলো তাই, না হীরাবাঈয়ের প্রলাপ শুনে?

লালী কোনো কথা বললো না।

হীরাবাঈ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসলো। বললে, তোমাকে না পেলে আমার সব বরবাদ হয়ে যেতো লালী। সব বরবাদ হয়ে যেতো।

এবারও কোনো উত্তর দিলো না লালী। নিঃশব্দে রুপোর পাত্রে সুরা ঢেলে দিলে, বাঁদীর মতোই বিনীত ভঙ্গিতে, বিনত লজ্জায়।

পাত্রটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখলো হীরাবাঈ।

ধীরে ধীরে বললে, লালী, কতো খুঁজেছি তোমাকে, সারা দুনিয়া ঘুরেছি তোমার খোঁজে, শেষে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ বিবিবাজারে দেখা পেলাম তোমার।

বিস্মিত একজোড়া চোখ চেয়ে লালী প্রশ্ন করলে, আমাকে? আমাকে চিনতেন আপনি বাঈসাহেবা?

খিলখিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ।

বললে, হ্যাঁ, তোমাকে দেখেই চিনেছি আমি। তুমিই পারবে। পারবে না আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে? আমার নাচ আর গানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তুমি?

এ কি উন্মাদের কথা হীরাবাঈয়ের মুখে? অনভিজ্ঞ লালী

ভাবলে, সুরার নেশাতেই বুঝি অর্থহীন প্রলাপ বকে চলেছে হীরাবাঈ। তাই ভয়ে ভয়ে লালী অস্ফুটে বললে, পারবো।

—পারবে, নিশ্চয় পারবে। গভীর আবেগে লালীর হাতটা মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধরলো হীরাবাঈ।

তারপর সুন্দর একটি লীলায়িত মুদ্রায় তালি দিলো হাতে। সে আওয়াজ শুনে ছুটে এলো মণিবানু। মাথা নুইয়ে বললে, ফরমাইয়ে বাঈসাহেবা।

ঢুলুঢুলু স্বপ্নরঙিন চোখে হীরাবাঈ বললে, শরবত। তারপর একটু থেমে বললে, আর তানপুরা।

কুর্নিশ করলে মণিবানু। হুকুম তামিল করতে চলে গেলো। আর যাবার সময় একবার ফিরে তাকালো লালীর দিকে।

সে দৃষ্টিতে ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পেলো লালী।

হীরাবাঈ তাকে একশো মোহর দিয়ে কিনে নিয়েছিলো বিবিবাজার থেকে। হাজারো বান্দা আর বাঁদী লালীর সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়েছিলো সেদিন।

আর মণিবানু চুপিচুপি বলেছিলো, বাঁদীবাজারে তোর মতো নসিব নিয়ে কেউ কখনো আসেনি লালী। আর আমাকে হয়তো সারাজীবন কাফরী খোজার মার খেয়ে মরতে হবে।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো মণিবানু।

সে দীর্ঘশ্বাসের ব্যথা ভুলতে পারলো না লালী। সহানুভূতিতে চোখে জল এলো বাঁদীতল্লাট ছেড়ে আসার সময়। দুঃখ হলো মণিবানুর দুঃসহ নসিবের কথা ভেবে।

একশো মোহর ছুঁড়ে দিয়ে হীরাবাঈ লালীকে নিয়ে এলো তার তাঁবুতে। স্নেহের বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, কি পেলে তুমি সুখী হবে লালী, কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে?

এ আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না লালী। প্রশ্ন না রসিকতা, বুঝতে পারলো না। পুনরায় প্রশ্ন করলে হীরাবাঈ।

বললে, কি চাও লালী, বলো। কি পেলে হাসি ফুটবে তোমার হাসিনা মুখে?

লালী উত্তর দিলে, মণিবানুকেও নিয়ে আসুন সাহেবান্।

খিলখিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ। পাঁচ মোহর কিম্মতের একটা বাঁদী চায় লালী? আর কিছু নয়?

লালীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে মণিবানুকেও কিনে আনলো হীরাবাঈ। বললে, এই নাও লালী, তোমার পাঁচ মোহরের বাঁদী।

বাঁদী? না, না, বাঁদী নয়, বন্ধু। একান্তে সে মণিবানুকে সোহাগে জড়িয়ে ধরেছিলো সেদিন, আনন্দের অশ্রু ঝরেছিলো তার চোখে।

অথচ সেই মণিবানুর চোখেই আজ ঈর্ষার জ্বালা!

আর লালী? হীরাবাঈয়ের সহানুভূতি তার চোখে স্বপ্ন দিয়েছে।

স্বপ্ন দেখে সে চাঁদনি রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে।

হয়তো জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা নয়। হয়তো হীরাবাঈয়ের মুজরা থেকেই কোনো নবাবজাদা তুলে নিয়ে যাবে তাকে। শাদি নয়, সুখ আর আনন্দ। সুরা আর ঐশ্বর্যের অবগাহনেই হয়তো জীবন কাটবে তার।

'একদিন একটি রাজ্যপরিচালনা করার শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়'। জ্যোতিষাচার্যের কথাটা বার বার মনে পড়লো লালীর। পুরুষকে জয় করবার, ঐশ্বর্য জয় করবার স্বপ্নময় উন্মাদনা জেগে উঠলো তার উষ্ণ রক্তে।

ঐশ্বর্যের লোভে ভুলে গেলো সেই সুপুরুষ চেহারার সাদা-ঘোড়ার সওয়ারকে।

ছয়

ভোরের সানাই শুনে ঘুম ভেঙে গেলো রঘুনাথের।

দীর্ঘপথ অশ্বারোহণের অবসাদ দূর হয়েছে শরীরের। ম্লান হয়ে এসেছে অনভিজ্ঞ যৌবনের প্রথম রোমাঞ্চ। তবু অকস্মাৎ যেন মনের পটে ক্ষণিকের জন্যে ভেসে উঠলো যবনীর সুতীব্র রূপের ঝলসানি।

স্নানাগার থেকে সিক্তকেশে অলিন্দে এসে দাঁড়ালো রঘুনাথ। গৌরবর্ণ নিরাবরণ ঊর্ধ্ব দেহে জলের বিন্দু চিকচিক করে উঠলো মুক্তামালার মতো। ঊষার রক্তিম আলোকে আরো সুন্দর হয়ে উঠলো রঘুনাথ। অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখলে রুগ্নশরীর নিয়েই প্রতিদিনের মতো দর্শন-গবাক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহ আর রাজমহিষী। রাজপত্নীর ক্রোড়ে সুন্দরকান্তি কিশোর গোপাল সিংহ, রঘুনাথের অনুজ।

প্রাসাদ-নিম্নের পথে জনতা ভিড় করে আছে রাজা ও রাজপত্নীর দর্শন পাবার জন্যে। প্রত্যূষে রাজদর্শন শুভকর, তাই বিষ্ণুপুর-অধিবাসীরা চিরন্তন প্রথায় রাজদর্শন করে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে যাচ্ছে।

জনতা রঘুনাথের দর্শন পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করলো। জয়ধ্বনি তুললো রঘুনাথের। তৃপ্তির হাসি দেখা দিলো দুর্জন সিংহের মুখে, রাজপত্নীর চোখে। একবার জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনাথের মুখের দিকে, একবার কনিষ্ঠপুত্র গোপালের মুখের দিকে তাকালেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভবিষ্যৎ বিষ্ণুপুর-রাজকে পেলেন রানীমা। স্নিগ্ধ আবেশে হাসলেন রঘুনাথের চোখে চোখ রেখে। আর রঘুনাথ অপ্রতিভ বোধ করলো। লজ্জা লুকোবার জন্যে যমুনাবাঁধের কালো জলের দিকে তাকালো রঘুনাথ।

এক ঝাঁক পারাবত প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে উড়ে গেলো। যমুনাবাঁধের

জলে নেমে এলো এক দল রাজহাঁস। নিথর কালো জলে স্নান করছে পুরাঙ্গনার দল। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দাসীর ডাকে চমক ভাঙলো।

ফিরে তাকালো রঘুনাথ।

দাসী জানালো, গোপনে তাঁর সাক্ষাৎ চায় এক পত্রবাহক। মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে সে।

বিস্মিত হলো রঘুনাথ। প্রশ্ন করলে, কার পত্রবাহক? বর্ধমানরাজের?

কৌতুকে হেসে উঠলো দাসী। বললে, বর্ধমানরাজের চিঠির অপেক্ষাতেই কি দাঁড়িয়ে আছেন যুবরাজ?

দাসীর অবিনীত রসিকতায় ক্রোধ প্রকাশ করে দ্রুত পায়ে মদনমোহন মন্দিরের দিকে পা বাড়ালো।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সংবাদবাহীকে অপেক্ষা করতে দেখে প্রশ্ন করলে, কার সাক্ষাৎ চাও তুমি?

—আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি যুবরাজ। বলে নত-মস্তকে একখানি চিঠি দিলো সে রঘুনাথকে। বললে, মেদিনীপুর থেকে আসছি আমি, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা এ চিঠি আপনার হাতে গোপনে পৌঁছে দিতে আদেশ দিয়েছেন।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো রঘুনাথের কপালে। শোভা সিংহের কন্যা কুমারী চন্দ্রপ্রভা গোপনে চিঠি লিখেছে রঘুনাথকে?

প্রাসাদে খাজাঞ্চীখানায় পত্রবাহককে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে আপন কক্ষে ফিরে এলো রঘুনাথ। দাসীকে আদেশ দিলো পত্রবাহকের আহার বিশ্রামের পর্যবেক্ষণ করতে। পাঁচটি রজতমুদ্রা আর একজোড়া বস্ত্র উপহার পেয়ে বিদায় নিলো সে।

আর, চিঠি পড়ে বিস্মিত হলো রঘুনাথ।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার করুন মিনতিতে ভরা চিঠি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের প্রণয়-ভিক্ষা যেন।

বড়ো বিচলিত বোধ করলো রঘুনাথ। একি অদ্ভুত আমন্ত্রণ? কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় রঘুনাথের।

শৈশবের একটি তুচ্ছ ঘটনা কি এভাবে দু'টি মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে ফেলতে পারে এক সূত্রে?

বিস্মৃতপ্রায় একটি দৃশ্য ভেসে উঠল রঘুনাথের চোখের সামনে।

জগন্নাথধাম থেকে ফিরে আসছিলো তীর্থযাত্রীর দল। শত শত নারীপুরুষ। কন্যকা, কুমারী, যুবতী আর বৃদ্ধা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ। হঠাৎ খবর এসে পৌঁছলো রাজা দুর্জন সিংহের দরবারে। গুপ্তচরের মুখে দুঃসংবাদ শুনলেন দুর্জন সিংহ : হার্মাদ দস্যুদের পঞ্চাশখানি সমুদ্রতরী দেখা গেছে বঙ্গোপসাগরে। সশস্ত্র পর্তুগীজ দস্যুর দল নাকি যাত্রা করেছে জগন্নাথধামের উদ্দেশে। হার্মাদ দস্যুর কথায় সেদিন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন দুর্জন সিংহ।

পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার আর লুণ্ঠনের কথা অজানা ছিলো না। বালেশ্বর উপকূলের একটি দৃশ্য মনে পড়েছিলো দুর্জন সিংহের। পাঁচ হাজার নারী পুরুষকে বন্দী করে এনে 'কড়ি' আর 'দামে'র মূল্যে তাদের বেচে দিয়ে গিয়েছিলো ফিরিঙ্গী দস্যুর দল। লুণ্ঠন করেছিলো উপকূলের শত শত গ্রাম। ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছিলো নারীত্ব। কৌমার্য আর সতীত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো দস্যুদের অত্যাচারে। বিবাহ মণ্ডপ ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিলো, লুটে নিয়ে গিয়েছিলো হাজারো সুন্দরী গৃহস্থবধূকে।

তাই দুর্জন সিংহ বলেছিলেন, মোগল শক্তি হার্মাদ দস্যুদের বাধা দিতে না পারলেও বিষ্ণুপুরকে এগিয়ে যেতে হবে। উড়িষ্যার সমুদ্রতীর রক্ষা করতে হবে ফিরিঙ্গীর অত্যাচার থেকে। কিন্তু···

সভাসদরা বুঝলেন দুর্জন সিংহের দুশ্চিন্তা। উড়িষ্যা আর বাংলার প্রান্তবর্তী রাজ্য বিষ্ণুপুর। হার্মাদের দুঃসাহস ক্রমশই বেড়ে চলেছে তখন। হয়তো বালেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর অভিমুখেও যাত্রা করবে

পর্তুগীজ অসুরের দল। অন্যদিকে বর্গীদের আশঙ্কা। ঘোড়সওয়ার বর্গী দস্যুরা মাঝে মাঝে এসে পৌঁছচ্ছে তখন উড়িষ্যার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত, পাঠান শক্তি তাদের বাধা দিতে পারছে না।

সভাসদরা মন্তব্য করলে, এ সময় বিষ্ণুপুর ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হবে না মহারাজ। বর্গী শত্রুর হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্যে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।

দুর্জন সিংহ বললেন, কিন্তু হার্মাদের হাত থেকেও বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করতে হবে।

উভয় সঙ্কটের মধ্যে কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না দুর্জন সিংহ। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বিষ্ণুপুর রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে পর্তুগীজ শক্তিকে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারে?

যুবরাজ রঘুনাথ তখন কিশোর।

সহাস্য মুখে এগিয়ে এলো সে। বললে, আছে।

খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন দুর্জন সিংহ।

মাত্র একশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করলো রঘুনাথ।

সমুদ্র-তীরে শিবির ফেলে অপেক্ষা করলো গুপ্তচরের নির্দেশের জন্যে।

জগন্নাথধাম থেকে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী তখন ফিরে চলেছে রথযাত্রা দর্শন করে। এমন সময় হঠাৎ খবর এসে পৌঁছলো কিশোর রঘুনাথের কাছে: হিজলীর বন্দরে জাহাজ রেখে বালেশ্বরের দিকেই এগিয়ে আসছে দস্যুসেনা।

মাত্র একশো অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে গেলো রঘুনাথ।

গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে চলেছে তখন হার্মাদের দল। নৃশংস অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। হাজার হাজার নারী আর পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে একদল দস্যু, আরেকদল এগিয়ে আসছে তীর্থযাত্রীদের সন্ধানে।

বন্দীদের হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত চালিয়ে পশুর মতো টানতে টানতে রণপোত বোঝাই করতে নিয়ে চলেছে তাদের। হয়তো অন্য কোনো বন্দরে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবার জন্যে।

মাত্র একশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক কিশোর রঘুনাথ ছুটে চললো তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

চাঁদবানীর কাছে এসে দেখা মিললো তীর্থযাত্রীদের। পঙ্গপালের মতো চলেছে তারা, নিশ্চিন্ত মনে। সামনে একটি সুসজ্জিত হাতি। হাওদার রঙিন পর্দা উড়ছে বাতাসে। দূর থেকে একটি কিশোরী-মুখ দেখতে পেলো রঘুনাথ, রঙ-ঝলমল হাওদার ওপর। কিন্তু কে এই আরোহিণী? রঘুনাথ বুঝতে পারলো না। পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে উঠলো তার মনে।

পিছন থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য রেখে চললো রঘুনাথ। এমন সময় হঠাৎ আসুরিক চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো পর্তুগীজ দস্যু। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর মুক্ত অসি নিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। গভীর অরণ্যে লুকিয়ে দূরবীক্ষণ চোখে দিয়ে দেখতে পেলো রঘুনাথ। তাদের সংখ্যাধিক্য আর নৃশংসতা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো সে। গৌরবর্ণ সুপুরুষ চেহারা তাদের, গায়ে লাল মখমলের কুর্তা, মাথায় উজ্জ্বল সবুজ রঙের শিরস্ত্রাণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে রঘুনাথ দেখলো হাতির পিঠে হাওদার ওপর উঠে দাঁড়ালো একটি কিশোরী সুদর্শনা, হাতে তার উন্মুক্ত অসি।

সঙ্গে সঙ্গে ইশারা করলো রঘুনাথ। একশো অশ্বারোহী বীর-বিক্রমে বন্যার মতো ভেঙ্গে পড়লো পর্তুগীজ দস্যুদের ওপর।

প্রদাতিক হার্মাদদের দল বিমূঢ় হয়ে পড়লো। ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়লো তাদের দ্বিখণ্ডিত শরীর।

কিন্তু পরমুহূর্তে রঘুনাথ দেখলো, তেজোদ্দীপ্তা কিশোরীর হাত

লালবাঈ—৪

থেকে তরবারি খসে পড়েছে, আর দু'দিক থেকে দু'জন পর্তুগীজ দস্যু তাকে বন্দী করবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

রঘুনাথের ঘোড়া লাফিয়ে পড়লো তাদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে সেই কিশোরীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো রঘুনাথ।

সেই সময়েই কামানের ধ্বনি শোনা গেলো। শ্বেত পতাকা তুলে দূরে সরে গেলো রঘুনাথ। বুঝলো, মোগল সৈন্যও এসে পৌঁছেছে।

মোগলের কামান আর বিষ্ণুপুরের বীরত্বের পায়ে প্রাণ দিলো শত শত পর্তুগীজ দস্যু, নিশ্চিহ্ন হলো সমগ্র হার্মাদের দল।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে নামলো কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।

কে জানতো সে-দৃষ্টি শুধু কৃতজ্ঞতার নয়, দেহ মন প্রাণ সমর্পণের।

যে-জীবন একদিন রঘুনাথই বাঁচিয়েছিলো, সে-জীবন যে এমন ভাবে জড়িয়ে যাবে তার চলার পথের সঙ্গে, কোনোদিন কল্পনাও করেনি সে।

সাত

রঘুনাথের অনভিজ্ঞ যৌবন তখন মনে মনে অন্য এক স্বপ্ন বুনে চলেছে।

শোভা সিংহের কন্যার কাছ থেকে এসেছে রহস্যময় আমন্ত্রণ। দূতের হাতে গোপন পত্র দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে চন্দ্রপ্রভা।

সুদীর্ঘকাল পূর্বের সেই অপরূপ দৃশ্য বারংবার ভেসে ওঠে রঘুনাথের মনের পটে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেই সুদর্শনার মুখচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তার কল্পনার চোখে।

চন্দ্রপ্রভা! চন্দ্রপ্রভার এই অদ্ভুত আমন্ত্রণের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না রঘুনাথ। অকস্মাৎ যে একদিন পর্তুগীজ দস্যুর আক্রমণ থেকে তীর্থযাত্রিণী চন্দ্রপ্রভাকে বাঁচিয়েছিলো, তারই শৌর্যের মোহে কি রূপময়ী চন্দ্রপ্রভা প্রণয়ের মালা গেঁথেছে এই দীর্ঘদিনের অবসরে?

চন্দ্রপ্রভার চিঠিটা আবার পড়লো রঘুনাথ। অপরূপ ছন্দোময় এক টুকরো চিঠি। প্রতিটি অক্ষরে যেন কোমল যৌবনের স্পর্শ।

বিবিবাজারের আবছায়ায় দেখা বোরখা-আড়াল এক রূপসী বাঁদীকে দেখে জীবনে প্রথম নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলো রঘুনাথ, কিন্তু সে-রূপের ঝলকে ছিলো দাহ, ছিলো এক অবোধ্য বেদনা। চন্দ্রপ্রভার চিঠি যেন চন্দনধূপের স্নিগ্ধ সুগন্ধ। যৌবন-জ্বালার শরীরে জ্বালাহর প্রলেপ।

চন্দ্রপ্রভার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না রঘুনাথ।

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে একখানি বজরা নিয়ে। সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণমোহন এবং সশস্ত্র দেহরক্ষী। মনে সন্দেহ উঁকি দেয় মাঝে মাঝে। হয়তো শোভা সিংহেরই কৌশল, হয়তো প্রবঞ্চনা করে

রঘুনাথকে বন্দী করতে চায় অহঙ্কারী ভূস্বামী। তাই গোপনে দেহরক্ষীর দলকে বজরা অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছে রঘুনাথ।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপ আর বিড়াই নদীর শান্ত স্রোতের জলো হাওয়ায় এক বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে রঘুনাথ। শরীরে জড়ানো চম্পাবরণ রেশমের উত্তরীয় বাতাসে উড়ে উড়ে নেচে বেড়ায়, বিস্তৃত কপালের ওপর উড়ে পড়ে কুঞ্চিত কেশ।

বিষ্ণুপুরের প্রতীক-আঁকা পালের গায়ে হাওয়া লাগে, দ্রুত বেগে যেন উড়ে চলে রঘুনাথের বজরা। আঠারো দাঁড়ের বজরা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলে অদ্ভুত এক জলতরঙ্গের ধ্বনি তুলে। মাঝির দল গান ধরে চাপা গলায়।

নদীর তীরের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে কৃষ্ণমোহন, হয়তো বা মাঝিদের ঐকতান সঙ্গীতের দিকে কান রেখে।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে চলে। বাঁশবন, আম কাঁঠালের বাগান, কোথাও বা পাষাণে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন ঘাট।

বাঁশী বাজাতে বাজাতে থমকে দাঁড়ায় কোনো রাখাল কিশোর। বিস্ময়ে অভিভূত হু'টি চোখ মেলে তাকায় রঘুনাথের বজরার দিকে।

ক্রমে ক্রমে অপরাহ্ণ ঘনিয়ে এলো। বিড়াই নদী থেকে কংসবতীর স্রোতে বাঁক নিলো বজরা।

দূর থেকে রঘুনাথ দেখলে এক দল গ্রাম্য মেয়ে কলসী কাঁখে এগিয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। গাছগাছালির মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তারা।

রঘুনাথের বজরা কাছে এসে পড়তেই থমকে দাঁড়ালো গ্রাম্য-বধূদের দল, পরমুহূর্তেই ভয়ে ছুটে পালালো তারা। কেউ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, কারও বা অঙ্গবাস আটকে গেলো কাঁটাঝোপের গায়ে। সশব্দে পড়ে গেলো মাটির কলসী। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।

সে-দৃশ্য দেখে সশব্দে হেসে উঠলো মাঝিমাল্লার দল।

রঘুনাথ কিন্তু সে-হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, দুঃখ হয় কৃষ্ণমোহন।

—দুঃখ?

রঘুনাথ ধীর স্বরে বললে, হ্যাঁ কৃষ্ণমোহন, মোগল আর পর্তুগীজের অত্যাচার বাংলাদেশের মনে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, ভাবলে দুঃখ হয়। বিদেশী দেখলেই তাই ভয়ে ছুটে পালায় তারা, অথচ···

অথচ এই দেশেরই তো একটি কিশোরী মেয়েকে একদিন তরবারি-হাতে রুখে দাঁড়াতে দেখেছিলো রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার চোখে দেখেছিলো বীরাঙ্গনার দুঃসাহস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তানপুরা তুলে নিলো রঘুনাথ। গান শুরু করলে ধীর স্বরে। হয়তো মনের উৎকণ্ঠা চাপা দেবার জন্যেই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আলো নিবে গেলো পশ্চিমের আকাশে। কংসবতীর তীরে নির্দিষ্ট ঘাটে এসে পৌঁছলো রঘুনাথের বজরা। কৃষ্ণমোহনকে অপেক্ষা করতে বলে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের সন্ধানে চললো রঘুনাথ।

যুবরাজ রঘুনাথ নয়, বেশবাস দেখে মনে হয় কোনো তীর্থান্বেষী পরিব্রাজক। সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে খড়্গেশ্বরীর মন্দিরের পথ খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকার গ্রাম্য সড়ক ধরে এগিয়ে চলে রঘুনাথ। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ উঁকি দেয় মনে, কটিবন্ধের গুপ্ত অস্ত্রে হাত রেখে সাহস আনে বুকে।

একদিকে কুমারী চন্দ্রপ্রভার উপরোধ, অন্যদিকে অজ্ঞাত আশঙ্কা। চন্দ্রপ্রভার চিঠির মধ্যে শোভা সিংহেরই কোনো কৌশল লুকিয়ে নেই তো? হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে যায় বিবিবাজার থেকে বিদায় নিয়ে বিষ্ণুপুর ফিরে আসার পথে রাজা কৃষ্ণরামের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনা। কে জানে, হয়তো সেদিন যে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলো

বর্ধমানরাজের কাছে, শোভা সিংহের কাছেও হয়তো সে-কথা পৌঁছে গেছে। এবং সেই জন্যেই হয়তো কৌশলে রঘুনাথকে বন্দী করতে চায় শোভা সিংহ।

কিন্তু শত বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চুপ থাকতে পারে না রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার প্রেমের আহ্বান হয়তো বা সত্য। হয়তো তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনে চলেছে একটি রূপময়ী কন্যা।

দয়িতা-হৃদয়ের আকর্ষণই নয়, আত্মসম্মানকে অকলঙ্কিত রাখার আগ্রহে ছুটে এসেছে রঘুনাথ। সত্য হোক মিথ্যা হোক, শত্রুতার আশঙ্কায় একটি অসহায়া নারীর আমন্ত্রণে সাড়া দিতে ভয় পেয়েছে রঘুনাথ, এমন কলঙ্ক যেন তার চরিত্রকে স্পর্শ করতে না পারে! তাই ছুটে এসেছে রঘুনাথ সুদূর মেদিনীপুরের চিতোয়া-বরদার অরণ্যে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর খড়্গেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশে পা বাড়ালো রঘুনাথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়লো এক সারি মশালের আলো, বাতাসে ভেসে এলো আরতির শঙ্খধ্বনি।

মশালের আলোকমালা লক্ষ্য করে ক্রমশ মন্দির-প্রাঙ্গণের কাছে এসে পৌঁছলো রঘুনাথ। গ্রামবাসীদের ভিড় ভেঙে পড়েছে তখন দেবালয়ের চতুর্দিকে।

সম্ভ্রান্ত কোনো বিদেশী তীর্থান্বেষী মনে করে রঘুনাথকে পথ করে দিলো জনতা। গর্ভগৃহের বেদীর কাছে এসে দাঁড়ালো সে। পরমুহূর্তেই কানে এলো পালকির ছন্দোময় ঘুঙুরের বোল!

ফিরে তাকালো রঘুনাথ।

দূর থেকে দেখলো, একটি মূল্যবান পালকি এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। পালকির গায়ে মিনার কারুকার্য চমক দিলো মশালের আলোয়। জাফরানী রঙের রেশমী পর্দা নড়ে উঠলো।

পালকি নামিয়ে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেলো বেহারার দল।

মশালচীরা সারি বেঁধে দাঁড়ালো মন্দির পর্যন্ত।

জাফরানী পর্দা নড়ে উঠলো, উঁকি দিলো হু'টি সুন্দর পা। আর সে-হু'টি পা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে গেলো।

রঘুনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে-দিকে। দূর থেকে লুকিয়ে দেখলো সে-রূপ।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার শরীরে এমন উচ্ছল যৌবন! সেই কিশোরী আজ যৌবনসম্ভারে যেন দেবীর মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে।

কুমারী চন্দ্রপ্রভা ধীরে ধীরে পালকি থেকে নামলো। তার পিছনে পিছনে হু'জন রসিকা সখী।

ক্রমে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো তিনজনই। আর রঘুনাথ পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী খড়্গেশ্বরীর বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

লক্ষ্য করে দেখলো, কুমারী চন্দ্রপ্রভা যেন লজ্জাতুর অপাঙ্গে তাকিয়ে জনতার মধ্যে বার বার কাকে খুঁজছে।

অদ্ভুত এক কৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রঘুনাথের মুখ।

পুরোহিতের হাত থেকে পূজার পুষ্প নিয়ে প্রণাম করলো চন্দ্রপ্রভা, তারপর একটি সোনার বিল্বপত্র রাখলো প্রণামীর থালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আরেকটি স্বর্ণপত্র পড়লো সশব্দে।

চমকে চোখ তুলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, চোখোচোখি হলো রঘুনাথের সঙ্গে। আর উভয়ের চোখে মৃদু হাসি খেলে গেলো। সে চোখ যেন পরস্পরকে বললো, চিনেছি। চিনেছি তোমাকে।

রঘুনাথ সরে এলো নির্জন অন্ধকারে। জনতার অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেন সন্দেহের কারণ খুঁজে না পায়।

চন্দ্রপ্রভাও পালকির ঘুঙুর বাজিয়ে চলে গেলো। যেমন এসেছিলো তেমনই।

রাত্রির অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিরুদ্দেশভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে কংসবতীর ঘাটে ফিরে এলো রঘুনাথ।

বজরায় ফিরে এসে অপেক্ষা করলো চন্দ্রপ্রভার জন্য। তারপর একসময় ক্লান্ত হাতে বীণা তুলতে গিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রঘুনাথ।

অন্ধকারে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটি নারীমূর্তি যেন দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

দেহরক্ষীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো।

প্রশ্ন বুঝতে পারলো রক্ষী। বললে, সংবাদ পেয়েছি যুবরাজ। শোভা সিংহ এখন উড়িষ্যায়। হেমন্ত সিংহও অনুপস্থিত।

নারীমূর্তি ততোক্ষণে কাছে এসে পৌঁছেছে।

মধুকণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেলো রঘুনাথ।—আমি বিষ্ণুপুর-যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে যুবরাজ নিজেই তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন, রসিকা।

নারীকণ্ঠেও হাসির সুর শোনা গেলো—কুমারী চন্দ্রপ্রভা আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন যুবরাজ।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, যুবরাজ নিজেও প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছেন সখি।

সখীকে অনুসরণ করে শোভা সিংহের প্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্দরমহলে এসে পৌঁছলো রঘুনাথ।

সখীর ইশারায় চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়ালো দ্বারপ্রান্তে। আর রঘুনাথ সেদিকে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ নয়নে। মুগ্ধ বিস্ময়ে।

চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভার। কথা খুঁজে পেলো না। অলজ্জ অভিসারিণীর আবেগময় লিপির দৌত্য যে-দয়িতকে কাছে ডেকে এনেছে, তার উপস্থিতিতে লজ্জায় কথা হারালো চন্দ্রপ্রভা!

অথচ এই মুহূর্তটির জন্যে কতো দীর্ঘ—দীর্ঘ দিন সে অপেক্ষা করেছে।

সখীর কাঁধে ভর দিয়ে লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রঘুনাথের কাছে এগিয়ে এলো সে।

তারপর শরমকাতর দু'টি চোখ তুলে তাকালো। দু'টি স্নিগ্ধ

চোখ যেন বললে, একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে-কথা কি ভুলে গেছেন ?

না, ভুলে যায়নি সে। কিন্তু অতীতের সেই দুর্ঘটনাকে রঘুনাথ এমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তার স্মৃতির পটে।

সখী সুরঞ্জাক্ষী খিলখিল করে হেসে উঠলো রঘুনাথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে। চন্দ্রপ্রভার লজ্জানম্র চোখেও কি যেন কৌতুক খেলে গেলো। চন্দ্রপ্রভার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বললে রসিকা সখী।

চন্দ্রপ্রভা অবনত লজ্জায় ঠোঁট টিপে হাসলো সে-কথা শুনে।

সখী কৌতুকের স্বরে বললে, যে-জীবন একদিন আপনি রক্ষা করেছিলেন যুবরাজ, সে-জীবন আপনার পায়েই সমর্পণ করতে চান রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রাজকুমারী ? বিস্মিত হলো রঘুনাথ। বর্ধমানপতি কৃষ্ণরামের সন্দেহ কি তা হলে সত্য ? শোভা সিংহ কি স্বাধীন রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে ?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলো রঘুনাথ। কে যেন এই পথেই এগিয়ে আসছে, পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রঘুনাথ।

চন্দ্রপ্রভাও বিচলিত বোধ করলো। প্রাসাদরক্ষীরা কি জানতে পেরেছে রঘুনাথের কথা ? ভীতত্রস্তভাবে সখীর মুখের দিকে তাকালো চন্দ্রপ্রভা।

সখী সুরঞ্জাক্ষী ইশারায় পাশের কক্ষে সরে যেতে বললো চন্দ্রপ্রভাকে।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করলো চন্দ্রপ্রভা। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। না, রক্ষীদের সন্দেহ উদ্রেকের কারণ ঘটেনি হয়তো।

চন্দ্রপ্রভা ফিরে এলো আবার, কপালে তার স্বেদবিন্দুর মালা ফুটে উঠেছে তখন। তার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি

খেলে গেলো রঘুনাথের মুখে। বললে, তোমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরেই এসেছি চন্দ্রপ্রভা। বলো, কি বলতে চাও তুমি।

চন্দ্রপ্রভার শরমাতুর হু'টি চোখ নিবদ্ধ হলো মাটিতে।—একদিন জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আজ সম্মান বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিন। লজ্জাকম্পিত স্বরে বললে চন্দ্রপ্রভা।

শুধু সখী সুরঞ্জাক্ষী বললে, প্রথম দর্শনেই সখী তার দেহমনপ্রাণ আপনার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন যুবরাজ। সেই কথাটুকু জানাবার জন্যেই আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন।

রঘুনাথ মৃদু হেসে বললে, প্রথম আলাপের দিনটি আমিও ভুলিনি চন্দ্রপ্রভা, ভুলতে পারিনি।

সুরঞ্জাক্ষী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, দৈবের নির্বন্ধে যখন চারিচক্ষুর মিলন হয়েছিলো একদিন, তখন সেই মিলনকে স্বীকার করে নিন যুবরাজ।

রঘুনাথ বললে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চন্দ্রপ্রভা, আর সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে যে মূল্যই দিতে হোক, আমি সম্মত থাকবো।

সুরঞ্জাক্ষী হেসে বললে, আরেকটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যুবরাজ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালো রঘুনাথ।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, সখীর এই রূপ এই যৌবন যেন শত পত্নীর ভিড়ে হারিয়ে না যায়। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে যেন পাটরানীর গৌরবে অধিষ্ঠিতা হতে পারেন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, সে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি আমি। কোনোদিন যদি অন্য নারীর অনুরক্ত হয়ে তোমার অসম্মান করি, তার আগে যেন তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয় চন্দ্রপ্রভা।

—ছি ছি, একি কথা বলছেন যুবরাজ! রঘুনাথের মুখে হাত চাপা দিলো চন্দ্রপ্রভা।

মৃদু হেসে চন্দ্রপ্রভার অনামিকায় বিষ্ণুপুর-যুবরাজের চিহ্ন আঁকা অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিলো রঘুনাথ।

আনন্দে উৎফুল্ল দু'টি চোখ তুলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, তারপর রঘুনাথকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, চলুন যুবরাজ, ভোর হওয়ার আগেই বিষ্ণুপুরে ফিরে যেতে হবে আপনাকে।

সুড়ঙ্গের পথ দেখিয়ে বজরায় পৌঁছে দিলো সে রঘুনাথকে। বজরা ছেড়ে দিলো। আর রঘুনাথের মনে পড়লো শৈশবের সেই দৃশ্য।

রাত্রির অন্ধকারে শোভা সিংহের গুপ্তচরের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেসে চললো রঘুনাথের বজরা। কংসবতীর স্রোত বেয়ে বিষ্ণুপুরের পথে ফিরে যেতে যেতে রঘুনাথের মনে পড়লো প্রায়-বিস্মৃত শৈশবের সেই ঘটনা।

আশ্চর্য। যে-ঘটনা রঘুনাথের মন থেকে মুছে গিয়েছিলো, যে কন্যকার মুখ তলিয়ে গিয়েছিলো বিস্মৃতির অতলে, আজ নতুন করে রঘুনাথের মনে যৌবনের জোয়ার আনলো সেই ছবি।

নারীর হৃদয় বুঝি ভিজে মাটির পথ। একবার যার পায়ের ছাপ আঁকা হয়, কল্পনার রৌদ্র আর সময়ের বাতাসে শুকিয়ে সে-ছাপ চিরজীবী হয়ে থাকে। আর পুরুষের মন বুঝি বা আয়নার মতো, ক্ষণে ক্ষণে নতুন ছায়া পড়ে।

কিন্তু এমনভাবে কোনো রূপসী নারী তার দেহমন উৎসর্গ করবার জন্যে উপযাচিকা হয়ে এগিয়ে আসতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি রঘুনাথ।

এমনি দুঃসাহস আরো একদিন দেখেছিলো রঘুনাথ। কিন্তু সেদিন চন্দ্রপ্রভার দৃষ্টিতে ছিলো তীব্রতা, ছিলো রণোন্মাদিনীর তেজোদ্দীপ্তি।

যে-জীবন একদিন রঘুনাথই বাঁচিয়েছিলো, সে-জীবন যে এমন

ভাবে জড়িয়ে যাবে তার চলার পথের সঙ্গে, কোনোদিন কল্পনাও করেনি সে।

কিশোরী চন্দ্রপ্রভার চোখে যে রোমাঞ্চের কাজল পরিয়েছিলো সে, আজ চন্দ্রপ্রভার যৌবনরূপ সেই মোহাঞ্জনই এঁকে দিলো রঘুনাথের চোখে।

মনে মনে রঘুনাথ বললে, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করবো আজীবন।

সমগ্র বিষ্ণুপুরে তখন দুঃখের ছায়া নেমেছে। দীর্ঘকাল ধরে রোগশয্যায় পড়েছিলেন দুর্জন সিংহ। কিন্তু রাজবৈদ্যের ওপর আস্থা ছিলো সকলের। রঘুনাথ ফিরে এসে শুনলো রাজবৈদ্য প্রকাশ্যে হতাশা জানিয়েছেন।

বিষণ্ণ মুখে পিতার শয্যাকক্ষে গিয়ে হাজির হলো রঘুনাথ। দেখলে, পরিবারের সকলে দাঁড়িয়ে আছে হতাশার চোখ মেলে।

শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রঘুনাথ। দুর্জন সিংহের তন্দ্রার ঘোর কাটলো। অস্ফুটে ডাকলেন, রঘুনাথ!

জ্যোতিষাচার্য সামনেই বসেছিলেন। বললেন, রঘুনাথ এসেছে মহারাজ।

—এসেছে? স্পর্শ পাবার আশায় হাত বাড়ালেন দুর্জন সিংহ।

রঘুনাথ ধীরে ধীরে শিয়রের কাছে গিয়ে বসলো।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো অস্ফুটে দুর্জন সিংহ বললেন, অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে রঘুনাথ। তাই মৃত্যুর আগে কয়েকটা কথা তোমাকে বলে যেতে চাই।

চোখের অশ্রু মুছলেন রাজপত্নী।

রঘুনাথের চোখেও জল এলো। বললে, আপনার আদেশ আমি চিরকাল পালন করবো।

মৃদু হাসি দেখা দিলো দুর্জন সিংহের ঠোঁটে। বললেন, জানি।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, রঘুনাথ, সারা বাংলা দেশ অশান্তিতে ডুবে আছে। একদিকে মগ আর পর্তুগীজ, আর অন্যদিকে বর্গী আর পাঠান।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, মোগলও তো অত্যাচারী মহারাজ, বিধর্মী মোগলও বাংলার শত্রু।

দুর্জন সিংহ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, মোগলও অত্যাচারী! মোগলও শত্রু। কিন্তু রঘুনাথ, স্থায়ী শত্রুকে সহ্য করা যায়, প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তা ছাড়া, মোগলের অত্যাচার হয়তো একদিন লুপ্ত হবে, কারণ মোগল রাজ্যশাসন করে। মগ আর বর্গ দস্যুর নির্যাতন আর লুণ্ঠন প্রতিরোধ করতে হলে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে রঘুনাথ, বিদ্রোহ করে বাংলাকে মোগলের হাত থেকে স্বাধীন করার সময় এখনো আসেনি।

—আপনার আদেশ বুঝতে পারছি না মহারাজ! জ্যোতিষাচার্য বললেন।

রঘুনাথও উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালো পিতার রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে।

দুর্জন সিংহ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নির্জীব পড়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, রঘুনাথ, মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবে এই আমার ইচ্ছা। আর···

—আর?

—মুসলমানকে ঘৃণা কোরো না রঘুনাথ। ধর্মের বিদ্বেষ যেন বিষ্ণুপুরকে কোনোদিন কলঙ্কিত না করে। ধর্মের হানাহানি সব মুছে যাবে রঘুনাথ, সব মুছে যাবে।

বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের কাছে এ-কথা নতুন নয়। ধর্মের হানাহানি সব মুছে যাবে, সব মুছে যাবে। এ-কথা বহুবার শুনেছে রঘুনাথ। সবার উপরে মানুষ সত্য। সবার উপরে প্রেম।

যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ মনে পড়লো রঘুনাথের। জগন্নাথধামে হরিদাস মৃত্যুশয্যায়, তখন চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদের হরিদাসের পাদোদক সেবন করিয়েছিলেন। আর উৎসবে শ্রাদ্ধে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে তাঁরা আহার করতেন যবন হরিদাসের সঙ্গে।

তবে? তবে কেন বিবিবাজারের কালো বোরখায় শরীর-লুকানো সেই পরমাসুন্দরী বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্যায়বোধ জেগেছিলো?

'মুসলমানকে ঘৃণা কোরো না রঘুনাথ!'

দুর্জন সিংহের কথা বার বার মনের মধ্যে অনুরণন তুলে যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমানীকেই মনে পড়িয়ে দিতে চায়।

না, শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার কাছে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে-প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে তাকে।

কিন্তু বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছেও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ সে, হয়তো শোভা সিংহের বিরুদ্ধে, চন্দ্রপ্রভার পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে হবে তাকে।

আট

লালী নয়। লালবাঈ। বিবিবাজারের দস্যুলুণ্ঠিত বাঁদী নয়। ধনী সওদাগর আর নবাবজাদারা যার পায়ে সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে চায়, এমন এক রূপসী কলাবিদ।

হীরাবাঈ যেন তার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। প্রতিশোধ নেবার অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে এতোদিনে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে, নৃত্যগীতের সব জ্ঞান ঢেলে দিয়ে যেন লালীকে নতুন করে গড়তে চায় হীরাবাঈ।

বুড়ো সৌকত খাঁ লালীকে গান শেখাতে শেখাতে থেমে পড়ে। মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু মৃদু হাসে হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু হীরাবাঈয়ের যেন ক্লান্তি নেই, সাধনালব্ধ সব জ্ঞান যেন কয়েকটি বছরের মধ্যে লালীর হৃদয়ে ঢেলে দিতে চায়।

তাই বুড়ো ওস্তাদ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হীরাবাঈ তখন নাচ শেখাতে শুরু করে। সম্ভ্রান্ত তওয়ায়েফার আদবকায়দা, জলসায় দাঁড়িয়ে পোশাক বদলের কানুন দেখিয়ে দেয়।

লালীর রক্তেও যেন নেশা ধরে যায়।

হীরাবাঈয়ের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, ভোগবিলাস লালীর মনেও স্বপ্ন জাগায়।

অথচ ওস্তাদ সৌকত খাঁ বুঝতে পারে না, কেন এই দুর্জয় সাধনা হীরাবাঈয়ের। শুধু অযোধ্যাপ্রসাদ লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

হীরাবাঈ নির্জনে লালীকে বলে, গালে ফাগ নয়, আগ লাগাও তোমার চোখে। যেন পুরুষের কলিজা পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে-আগুনে।

লালী হেসে বলে, যাকে মোহব্বতের চোখে দেখবো সেই মাশুককেও পুড়িয়ে ফেলবো যে তা হলে।

—মোহব্বত? ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় হীরাবাঈ।

বলে, ওসব মিথ্যে লালী, সব মিথ্যে। পুরুষকে কোনোদিন বিশ্বাস কোরো না, কোনোদিন তার মোহব্বতকে বিশ্বাস করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না। আর ভুলে যেও না—হিন্দু কাফের, হিন্দু কখনও ভালবাসতে পারে না।

শেষের কথাটা যেন অযোধ্যাপ্রসাদকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে হীরাবাঈ।

কৌতুকের স্বরে লালী বলে, তুমিও হিন্দু ছিলে। হিন্দু কাফেরের ঘরেই তো জন্ম তোমার।

হীরাবাঈ গম্ভীর স্বরে বলে, হ্যাঁ লালী। হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই তাকে আরও ভালো করে চিনেছি।

চোখ দু'টো যেন জ্বলে ওঠে হীরাবাঈয়ের। সে-চোখ দেখে ভয় পায় লালী। সুর্মাটানা দু'টি অপরূপ চোখ, যে-চোখের দৃষ্টির কাছে সিংহ বশ মানে, যে-চোখের চটুল চাহনির মোহে কতো রাজকোষ নিঃস্ব হতে দেখেছে সে, সেই চোখের পিছনে এতো জ্বালা দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে লালী।

সৌকত খাঁ দাড়িতে হাত বোলায় আর হাসে।

বলে, প্রেম কি জিনিস যেদিন বুঝবি বেটি, সেদিন জানতে পারবি হীরার মনে কেন এই জ্বালা।

সে-কথা জানে লালী। জানে হিন্দু ধর্ম শুধু প্রেমের গান গায়, কিন্তু প্রেমের দাম দিতে নারাজ। হীরাবাঈয়ের কাছেও শুনেছে সে, শুনেছে হিন্দু রাজা আর ভুঁইয়াদের কথা। মুসলমানী বাঈজীর লালসায় আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাতে বসে তারা, তবু তাকে পত্নীর মর্যাদা দিতে রাজী নয়। প্রেমের চেয়ে ধর্ম বড়ো তাদের কাছে।

কানে কানে সে-মন্ত্র বহুবার শুনিয়েছে হীরাবাঈ, বলেছে, পুরুষকে

নিঃস্ব করাই তোমার ব্রত হবে লালী। তবু মনে মনে কতো স্বপ্নই না দেখে সে।

হঠাৎ কোনোদিন হয়তো মনে পড়ে যায়, বিবিবাজারের সেই সুপুরুষ চেহারার সাদা-ঘোড়ার সওয়ারকে। সারা রাত ঘুম নামে না তার চোখে।

রঘুনাথ। এক টুকরো বিধর্মী নাম, মনের হাতে বার বার নাড়া-চাড়া করে লালী। স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন বোনে।

সেদিনও এমন কি এক স্বপ্ন দেখছিলো লালী, বিলাসের শয্যায় শরীর এলিয়ে, চোখ বুজে।

নরম গালিচার ওপর পা টিপে টিপে কখন হীরাবাঈ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি।

—লালী!

ডাক শুনে চমকে চোখ ফেরালো লালী। উঠে বসলো হীরাবাঈকে দেখতে পেয়ে।

হীরাবাঈ মৃদু হেসে বললে, খবর আছে লালী, খুশীর খবর।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো ও।

হীরাবাঈ হাসলো আবার ঠোঁট টিপে টিপে। বললে, এবার ওড়না তোলবার দিন এসেছে তোমার। লালী নয়, এবার থেকে তোমার নাম হবে লালবাঈ। আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।

ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো লালী। বললে, আমি? আমি যাবো মাইফেলে?

—কেন যাবে না বহিন? মৃদু হাসলে হীরাবাঈ। বললে, সব তাল তো ওস্তাদজীর কাছে শিখে নিয়েছো, মজলিসী আদব তো শিখিয়েছি সবই। এখন থেকে মুজরায় না গেলে বাঈজীর কলিজা বানাবে কি করে লালী!

লালীর চোখেমুখে ফুটল আশঙ্কার ছাপ।

বললে,:কিন্তু আমি যে কিছুই শিখিনি, কিছুই জানি না আমি! না, না, যাবো না আমি, যাবো না—

লালীর পাশে এসে বসলো হীরাবাঈ। কৌতুকের হাসি হেসে তার পিঠে একটা হাত রেখে বললে, সব শিখেছো তুমি, সব, সব। তোমার এই রূপ-যৌবন দেখেই রহিম খাঁ মুগ্ধ হবে লালী, তোমার গানের রোশনী তাকে মুগ্ধ করবে।

—রহিম খাঁ? বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো লালী।

—হ্যাঁ। পাঠান রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে আমাদের।

লালী ফিসফিস করে বললে, বেশ, যাবো আমি, যাবো।

আর সে-কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো হীরাবাঈ। স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লালীর চোখের তারায় চোখ রেখে! কি যেন খুঁজলে লালীর এই আকস্মিক সম্মতিতে।

হীরাবাঈয়ের মনে বুঝি সন্দেহ উঁকি দিলো। নরম-দিল মেয়েটার চোখে কিসের ছায়া? কোন দুর্জয় বাসনা!

—ওস্তাদজী যাবেন আমাদের সঙ্গে? প্রশ্ন করলে লালী।

হীরাবাঈ হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ওস্তাদজীও যাবেন।

—আর গঙ্গাতিলক? কৌতুকের হাসি হেসে পুনরায় প্রশ্ন করলে লালী।

হঠাৎ যেন উষ্মার ছায়া দেখা দিলো হীরাবাঈয়ের চোখে, পরক্ষণেই ক্রোধ চাপা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, তবল্‌চীও যাবে।

আশ্চর্য! ঠাট্টা বিদ্রূপে অযোধ্যাপ্রসাদকে আঘাতের পর আঘাত হানে হীরাবাঈ, কিন্তু লালী তাকে গঙ্গাতিলক বলে বিদ্রূপ করলেই লালীর বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে ওঠে তার। অথচ অযোধ্যাপ্রসাদের মনে যেন রাগ নেই।

অদ্ভুত মানুষ এই অযোধ্যাপ্রসাদ। শুধুই যেন রহস্যে ঘেরা। ওস্তাদ সৌকত খাঁকে যতোই দেখছে ততোই যেন ভালবেসে ফেলছে

লালী। মেহেদি-রাঙানো আবক্ষ দাড়ি, রক্তিম তমাশবিন্ চেহারা, আর সুর্মাটানা হু'টি বড়ো বড়ো শান্ত চোখ।

সারা জীবন ধরে মানুষটা যেন শুধু গানকেই ভালবেসেছে। নারীর প্রেম যেন তাকে স্পর্শও করেনি।

আর অযোধ্যাপ্রসাদ? আশ্চর্য, বাঈজীর তবল্চী হয়েও লোকটার হিন্দুয়ানীর অহংকার যায়নি। কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, গলায় তুলসীর মালা, পরনে গরদের ধুতি আর চাদর।

তাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে হীরাবাঈ, অযোধ্যাপ্রসাদকে ডাকে গঙ্গাতিলক বলে। কিন্তু লালীর মুখে এ বিদ্রূপ শুনে মনের গোপনে জ্বলে ওঠে হীরাবাঈ।

সত্যি, মানুষটাকে কেমন যেন বেমানান লাগে এই আবহাওয়ায়। তবু কেন যেন অযোধ্যাপ্রসাদকে সহ্য করে হীরাবাঈ, লালী বুঝতে পারে না।

কেমন যেন সন্দেহ হয় ওর। বহুবার দেখেছে, হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে হঠাৎ এক এক সময় বড়ো তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে অযোধ্যাপ্রসাদ। তবলার তাল কেটে যায়। ধমক দিয়ে ওঠে ওস্তাদ সৌকত খাঁ।

লজ্জায় সারা মুখ কালো হয়ে যায় তখন, বড়ো বিষণ্ণ দেখায় অযোধ্যাপ্রসাদকে, চোখ হু'টো হয়ে ওঠে করুণ।

এই অযোধ্যাপ্রসাদের কাছেই শুনেছে লালী, শুনেছে হীরাবাঈয়ের জীবনের ইতিহাস।

রূপে গুণে অদ্বিতীয়া এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হয়েছিলো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তারপর কয়েকটি বছর কেটেছিলো তাদের সুখে শান্তিতে।

কিন্তু যার রূপ-যৌবনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, সে কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারে? সুবাদারের লালসার ইন্ধন যোগাবার জন্যে

গ্রামে গ্রামে ভৈরবীর বেশে ঘুরে বেড়াতো ঘটকী চর, তাদেরই দৃষ্টিতে পড়লো সেই গৃহবধূ।

একদিন যথারীতি কলসী কাঁখে নিয়ে গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না সে।

—ফিরে এলো না? বিস্মিত স্বর ফুটেছিলো লালীর গলায়।

—না। বিষণ্ণ হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলো অযোধ্যাপ্রসাদ।

বলেছিলো, না, ফিরে এলো না। শুধু সঙ্গীরা ভয়ে আতঙ্কে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো। সুবাদারী ফৌজ-বোঝাই দু'খানা বজরা নাকি লুকিয়ে ছিলো আড়ালে। হঠাৎ গ্রাম্যবধূদের ওপর লাফিয়ে পড়ে হীরাকে জোর করে বজরায় তুলে নিয়ে গেছে তারা।

—তারপর?

অযোধ্যাপ্রসাদের চোখ ছলছল করে উঠেছিলো। বলেছিলো, তারপর ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে এলো মেয়েটির স্বামী। দেখলো, শুধু কলসীটা পড়ে আছে, আর তার পাশে কয়েক টুকরো ভাঙা শাঁখা। সেগুলো বুকে আঁকড়ে ফিরে গেলো সে। ভাবলে, আর বুঝি কোনোদিন ফিরে পাবে না তাকে।

শুনতে শুনতে লালীর চোখেও জল এসেছিলো। কান্নার স্বরে বলেছিলো, পায়নি ফিরে?

—পেয়েছিলো। কিন্তু, কিন্তু ফিরে নিতে পারেনি সে। এক বছর বাদেই সুবাদারের লোক সেই ঘাটেই নামিয়ে দিয়ে গেলো তাকে। কিন্তু নবাবের উচ্ছিষ্ট হয়ে ফিরে এসেছে যে-মেয়ে তাকে সমাজ ফিরে নিতে চাইলো না। সপরিবারে সকলকে পতিত হতে হবে, ভয় দেখালো সমাজপতির দল।

শুনে বিস্মিত না হয়ে পারেনি লালী।

মনে পড়েছিলো শুধু হীরাবাঈয়ের কথাটা।—হিন্দুর ধর্ম শুধু প্রেমের গান গায় লালী, প্রেমের দাম দিতে নারাজ।

সত্যিই হয়তো তাই। অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে হীরাবাঈয়ের জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে লালীর। মনে হয়েছে, কখনও যদি সুযোগ পায় ও, তা হলে মুসলমানের প্রতি হিন্দু কাফেরের এই ঘৃণার প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ নেবে নারীর ওপর পুরুষের এই হৃদয়হীন নির্যাতনের।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের অত্যাচার এদিকে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নৃত্য-গীতকে রাজ্য থেকে বিদায় দিতে চান আলমগীর। এদিকে আগ্রা থেকে অসুখের ভান করে লুকিয়ে পালিয়েছেন মারাঠা-সূর্য শিবাজী। তাই আক্রোশে ফেটে পড়েছেন শাহ আলম—দুনিয়ার বাদশাহ্।

নিজের কীর্তির গ্লানি মনের আয়নায় হয়তো দেখতে পেতেন শাহ আলম। তাই ফরমান জারি করলেন, কেউ ইতিহাস লিখতে পাবে না তাঁর রাজত্বকালের। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই লিপিবদ্ধ করতে পাবে না কোনো হিন্দু বা মুসলমান।

আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় সাজাহানের দিন কাটছে। পার্বত্য-মূষিক বলে যাকে বিদ্রূপ করেছিলেন, বারংবার তার কৌশলের কাছে পরাভূত হয়েছেন মোগল সম্রাট। আর শাহ সুজা! এক অবোধ্য দুঃস্বপ্নের মতো তখনও শাহান্ শাহ্‌র মনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাহ সুজার বিভীষিকা। সুজার মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না আওরঙ্গজেব, বিশ্বাস করতে পারেন না কোনো মানুষকে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর, আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠেন। মনে হয়, যেন পারস্যের মিত্রসৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে সুজা। কখনও দেহরক্ষীর চোখে অবিশ্বস্ততার কুটিল হাসি খুঁজে পান।

জীবনের সব আনন্দ যেন ঘুচে গেছে তাঁর। সমস্ত মন শুধু বিপদের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন। তাই অন্যের আনন্দও সহ্য করতে পারেন না।

নৃত্যগীতে এতোদিন তাঁর নিজেরই বিতৃষ্ণা ছিলো। এবার অন্যের তৃষ্ণাকেও অতৃপ্ত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন বাদশাহ্

হিন্দুর যাত্রাগান আর মেলা নিষিদ্ধ করে দিলেন, নিষিদ্ধ হলো নৃত্যগীতের চর্চা।

ওস্তাদ সৌকত খাঁ দুঃখের হাসি হেসে বললে, সঙ্গীত ছিলো আমার একমাত্র বেগম, তাকেও তালাক দিতে হবে বেটি!

হীরাবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—সত্যি ওস্তাদজী। গান আর নাচকে কবর দিতে চায় শাহ আলম, এ যে কল্পনাও করা যায় না।

আর লালী বললে, তার চেয়ে চলো পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বেই চলে যাই আমরা।

বুড়ো সৌকত খাঁর চোখে জল টলমল করলো।

বললে, বেটি, নিজের কথা ভাবছি না, হাজার হাজার গুণী খেতে না পেয়ে মারা যাবে হিন্দুস্থানে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, ভবিষ্যতের মানুষের কাছে হারিয়ে যাবে আমাদের গান, হাজার বছরের সাধনা?

—হ্যাঁ অযোধ্যাপ্রসাদ! গলায় কালো সুতলিতে বাঁধা রুপোর চৌকো তাবিজটা নাড়াচাড়া করতে করতে সৌকত খাঁ বললে, সব হারিয়ে যাবে, বেবাক হারিয়ে যাবে।

হীরাবাঈ শুধু বললে, না ওস্তাদজী, সারা আগ্রা আর দিল্লীর ওস্তাদ আর বাঈদের দল নিয়ে যাবো আমরা শাহ আলমের কাছে আরজি করতে। এ ফরমান বদল করতে হবে।

আওরঙ্গজেবের আদেশ বদল করতে চায় হীরাবাঈ! সৌকত খাঁ হাসলো মনে মনে। তবু আপত্তি করলো না।

তারপর দল বেঁধে একদিন আরজি পেশ করতে গেলো ওরা! আলমগীরের 'ঝরোকা-দর্শনের' সামনে।

আওরঙ্গজেব সেদিনও এসে দাঁড়ালেন ঝরোকার সামনে। সব গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য প্রতিদিন যেমন দর্শন দিয়ে জানাতেন, আমি বেঁচে আছি, সেদিনও তেমনি ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেলো তাঁর সামনের পথে।

কাফনে-ঢাকা কয়েকটি মৃতদেহ নিয়ে চলেছে একদল লোক, আর পিছনে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে নারী পুরুষের মিছিল।

আওরঙ্গজেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কার মৃতদেহ চলেছে পথ দিয়ে ?

উত্তর শুনে হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

সঙ্গীতের ?

বললেন, কবরটা খুব ভালো করে খুঁড়তে বলো। যেন কোনোদিন আর মাথা তুলে না উঠতে পারে।

এ নৃশংস রসিকতা শুনে বুক কেঁপে উঠলো সকলের। বুঝলো, শাহ আলমের মত বদলানো যায় না। বুঝলো শুধু সঙ্গীতেরই নয়, সঙ্গীতজ্ঞেরও মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ নেই এ মোগল-রাজত্বে।

শুধু হীরাবাঈ বললে, দু'টি জায়গা আছে ওস্তাদজী। সেখানেই যেতে হবে আমাদের।

—কোথায় বেটি ? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলে সৌকত খাঁ। বললে, শাহ আলমের রাজত্বের বাইরে কোথায় যাবি ?

হীরাবাঈ হেসে বললে, পাঠান রহিম খাঁর রাজত্বে। রহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছিলো ওস্তাদজী।

সৌকত খাঁ সম্মতি জানালো।—হ্যাঁ, সেখানেই যেতে হবে।

হীরাবাঈ বললে, রহিম খাঁ যদি ইজ্জত না দেয়, বিষ্ণুপুর যাবো ওস্তাদজী। শাহ আলমের গোলাম নয় বিষ্ণুপুর। আর, আর বিষ্ণুপুরের কুমার রঘুনাথ সঙ্গীতরসিক···

কিন্তু সেখানেও কি আশ্রয় পাবে হীরাবাঈ ? শাহ সুজাকে যে-ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আওরঙ্গজেব, তেমনি করেই সঙ্গীতের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবে দিনের পর দিন।

শাহ সুজা! সত্যিই কি বেঁচে আছেন তিনি ? কে জানে, হয়তো আওরঙ্গজেবের সন্দেহই ঠিক। শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যেই হয়তো মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিয়েছেন সুজা।

হীরাবাঈ। নূপুরের ছন্দে হঠাৎ যেন তাল কেটে গেলো। রহিম খাঁর পাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে গোপন পরামর্শে রত শোভা সিংহের চোখে চোখ পড়লো। বিবিবাজারের সেই ঘটনার ছবি ভেসে উঠলো হীরাবাঈয়ের মনে।

বাঈজীর সম্মান রাখেনি আহাম্মক। তার সব ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো সারেঙ্গীদের সামনে।

কিন্তু মেদিনীপুরের ভূস্বামী উড়িষ্যায় এসেছে কোন উদ্দেশ্যে? কেন এই গোপন পরামর্শ? এ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলো সে বর্ধমানরাজের কাছে। বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে, এখনও কি শোভা সিংহের মনে টিকে আছে সেই সুপ্ত আক্রোশ?

রহিম খাঁকে তস্‌লিম করে দাঁড়ালো হীরাবাঈ। ভেড়ুয়ার পিঠে পা তুলে দিয়ে। তার সুন্দর পা দু'টি থেকে জরি আর পান্না বসানো নাগরা খুলে নিলো আরেকজন ভেড়ুয়া।

রহিম খাঁ দিল্ ছুঁড়ে দেওয়ার ইশারা করে নাচের অনুমতি দিলো। বললে, খুশী মনে নাচো হীরাবাঈ।

শোভা সিংহ হেসে সায় জানালো।—হ্যাঁ, দিল্ জখম করে দাও তোমার গানে।

হীরাবাঈ রহিম খাঁর সামনে গিয়ে কুর্নিশ করলে।—বাদশাহ্!

শোভা সিংহের কাছে গিয়ে বললে, রাজাবাহাদুর!

দু'জনেই কৌতুকের হাসি হেসে পরস্পরের দিকে তাকালো।

হীরাবাঈ বললে, এ পূর্ণিমার চাঁদ আর কতো নাচ দেখাবে বাদশা! তার চেয়ে গান শুনুন লালবাঈয়ের। দ্বিতীয়ার চাঁদ সে, তিল তিল করে বাড়ছে তার রূপযৌবন।

লালবাঈ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রহিম খাঁ।

—হ্যাঁ হুজুর! বলেই ইশারা করলে হীরাবাঈ।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে নাচের তালে তালে রহিম খাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো লালী।

রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তাকিয়ে রইলো লালবাঈয়ের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার দিকে!

লাল রেশমের ঘাগরা, রেশমী জমিতে জরি আর পোখরাজের রোশনাই। লাল মখমলের কাঁচুলিতে যৌবনের বহ্নি। সাদা মসলিনের ওড়না লালবাঈয়ের মুখের স্বচ্ছ আবরণ।

মোহগ্রস্তের মতো সেদিকে তাকিয়ে রইলো রহিম খাঁ। এ-রূপ যেন কখনো দেখেনি সে, এ-সৌন্দর্য বুঝি বা বেহেস্তের হুরীর শরীরেই সম্ভব।

হীরাবাঈ ফিসফিস করে বললে, ওড়না তুলে দিন বাদশাহ, পহেলি মাইফেল হোক আজ আপনার রঙমহলে।

—পহেলি মাইফেল?

লালসালুব্ধ চোখে লালবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নেশার পায়ে টলতে টলতে এসে ওড়না তুলে দিলো রহিম খাঁ।

জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে ওড়না তুললো লালবাঈ। রহিম খাঁ দিলো পহেলি মাইফেলের আদেশ। এ রীতির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তাকে আজীবন! স্বেচ্ছায় মুক্তি না চাইলে বাঈজীর সম্মান আর আশ্রয় দিতে হবে রহিম খাঁকে, যতোদিন না লালবাঈ নিজে মুক্তি চায়।

কিন্তু হীরাবাঈ! হঠাৎ বড়ো বিষণ্ণবোধ করলো হীরাবাঈ। লালীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলো সে, কিন্তু সেই সার্থক মুহূর্তে কেন এই বেদনাবোধ? নিজেকে এত অসহায় বুঝি কখনো মনে হয়নি তার।

নৃত্যরতা লালবাঈয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রহিম খাঁ ইশারায় ডাকলে হীরাবাঈকে। তাকিয়া হেলান দিয়ে কাছে বসতে বললো তাকে। তারপর একসময় সুরার নেশায় ডুবে গেলো রহিম খাঁ, ডুবে গেলো শোভা সিংহ।

লালবাঈয়ের নাচের ঘূর্ণিতে তখন ঝড়তুফান। উড়ছে ওড়না, ঘুরছে ঘাগরার জরিদার সল্‌মাচমক কিনার। লাল মখমলের কাঁচুলি ত্বলছে, কাঁপছে। জ্বলন্ত যৌবনের শিখা যেন। তালে তালে বেজে চলেছে ঘুঙুরের ঝমক। নাচ নয়, যেন তুফান।

হীরাবাঈয়ের আঙুলের মিনে করা সোনার মিজরাব গুনগুন সুর তোলে সেতারের বুকে। ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দ হলো জলসা, সেতারের সুর মিলিয়ে গেলো, কালো মেঘের পর্দায় ঢাকা পড়লো যেন আসমানের চাঁদ। মেঘ সরে গেলো, আবার ফুটে উঠলো আলো, ককিয়ে কেঁদে উঠলো তানপুরার তার। মৃত্থ কণ্ঠে গান শুরু করলো হীরাবাঈ, মনের নিঃস্বতা চাপা দেবার জন্মেই।

ধীরে ধীরে সুর ফুটলো হীরাবাঈয়ের কণ্ঠে। জমে উঠলো জলসার মসরুর।

গানের ভাঁজে ভাঁজে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলো হীরাবাঈ রহিম খাঁর চোখে, তারপর মৃত্থ হেসে শুরু করলে দরবারীর তেরানা। সপাট দূনী আর ছুটতানের ফুলঝুরি উঠলো।

তেজ, তাবিশ আর মিঠাসের জলুসে জলসা মেতে উঠেছে তখন। নাচের ঘুঙুর বেজে চলেছে লালবাঈয়ের পায়ে।

এমন সময় আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো লালবাঈ। ঘুঙুরের আওয়াজ থমকে থেমে গেলো।

বিস্ময়ে সবাই ফিরে তাকালো লালীর দিকে। তার চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো, দরজার পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে আছে এক মসিকৃষ্ণ দৈত্যরূপী হাবশী।

লালীর আতঙ্কের চিৎকার শুনে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো হাবশীটা, তারপর আবার কুর্নিশ করলো রহিম খাঁকে।

চিনতে পারলো লালী।

চিনতে পেরেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলো সে।

মনে পড়লো বিবিবাজারের সেই দৃশ্য। ফকির সাহেবের চবুতরা থেকে বাঁদীপট্টির তাঁবুতে ফিরে আসার ঘটনাটুকু মনে পড়লো।

সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিলো হাবশীটার পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিলো তার ঘনকৃষ্ণ পিঠের ওপর। বাঁধন খুলে দেওয়ার পর তর্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিলো হাবশীটা।

সে-দৃশ্য মনে পড়তেই ভয়ে ভয়ে হীরাবাঈয়ের পাশে এসে বসলো লালী, মুখ তুলে হাবশীটার দিকে তাকাতেও সাহস হলো না।

দশ

প্রতিদিনের মতোই সেদিনও মুজরা মিইয়ে গেলো। চিতোয়া-বরদার চিঠি পেয়েই গোপন পরামর্শের জন্যে উঠে গেলো শোভা সিংহ আর রহিম খাঁ। একে একে নিবে গেলো জলসামহলের প্রতিটি আলো। সুর থেমে গেলো সারেঙ্গীর।

বালাখানায় ফিরে এলো হীরাবাঈয়ের দল।

রাতের আকাশে তখন তারার ঝিকিমিকি। অট্টালিকা-সংলগ্ন সায়রের জলে ভাঙা-চাঁদের জ্যোৎস্না। শান্ত শীতল বাতাসের কোমল স্পর্শে লালবাঈয়ের শরীরে এক অনাস্বাদিত পুলক জেগে উঠলো।

কাঞ্চনীর বেশ ত্যাগ করে সহজ পোশাকে শরীর জড়িয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালো লালী।

ক্রমশই যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে সে। অস্বস্তি বোধ করে। তার এই উদ্দেশ্যহীন জীবন-যৌবনকে কতদূরে টেনে নিয়ে যাবে সে? কোথায় গিয়ে মিলবে চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম? তার যৌবনহৃদয় প্রেমের জন্যে কাঙাল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

রহিম খাঁর সাবাস, হাবশী চরের লালসালুব্ধ দৃষ্টি, হীরাবাঈয়ের স্নেহসিঞ্চন—সব কিছুর মধ্যেও হাঁপিয়ে ওঠে লালী। নিজেকে তার অভিশপ্ত মনে হয়। 'আজীবন তোমাকে অনূঢ়া থাকতে হবে কন্যা।' ফকির সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নয়, যেন এক সুতীব্র অভিশাপ।

বাঁদীবাজারের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে সেদিন যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিলো সে মনে মনে, কে জানতো তা এমন কুহেলিকায় আচ্ছন্ন! কে জানতো ঐশ্বর্য আর আনন্দের জলুস শুধুই বাইরের আবরণ, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে পারে না বিলাসব্যসনের উদগ্র নেশা।

হাবশী স্থলেমানকে দেখে ভয় পায় লালী। কিন্তু রহিম খাঁ? না, রহিম খাঁর আসরফির মূল্যে আত্মবিক্রয় করেছে সে, ভালোবাসতে পারেনি। ঘৃণা? হ্যাঁ, রহিম খাঁকে হয়তো বা মনের গোপনে ঘৃণা করে লালী। তার বীরত্ব, অহংকার, উদ্দামতার নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে লালী, কিন্তু ভালোবাসতে পারে না।

শুধু শান্তি পায় একজনের সান্নিধ্যে।

অযোধ্যাপ্রসাদ!

কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, বেশ-বাসে হিন্দুয়ানী। তবু অযোধ্যাপ্রসাদের প্রতি কী এক অবোধ্য আকর্ষণ বোধ করে লালী। প্রেম নয়, কামনা নয়। তবু তার কাছে দু'দণ্ড বসতে পেলে যেন মনের বিক্ষুব্ধ স্রোত শান্ত হয়ে যায় নিমেষে। তাই বার বার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, অথচ কাছে গিয়ে কথা ফোটে না লালীর মুখে। শুধু 'গঙ্গাতিলক' বলে বিদ্রূপ করে আর হাসে।

গানের মুজরায় তবল্‌চী অযোধ্যাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কখনো উদাস হয়ে যায় লালী, সব ভুলে যায়, মন চলে যায় কোন এক না-ভাবার গভীরতায়। এমন একটি ব্যর্থ জীবনকে কানায় কানায় ভরে দিতে পারলে যেন শান্তি পায় লালী। তাই হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

—বেশরম্! ক্রোধের স্বরে চিৎকার করে সাবধান করে দেয় হীরাবাঈ।

হুঁশ ফিরে আসে হীরাবাঈয়ের ধমকে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক লজ্জারুণ রক্তে লাল হয়ে ওঠে লালীর মুখ। অপ্রতিভ হাসি হেসে তানপুরার তারে আঙুল বুলিয়ে যায় লালী, কিন্তু মনে মনে হীরাবাঈয়ের দুর্বোধ্য ব্যবহারে বিস্মিত হয়। কখনো আক্রোশে ফেটে পড়ে।

তবু অপমান লুকোবার জন্যে কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়ে, আর বলে, গঙ্গাতিলক কেমন মাথা নেড়ে নেড়ে তবলা বাজায় দেখছিলাম।

গোপন হৃদয়ের জ্বালা লুকিয়ে প্রতিজ্ঞা করে, জলসার মাঝে যেভাবে লালীকে বার বার অপমান করে হীরাবাঈ, সুযোগ পেলে এমনি ভাবেই একদিন এ-অপমানের জবাব দেবে সে।

কখনো কখনো সন্দেহ উঁকি দেয়। লোকচক্ষুর সামনে অযোধ্যাপ্রসাদকে এড়িয়ে চলে হীরাবাঈ, তবলচীর তাল ভুল হলে নির্দয়কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, কিন্তু হীরাবাঈয়ের মনেও হয়তো মোহব্বত লুকিয়ে আছে অযোধ্যাপ্রসাদকে ঘিরে। কে জানে!

তা হোক, তবু অযোধ্যাপ্রসাদকে সে ছিনিয়ে নেবে হীরাবাঈয়ের হাত থেকে। তার রূপযৌবনের বহ্নিশিখার কাছে হীরাবাঈয়ের রূপ একটা চাঁদির চুটকির দামও পাবে না অযোধ্যাপ্রসাদের চোখে।

মনে মনে আক্রোশে জ্বলে ওঠে লালী।

—মোহব্বত! ক্রুদ্ধ চোখে একদিন তাকিয়েছিলো হীরাবাঈ। বলেছিলো, সব মিথ্যে লালী, সব ঝুটা। হিন্দু কাফের, হিন্দু কখনো ভালোবাসতে পারে না।

কৌতুকের হাসি হেসে জানালায় দাঁড়ায় লালী। তার মন বলে, অযোধ্যাপ্রসাদের আকর্ষণ থেকে লালীকে দূরে রাখবার জন্যেই সাবধান করছিলো হীরাবাঈ।

উপদেশ নয়, ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পায় সে হীরাবাঈয়ের কথায়।

বুঝতে পারে, পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে সে লালী আর অযোধ্যাপ্রসাদের মধ্যে। হয়তো দু'জনের মধ্যে একটা দূরত্বের পাঁচিল গড়ে তুলতে চায় হীরাবাঈ। একটা বিচিত্র রহস্যময় খেলা। তাই বাধা পেয়ে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে লালী। নেশা জেগে ওঠে তার উষ্ণ রক্তে।

ঝরোকায় দাঁড়িয়ে সায়রের নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকে লালী। হঠাৎ একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচড় দিয়ে ওঠে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে সায়রের পাড়ে গুলবাগিচার দিকে। ক্ষণে ক্ষণে সুরার পাত্র তুলে নেয়, জ্বালা দিয়ে জ্বালা জুড়োতে চায়।

হঠাৎ চোখ পড়ে একটি ছায়াশরীরের দিকে। অযোধ্যাপ্রসাদ? হ্যাঁ, নিরালা জ্যোৎস্নার আবছায়ায় জলের ধারে একাকী বসে আছে অযোধ্যাপ্রসাদ।

অনুসন্ধানী চোখে হীরাবাঈয়ের কক্ষের দিকে তাকায় লালী।

আলো নিবে গেছে হীরাবাঈয়ের ঘরে। হয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে হীরাবাঈ।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এলো লালী। করুণ বিষণ্ণতার পাশে একটা জ্বালাহর সঙ্গ দিতে চায় সে। অযোধ্যাপ্রসাদের ছায়াশরীরের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই এগিয়ে গেলো সায়রের দিকে। নেশায় পা টলতে থাকে তার।

একেবারে অযোধ্যাপ্রসাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—গঙ্গাতিলক!

ফিরে তাকালো অযোধ্যাপ্রসাদ। তাকে হীরাবাঈ মনে করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পেরে ম্লান একাকীত্বের কণ্ঠে বললে, কে, লালী?

লালী শান্তস্বরে বললে, এতো রাত্রে একা বসে বসে কি ভাবছেন তবল্‌জী?

—কি ভাবছি? হাসলো অযোধ্যাপ্রসাদ। বললে, জীবনে আমার কি আছে, কে আছে, লালী, যে তার কথা ভাববো বিনিদ্র চোখে?

—সব, সব আছে আপনার। মৃদু হেসে নেশার কণ্ঠে লালী উত্তর দিলে। বললে, চাইতে জানলেই পাওয়া যায় তবল্‌জী, জোর করে কেড়ে নিতে জানলে সবই পাওয়া যায়।

—প্রেম?

—প্রেম, মোহব্বত, তাও পেতে হলে তাকত দরকার। তাও জোর করে আদায় করতে হয় গঙ্গাতিলক।

সশব্দে হেসে উঠলো অযোধ্যাপ্রসাদ। বললে, না লালী, প্রেম

ভিক্ষা পেতে হয়। প্রেম জোর করে নেওয়া যায় না, যে পায় তার কাছে আপনা থেকেই আসে।

কৌতুকের হাসি হেসে অযোধ্যাপ্রসাদের পাশে বসে পড়ে লালী। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে।

তারপর অযোধ্যাপ্রসাদের একটা হাত তুলে নেয় মুঠোর মধ্যে। নেশায় ভেঙে পড়ে জড়ানো গলায় বলে, হয়তো তাই, হয়তো মোহব্বত আপনা থেকেই এসে ধরা দেয়।

আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে লালী, অযোধ্যাপ্রসাদের শরীরে তার উষ্ণদেহের স্পর্শ দিয়ে। বলে, তাই আপনা থেকেই এসেছি তবল্‌জী।

কামনামত্ত নাগিনীর মতো দু'বাহু বাড়িয়ে অযোধ্যাপ্রসাদকে আলিঙ্গন করতে চায় লালী। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ে অযোধ্যাপ্রসাদের মুখে।

শিউরে ওঠে অযোধ্যাপ্রসাদ।

লালীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ফিরে যাও লালী, ফিরে যাও। সুরার নেশায় বেহুঁশ হয়ে গেছো তুমি, চলো পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে···

হঠাৎ সশব্দে হেসে ওঠে লালী।—এতো ভয় গঙ্গাতিলক? ধর্ম নষ্ট হবার এতো ভয় তোমার?

—লালী! হীরাবাঈয়ের ক্রুদ্ধস্বর শুনে পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে লালী।

দেখে, হীরাবাঈ এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে।

সুরার নেশায় পা টলতে থাকে লালীর। উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হীরাবাঈকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে বলে, সেলাম বাঈসাহেবা! মাফ্···বেকসুর মাফ্ করে দাও হীরাবাঈ। তোমার আশককে কেড়ে নিতে এসেছিলাম। জানতাম না, জানতাম না তোমার অপেক্ষাতেই গঙ্গাতিলক বসে আছে! তোমার কসম।

অট্টহাসে হেসে উঠলো লালী, তারপর টলতে টলতে চলে

গেলো। দূর থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললে, সেলাম গঙ্গাতিলক। বলেই নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো স্খলিত পদক্ষেপে।

অযোধ্যাপ্রসাদ ধীরে ধীরে বললে, নেশা শয়তান, হীরা। নেশা ইজ্জত ভুলিয়ে দেয় মানুষের।

হীরাবাঈ বললে, লালীকে বাঁচাতে চাই আমি, হিন্দুস্থানের সেরা কাঞ্চনী করতে চাই। ওকে নষ্ট করো না তুমি, কাঞ্চনী থেকে কস্‌বী বানিয়ো না ওকে, এই আমার আরজি।

অযোধ্যাপ্রসাদ ম্লানমুখে বলে, এ কি মিথ্যে সন্দেহ তোমার হীরা! আমি শুধু একজনকেই ভালোবাসি হীরা, একজনকে।

—তবল্‌জী! ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করে ওঠে যেন হীরাবাঈ। বলে, তোমার কসম ভুলে যেও না। হীরাবাঈয়ের তবল্‌চী তুমি, আর কোনো পরিচয় নেই তোমার। সে-কথা ভুলে গেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে তোমাকে।

হাসে অযোধ্যাপ্রসাদ।—সাচ্চা জহরতকে কাচ বানাতে চাও হীরা? বেশ তাই হবে। শুধু দেখা পেতে চাই তোমার, কথা শুনতে চাই, আর কিছু নয়। তাই হবে হীরা, ভুলেই থাকবো। জানবো, আমি শুধু হীরাবাঈয়ের তবল্‌চী।

—হ্যাঁ, শুধু তবল্‌চী।

দ্রুতপায়ে ফিরে এলো হীরাবাঈ।

লালীর কক্ষে ঢুকে দেখলে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাসছে লালী।

হীরাবাঈ ডাকলে, লালী!

লালী ফিরে তাকালো।

হীরাবাঈ বললে, তোমার যে-পায়ে নিজের হাতে পায়েল পরিয়ে দিয়েছি, ভুলে যেও না সে-পায়ে শিকল পরাবার এক্তিয়ারও আমার আছে। ভুলে যেও না তুমি আমার বাঁদী।

পরক্ষণেই সদর্পে বেরিয়ে আসে হীরাবাঈ, উত্তর শোনবার জন্যে

অপেক্ষা না করে। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, আর তবল্‌চীকে কোনোদিন যেন গঙ্গাতিলক বলে বিদ্রূপ করতে না দেখি, মনে রেখো।

আতঙ্কের চোখ তুলে তাকায় লালী। দেখে হীরাবাঈ চলে গেছে, ঘরের মাঝখানে এক দমকা বিভীষিকার বাতাস রেখে।

বহিন বলে যে একদিন স্নেহের আলিঙ্গন দিয়েছিলো তাকে, সে-ই আজ মনে পড়িয়ে দিয়েছে লালী একজন সামান্যা ক্রীতদাসী। একশো মোহর দিয়ে কেনা বাঁদী তার।

হীরাবাঈকে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়।

মনে হয়, এক নিমেষে যেন তার সব সম্ভ্রম সব ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে গেছে হীরাবাঈ।

নিশ্চুপ পড়ে থাকে লালী! চোখ তুলতে পারে না! তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে এসে হীরাবাঈয়ের দরজায় কান পাতে। শুনতে পায়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সশব্দে কাঁদছে হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ কাঁদে?

এগারো

দূর-উড়িষ্যার পাঠানদুর্গে রহিম খাঁর সঙ্গে বিদ্রোহের মন্ত্রণা করতে করতে শোভা সিংহ তার অনুজ হেমন্ত সিংহের চিঠি পেলো।

চিঠি পেয়েই রহিম খাঁকে ইশারা করে গানের জলসা থেকে উঠে এলো। খবর জানবার আগ্রহে রহিম খাঁও বেরিয়ে এলো জলসা-ঘর থেকে। প্রশ্ন করলে, কি খবর দোস্ত্, হঠাৎ গানের মৌজ নষ্ট করে দিলে কি কারণে?

আক্রোশে জ্বলে উঠলো শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দুঃসাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে বন্ধু।

রহিম খাঁ বিস্মিত হয়ে তাকালো শোভা সিংহের দিকে। বিচলিত বোধ করলো যেন।—কি দুঃসাহস শোভাজী?

শোভা সিংহ রোষদীপ্ত হাসি হেসে নিজের মনেই বললে, আওরঙ্গজেব দক্ষিণের শিবাজীকে দেখেছে, বন্ধু, কিন্তু বাংলার শোভাজীর পরিচয় পায়নি এখনও।

রহিম খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে, লেফাফা কি খবর এনেছে দোস্ত্? যুদ্ধের?

শোভা সিংহ সহাস্যে বললে, না, যুদ্ধকে ভয় পায় বাংলার নবাব। তাই কাপুরুষ ইব্রাহিম খাঁ শোভা সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার কন্যাকে নবাবী অন্দর-মহলে নিয়ে যাবার জন্যে তাঞ্জাম পাঠিয়েছিলো, রহিম শেখ।

দাঁতে দাঁত চেপে রহিম খাঁ বললে, জানোয়ার!

শোভা সিংহ বললে, চিন্তার কারণ নেই বন্ধু, শোভা সিংহের কন্যা সে-তাঞ্জাম পদাঘাত করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠলো রহিম খাঁ। বললে, শোভা সিংহের কন্যার যোগ্য উত্তরই সে দিয়েছে, দোস্ত্। কিন্তু—

—কিন্তু কি, রহিম শেখ?

চিন্তার রেখা দেখা দিলো রহিম খাঁর কপালে। বললে, এ অপমানের খবর আওরঙ্গজেবের কাছেও গিয়ে পৌঁছবে শোভাজী। আর সে-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে—বর্ধমানরাজকেও আনতে হবে বিদ্রোহীদের দলে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো শোভা সিংহ। বললে, মোগলের দাস কৃষ্ণরাম হবে বিদ্রোহী? অসম্ভব রহিম শেখ, অসম্ভব।

—হিন্দুর ওপর মোগলের অত্যাচারে রাজা কৃষ্ণরামও বিরক্ত হয়ে আছেন, তাঁকে বন্ধুতে পরিণত করা কঠিন নয়, শোভাজী। স্বাধীন বিষ্ণুপুরের স্বার্থে আঘাত লাগেনি বলেই মল্লরাজ আলমগীরের বন্ধু, হয়তো বিদ্রোহ দমনের জন্যে তার সাহায্য নিতে পারে মোগল নবাব। সে-শক্তিকে বাধা দিতে হলে বর্ধমানরাজকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করতে হবে। যে অধীন সে-ই বিদ্রোহ করে শোভাজী, বিদ্রোহ স্বাধীনের জন্যে নয়।

শোভা সিংহ চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু শত্রুকে বন্ধু করার যে কোনো পথই নেই শেখজী!

রহিম খাঁ হেসে বললে, আছে। শুনেছি রাজা কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী এক কন্যা আছে। আপন কন্যার জন্যে যোগ্য পাত্র খুঁজে না পেয়ে দিল্লীর শাহজাদীদের মতোই তাকে আজীবন কুমারী রাখতে বাধ্য হয়েছেন কৃষ্ণরাম। তাঁর কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠাও শোভাজী। আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো বন্ধন আর নেই।

শোভা সিংহ সহাস্যে বললে, মূর্খ কৃষ্ণরাম শোভা সিংহকে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করবে না, বন্ধু। মোগলের পদানত ভূস্বামীর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি।

রহিম খাঁ বললে, কন্যার বিবাহ সম্পর্কে হতাশ হয়ে এখন হয়তো

ভুল ভেঙেছে কৃষ্ণরামের, প্রস্তাব পাঠাও বন্ধু, আমার বিশ্বাস অপমান করার দুঃসাহস হবে না কৃষ্ণরামের। ভীত কৃষ্ণরামও জানে, আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো বন্ধন আর নেই।

'আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো বন্ধন আর নেই।' রহিম খাঁর কথাটা বারংবার মনের চারপাশে ঘুরে বেড়ালো। চিন্তার দ্বন্দ্বে ডুবে গেলো শোভা সিংহ।

বিবিবাজারের হীরাবাঈয়ের জলসায় যে অপমান ছুঁড়ে দিয়েছিলো রাজা কৃষ্ণরাম, তার প্রতিশোধ নেবে সে, না তাকে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বেঁধে উত্তর দেবে লালসামত্ত ইব্রাহিম খাঁর ঘৃণ্য দুঃসাহসের!

উড়িষ্যা থেকে চিতোয়া-বরদার পথে ফিরে আসতে আসতে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হলো শোভা সিংহের মনে। পথের আশেপাশে অসংখ্য দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্বেষের বিষ জ্বলে উঠলো তার বুকে।

আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের প্রতিটি চিহ্ন যেন ঘৃতাহুতি দিলো শোভা সিংহের ক্রোধাগ্নিতে।

মেদিনীপুরের পরগনা চিতোয়া-বরদায় ফিরে এলো শোভা সিংহ, ফিরে এসেই শুনলো আওরঙ্গজেবের নতুন নির্দেশ। তাম্রলিপ্ত থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দির বিনষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন দিল্লীশ্বর।

প্রজারা ভিড় করে এসে নিবেদন জানালো, চিতোয়া-বরদার প্রত্যেকটি মন্দিরকে বাঁচাতে হবে বিধর্মী সম্রাটের অত্যাচার থেকে।

অত্যাচারের পর অত্যাচার। তখন আলমগীর স্বপ্ন দেখছেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার।

সুবা বাংলার বুকেও হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া ধার্য হলো। পরোয়ানা এসে পৌঁছলো দেববিগ্রহ অপবিত্র করার নির্দেশ নিয়ে।

গৃহস্থবধূর লক্ষ্মীর আসনেও হাত পৌঁছলো বিধর্মী মনসবদারের। নিষিদ্ধ হলো নাচ আর গান, হিন্দুর মেলা, দীপালী উৎসব আর হোরী উৎসব। রাজকর্মে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হলো। পেশকার, দিওয়ানীয়ান, ক্রোরীর আসন থেকে অবসর নিতে হলো হিন্দু কর্মচারীদের। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ মাশুল ধার্য হলো পণ্যদ্রব্যের ওপর।

দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো হিন্দু প্রজারা। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো।

তবু সহ্য করে ছিলো শোভা সিংহ, বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেছে শুধু, স্বপ্ন দেখেছে সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে হিন্দুরাজ্য। বিদেশী বিধর্মী সম্রাটের হাত থেকে রাঢ়ভূমিকে ছিনিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছে দিনের পর দিন।

কিন্তু সহ্যেরও বোধহয় সীমা আছে।

শোভা সিংহ কোনোদিন কল্পনাও করেনি, মোগল ঔদ্ধত্য শেষে তারই কন্যার দিকে লোভের হাত বাড়াবে। কল্পনা করেনি, তারই জায়গীরের দেবমন্দির ধূলিসাৎ করার আদেশ দেবে আওরঙ্গজেব।

মনে মনে সঙ্কল্প ঠিক করে দূত পাঠালো শোভা সিংহ। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠিয়ে।

সামাজিক উপঢৌকন নিয়ে বর্ধমান-রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলো দূত। যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে উপঢৌকনের স্বর্ণথাল আর শোভা সিংহের চিঠি তুলে দিলো কৃষ্ণরামের হাতে।

প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম। দরবার কাঁপিয়ে অট্টহাস হাসলো কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম।

কৃষ্ণরাম সহাস্যে বললেন, শোভা সিংহের এ প্রস্তাবের উত্তর দেবে সত্যবতী, তার কাছেই পাঠিয়ে দাও এ পত্র।

খবর পৌঁছে গেলো অন্দর-মহলে।

দূতের চিঠি আর উপহারের স্বর্ণথাল হাতে নিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে দাঁড়ালো আলাপনী কাদম্বরী।

গজদন্তে বাঁধানো মুকুরের সামনে দাসীপরিবৃত হয়ে প্রসাধন করতে করতে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালো সত্যবতী। প্রশ্ন করলে, কিসের উপহার কাদম্বরী?

কাদম্বরী কৌতুকের হাসি হেসে বললে, মহারাজের অধীন এক তুচ্ছ জায়গীরভোগী শোভা সিংহ দূত পাঠিয়েছে রাজকুমারী। পরমাস্থন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করতে চায় একজন সামান্য ভৌমিক।

অপমানে ক্রোধে ফেটে পড়লো সত্যবতী। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের পরমাস্থন্দরী কন্যাকে পত্নীরূপে পেতে চায় এক সামান্য ভূস্বামী? যার রূপে গুণে বংশ-মর্যাদায় সমকক্ষ পাত্রের সন্ধান মেলেনি সারা ভারতে, হীন স্বামীর গলায় বরমাল্য তুলে দেওয়ার চেয়ে আজীবন কুমারীব্রত পালন করাকেই যে শ্রেয় মনে করে, তাকে পত্নীরূপে পেতে চায় এক অধীনস্থ জায়গীরদার? কাদম্বরীর হাতের স্বর্ণপাত্রের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো সত্যবতী!

বললে, এ রসিকতার কি অর্থ কাদম্বরী?

কাদম্বরী বললে, শোভা সিংহ এই যৌতুক পাঠিয়েছে রাজকুমারী, মহারাজের ইচ্ছা এ ঔদ্ধত্যের জবাব তুমি নিজেই দেবে।

একজোড়া স্বর্ণখচিত শঙ্খকঙ্কণ আর দু'টি নারকেলের গায়ে সিঁদুরের প্রলেপ স্বর্ণথালের ওপর! সেদিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হেসে সত্যবতী বললে, দূতকে বলে দাও কাদম্বরী, এ কঙ্কণ শোভা সিংহের হাতেই মানাবে, আমার হাতে এই কৃপাণই একমাত্র ভূষণ।

বলে কটিবন্ধ থেকে ধারালো কৃপাণ বের করে দেখালো সত্যবতী।

খিলখিল করে হেসে উঠলো কাদম্বরী। বললে, এ নারকেল ভাঙ্গার স্থান কোথায় শ্বেত-পাথরের এই রাজপ্রাসাদে, বরং শোভা সিংহের মাথায়—

হু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলো খিলখিল করে। দাসীর দল কৌতুকের হাসিতে লুটিয়ে পড়লো।

উত্তর শুনে দূত বিদায় নিলো, যাবার আগে জানিয়ে দিলো শোভা সিংহের প্রত্যুত্তর। বললে, যে কঙ্কণ আজ ফিরিয়ে নিয়ে চলেছি মহারাজ, সেই কঙ্কণ শৃঙ্খল হয়ে ফিরে আসবে একদিন।

বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম দূতের মুখে শোভা সিংহের অহঙ্কার শুনে। বিভ্রান্ত বোধ করলেন তার ঔদ্ধত্যে। রাজা কৃষ্ণরাম দেওয়ানজীকে নির্দেশ দিলেন গোপনে চিতোয়া-বরদার সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে।

এ দুঃসাহসের পিছনে নিশ্চয় কোনো প্রস্তুতি আছে, নিশ্চয় গোপনে শক্তি সঞ্চয় করছে শোভা সিংহ। শুধুমাত্র পাঠান রহিম খাঁর শক্তিতে আস্থা রেখে অধীশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানোক্তি করা সম্ভব নয় কোনো তুচ্ছ ভৌমিকের পক্ষে।

পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, শোভা সিংহের এ ঔদ্ধত্যের খবর সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে জগৎরাম। সাবধান করে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়ে রাখতে হবে। হয়তো বিদ্রোহের দেরি নেই।

জগৎরাম ভীত হয়ে পড়লো। সত্যিই হয়তো বিদ্রোহের আর দেরি নেই। দূতের উত্তরেই বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখতে পেয়েছে জগৎরাম। রাঢ়ভূমির প্রজাকুল অন্ধ আক্রোশ পুষে চলেছে আলমগীরের হিন্দু নির্যাতনের জন্যে। শোভা সিংহের শক্তি তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু তার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গমাত্র কেন্দ্র করে প্রজাবর্গের নৃশংস উল্লাস ধ্বনিত হতে পারে বর্ধমানরাজের বিরুদ্ধে।

কালবিলম্ব না করে রাজমহলের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো জগৎরাম।

ইব্রাহিম খাঁর দরবারে লক্ষ মোহরের নজরানার থলি তুলে দিয়ে খবর পৌঁছে দিলো।

নজরানার লক্ষ মোহর খাজাঞ্চীর হাতে দিয়ে জগৎরামকে আদর

আপ্যায়নে প্রীত করলো অলস আর ভীরু স্বভাব ইব্রাহিম খাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করলে না জগৎরামের কথা। প্রবল-প্রতাপ আলমগীরের রাজত্বে কিনা একজন সামান্য জায়গীরদার বিদ্রোহ করবার স্বপ্ন দেখছে! অসম্ভব।

ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে শুনলো অন্দর-মহলের বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগম।

শুনে হাসলো।

বললে, মিথ্যা দুশ্চিন্তা জাঁহাপনা। আলমগীরের রাজত্বে কারও বিদ্রোহ করার সাহস থাকতে পারে না। আর তুচ্ছ শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলেও সে-আগুন আপনা থেকেই নিবে যাবে।

কিন্তু মনে মনে বললে, বিদ্রোহ বাইরে নয় ইব্রাহিম খাঁ, বিদ্রোহ তোমার অন্দর-মহলে।

বারো

কল্কা-তোলা পশমী বনাতের পর্দায় ঢাকা তাঞ্জাম ফিরে এলো নবাব ইব্রাহিম খাঁর প্রাসাদে। জলসামহলের দারোগার কানে ফিসফিস করে কি যেন বললে মুসলমানী সিন্ধুকী। দারোগা খবর দিলো খোজা প্রহরীকে।

তারপর খোজার কাছ থেকে শুনলো ইব্রাহিম খাঁর বিশ্বস্ত বাঁদী। সুরার পাত্র তুলে দিতে গিয়ে কি যেন বলতে গেলো সে নবাবের কানে কানে।

আর পরক্ষণেই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আয়েশী শরীরটাকে তোলবার চেষ্টা করে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ইব্রাহিম খাঁ।—চুপ রহো বেয়াদব! দরবারের খবর কিনা রঙমহলে পৌঁছে দিয়ে জলসার মৌতাত ভেঙে দিতে এসেছে বেকুফ!

ধমক শুনে ভয়ে সরে গেল বাঁদী।

মুহূর্তের জন্যে নাচের ঘূর্ণি থামিয়ে ইব্রাহিম খাঁর চোখে চোখ রেখে কটাক্ষ হানলে তয়ফা। যৌবনের লোভানি জ্বালালো শরীরের ছন্দে।

সুরার নেশায় মশগুল হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ইব্রাহিম খাঁ। দুনিয়া রসাতলে যাক, এমন নাচের মেজাজ নষ্ট করতে পারবে না সে সুদূর রাঢ়ভূমির এক ভৌমিক-কন্যার দুঃসাহসের খবর শুনে।

একদৃষ্টে ইরানী তয়ফার দিকে তাকিয়ে রইলো ইব্রাহিম খাঁ। নাচের তালে তালে উড়ে পড়ছে গোলাপী ওড়না, কাঁপছে সোনালী জরির কাঁচুলি, চুনিচমক ঘাগরার মগজি ভেসে উঠছে ইরানী মেয়ের কোমর ঘিরে।

যৌবন-লালসার বিকৃত আনন্দে ডুবে গেলো ইব্রাহিম খাঁ, ডুবে গেলো বাংলার সুবাদারী মসনদ।

সুবাদারের অন্তঃপুর নয়, যেন বিলাস আর প্রমোদের রঙ্গভূমি। সহস্র নর্তকীর নূপুরনিক্কণের কাছে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের দুঃখ, কান্না। সুরা এবং সুরসুন্দরীর নেশায় ডুবে গেছে তখন সমগ্র জলসামহল।

কিন্তু সেই ফাঁকে অন্দর-মহলে দেখা দিয়েছে কুটীল চক্রান্ত। অন্দর-মহলের কর্ত্রী 'বেগমসাহেবা' দিল্‌রস বেগমের ঈষৎ শুভ্রকেশ তখন সাকিনা বেগমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের হিসেব কষে কষে শুভ্রতর হয়ে উঠছে। অন্যদিকে নবাবের প্রিয়পাত্রী সাকিনা বেগমের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

সাকিনার গোপন প্রেমাভিসারে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে প্রৌঢ়া দিল্‌রস বেগম। অথচ প্রকাশ্যভাবে তার আশনাইয়ে বাধা দিতে পারে না 'বেগমসাহেবা'।

সাকিনা বেগমের রূপ আর যৌবনের মোহে অন্ধ হয়ে আছে ইব্রাহিম খাঁ। লক্ষ লক্ষ আসরফি ঢেলে দেয় তার পায়ে, সাকিনা বেগমের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে তৈরী হয় লক্ষ মুদ্রার হামাম-ই-গুলাব।

গোলাপ নির্যাসে স্নান করবার জন্যে শ্বেত মর্মরের এক বিশাল হামাম তৈরী হয়েছে সাকিনা বেগমের খাসমহলে। সে স্নানাগার পরিণত হয়েছে প্রণয়াভিসারের গোপন কক্ষে।

এই হামাম-ই-গুলাবের পাশের প্রসাধনকক্ষে তখন অপেক্ষা করে আছে সাকিনা বেগম।

রূপসী বাঁদীর দল তখন সাকিনার প্রসাধনে ব্যস্ত। গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী জরি সুপুষ্ট দু'টি বেণীর গায়ে এঁকেবেঁকে লুটিয়ে পড়েছে আয়নায় মোড়া মেঝের ওপর। গোলাপী মসলিনের ওড়নার নীচে কাশ্মীরী রেশমের স্তনাবরণ। আসমানী আঙিয়ার গায়ে চুনি পান্না হীরে জহরতের চমক। স্বচ্ছ রেশমের চম্পাবরণ পায়জামার কিনারায় রূপালী জরির নক্‌শায় ফিরোজা বসানো। হীরে মুক্তার টায়রা

সিঁথিতে, কণ্ঠের সাতনরী মুক্তামালার লহরী বুকের তরঙ্গ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

মণিবন্ধের কঙ্কণের সারি সরিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটির ছোট্টো আয়নায় বার বার নিজের রূপ দেখে সাকিনা, নিজেই মুগ্ধ হয়!

বাঁদীরা অনুযোগ করে, এমন চাঁদের রূপ কি ঐ ছোট্ট আয়নায় ধরা দেয় মালিকা বেগম!

শুনে খুশীর হাসি হাসে সাকিনা, ঠোঁটের রঙ আর চোখের কোণে সুর্মার রেখা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে তাকায় দেয়ালের বড়ো আয়নার দিকে।

দেয়ালের চারপাশে, মাথার ওপরে আর পায়ের নীচে—সমস্ত ঘরখানাই ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কেনা দামী আয়নায় সাজানো। আর সেদিকে তাকিয়ে হাজারো সাকিনা বেগমের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় সে।

কপালের বাঁকা টায়রার নীচে যেন তুলিতে আঁকা একজোড়া ভুরু, আর তারও নীচে রহস্যময় একজোড়া চোখ।

ক্ষণে ক্ষণে দরজার মখমলের সবুজ পর্দাটার দিকে তাকায় সাকিনা বেগম, বাঁদীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রসাধনের মেজ থেকে কস্তুরীর পাত্রটা তুলে নিয়ে হঠাৎ বাঁদীদের গায়ে ঢেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো সাকিনা। তারপর এসে বসলো শ্বেতপাথরে বাঁধানো ফোয়ারার বেদীতে, বসলো আঙুরের ভারে নুয়ে পড়া লতাঝোপের পাশে। নগ্ন নারীমূর্তির ফোয়ারা থেকে অবিরত ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ শীতল গোলাপ জল। তাজা গোলাপের পাপড়ি ভাসে সে জলের তরঙ্গে। ফোয়ারার অন্য মূর্তিটির হাতের সুরাপাত্র থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফুটন্ত জল।

একদিকে ঠাণ্ডা জল, অন্যদিকে গরম জল এসে মিশেছে। ফুটন্ত জলের ওপর দুলে দুলে উঠছে উষ্ণ বাষ্পের কুণ্ডলী।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে চোখ রেখে অপেক্ষার সময় গোনে সাকিনা বেগম।

এখনই এসে পৌঁছবে দশহাজারী মনসবদার জাফর খাঁ, সাকিনার অবৈধ প্রণয়ের আশক।

ক্ষণে ক্ষণে দরজার সবুজ মখমলের পর্দাটার দিকে আশার চোখে তাকায় সাকিনা বেগম, পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে বাঁদীদের ওপর।

আভের পাখা নেড়ে বাতাস করছিলো দু'জন বাঁদী, তাদেরই একজনের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তার মুখের ওপর ঘা-কয়েক বসিয়ে দিলে সাকিনা, ময়ূরের পেখমগুলো ভেঙে গেলো সে-আঘাতে।

তা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো সাকিনা বেগম। প্রসাধনের মেজ থেকে গজদন্তের কারুকার্য করা সোনার আতরদানটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখলো।

তারপর এসে বসলো শ্বেতপাথরে বাঁধানো বেদীটায়।

চৌবাচ্চার ওপর আবলুস কাঠের আবরণ।

স্নানের সময় দু'টো খোজা চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই আবরণ সরিয়ে দেয়, বাঁদীরা ছড়িয়ে দেয় তাজা গোলাপের পাপড়ি। মুহূর্তের নির্দেশে ঠাণ্ডা জলের ধারাবর্ষণ বন্ধ হয়, ঝরে পড়ে উত্তপ্ত জলের স্রোত।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই সাকিনা বেগমের। এমন গভীর রাত্রিতে স্নানের জন্যে আসেনি সে হামাম-ই-গুলাবে। এসেছে প্রণয় অভিসারে।

ঝরোকার পাশে গিয়ে বসে সাকিনা, যে-ঝরোকার গা বেয়ে উঠেছে আঙুরের লতা, নুয়ে পড়েছে রসালো সমরখন্দী আঙুরের ভারে!

ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে সাকিনা বেগম, তারপর হতাশা দেখা দেয় তার চোখে।

হঠাৎ একটা শিস বেজে উঠলো। সাকিনার দু'চোখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে ইশারায়।

পরক্ষণেই পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সাকিনা। এ পদশব্দ তার চেনা।

বাঁদীরা ছুটে গেলো, আর পরমুহূর্তেই একজন বাঁদী কিংখাবের পর্দা তুলে ধরলো। সুদর্শন সুপুরুষ তুরানী মনসবদার জাফর খাঁ একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো, আলিঙ্গন করলে সাকিনা বেগমকে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সরে গেলো বাঁদী আর খোজার দল।

সাকিনা বেগমের বিশ্বস্ত বাঁদী পর্দার বাইরে এসে প্রহরায় নিযুক্ত রইলো। ইব্রাহিম খাঁর জলসার দরজা এখান থেকে দেখা যায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলো সে। জলসামহলের খোজা-দারোগাকে কুর্নিশ করতে দেখলেই বুঝতে হবে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বালাখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। শিস দিয়ে সাবধান করে দিতে হবে তখন।

খোজা প্রহরী দু'জনকে ইশারা করলে বাঁদী, চাকা ঘুরিয়ে চৌবাচ্চার সব জল নিষ্কাশন করার জন্যে। প্রয়োজন ঘটলে যেন ঐ চৌবাচ্চার আবলুস কাঠের আবরণের নিচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে জাফর খাঁ।

খোজাদের নির্দেশ দিয়ে জলসামহলের দিকে ফিরে তাকালো বাঁদী। আর পরমুহূর্তেই দেখলে অদূরের আবছায়া অলিন্দে যেন একটি নারীমূর্তি ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে! চোখোচোখি হতেই মূর্তিটা আড়ালে সরে গেলো।

বিস্মিত হলো বাঁদী।

বেগমসাহেবা দিলরস বেগম না? আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। সে জানে, নবাব-আত্মীয়া দিলরস বেগম এ আনন্দমহলের সর্বময় বেগমসাহেবাই নয়, তার অঙ্গুলিনির্দেশে জল্লাদের খড়্গ নামতে পারে জাফর খাঁর ঘাড়ের ওপর।

রুদ্ধশ্বাসে পর্দার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকেই সে ফিসফিস করে ডাকলে, মালিকা বেগম!

দূর থেকে বাঁদীর চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে নিজের মনেই হাসলো বেগমসাহেবা দিল্‌রস। মূর্খ ক্রীতদাসী জানে না, এখনও বেগমসাহেবার চক্রান্ত সম্পূর্ণ হয়নি। অকারণে ইব্রাহিম খাঁর মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে সাকিনা বা জাফরকে দগ্ধ করতে চায় না দিল্‌রস।

স্বপ্ন সফল করবার জন্যেই সেনাপতি নুরুল্লা খাঁর সঙ্গে চক্রান্ত করে সিন্ধুকী নিয়োগ করেছিলো দিল্‌রস, সুরা-বিভোর নবাবকে পাঞ্জাছাপ দিতে বাধ্য করেছিলো শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভার জন্যে তাঞ্জাম পাঠানোর সময়।

হিসেবে ভুল হয়নি দিল্‌রস বেগমের। অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে পাইকের দল, ফিরে এসেছে শূন্য তাঞ্জাম। কিন্তু সে-খবর গোপন রেখেছে বেগমসাহেবা, বিশেষ মুহূর্তের জন্যে।

বাংলার মসনদে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিতে হবে জুলেখা বানুকে। বিলাসী ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত্ যদি দিল্‌রসের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, যদি বিবাহে অসম্মতি জানায়, তা হলে ইব্রাহিম খাঁকে সে অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করবে আলমগীরের কাছে। ইব্রাহিম খাঁর নবাবী তক্তে বসাবে ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে। জুলেখা বানুর ওপর নুরুল্লার দুর্বলতার কথা অজানা নয় দিল্‌রস বেগমের। অজানা নয় শাহ-আলম আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের কথা।

অপমানে অত্যাচারে হিন্দু ভূস্বামী আর ভৌমিকদের বিদ্রোহী করে তুলবে দিল্‌রস। ইব্রাহিম খাঁর কাপুরুষতা প্রমাণ করবে দিল্লীশ্বরের কাছে।

তেরো

মেদিনীপুরের পরগণা বরদার অরণ্যে তখন অনুজ হেমন্ত সিংহের তত্বাবধানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে একটি মৃৎপ্রাচীরের দুর্গ। দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে এসে জড়ো হলো শত শত রাজমিস্ত্রী, অস্ত্রনির্মাতা কর্মকার, অগণিত সৈন্য।

রহিম খাঁকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করলেও কেবলমাত্র পাঠান-শক্তির ওপর আস্থা রেখে বসে থাকা চলে না। বাংলার স্বাধীনতা, হিন্দুর স্বাধীনতাই যেখানে কাম্য, সেখানে বিদেশী বিধর্মীর বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করা চলে না। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার করতে হবে, কিন্তু কাজ সমাধা হলে যাতে দু'টি কণ্টকই ছুড়ে ফেলা যায়, তার শক্তি রাখতে হবে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে।

গোপনে শক্তিসঞ্চয় করে চলে শোভা সিংহ।

বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের রাজ্যের কোনো কোনো তালুকদার আর ভূস্বামী গোপনে সাহায্য পাঠায়। প্রতিশ্রুতি জানায় বিদ্রোহের মুহূর্তে যোগদান করার। দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি নতুন নগর—রাজনগর। চতুর্দিকে মাটির বুরুজ তৈরী হয়, কামান আমদানী হয় উড়িষ্যার অস্ত্রশালা থেকে। স্পর্ধার প্রথম জয়ধ্বনি ওঠে শোভা সিংহের দুর্গে, রাজনগরের প্রজাদের মুখে।

আলমগীরের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে তিনটি নতুন দেবমন্দির গড়ার আদেশ দিলো শোভা সিংহ।

তারপর অনুজ হেমন্ত সিংহকে বললে, বিষ্ণুপুরের জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজনগরে নিয়ে আসতে হবে।

—জ্যোতিষাচার্য? হাসলো হেমন্ত সিংহ। বললে, দৈবেই যদি বিশ্বাস আপনার, তখন এতো প্রস্তুতির কি প্রয়োজন ছিলো!

শোভা সিংহ মৃদু হেসে বললে, দৈবে বিশ্বাসের জন্যে নয় হেমন্ত। দৈবজ্ঞকে করতে হবে রাজনীতির অস্ত্র।

চন্দ্রপ্রভা বিস্ময়ের চোখ তুলে বললে, কেন বাবা, জ্যোতিষশাস্ত্র কি সত্য নয়?

শোভা সিংহ স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালো কন্যার মুখের দিকে, তারপর মৃদু হেসে বললে, জানি না মা, হয়তো সত্য, হয়তো বা মিথ্যা। কিন্তু একজনের গণনার ওপর নির্ভর করে কি একটি জাতি তার কর্তব্য স্থির করবে মা? একজন জ্যোতিষের গণনায় ভুল হলে সমগ্র বাংলা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে?

চন্দ্রপ্রভা হেসে বললে, একজন সেনাপতির ওপর আস্থা রেখেই তো একটি দেশ তার মূল্য দিতে বাধ্য হয়।

যুক্তির দিক থেকে তীব্র সত্য। শোভা সিংহ উত্তর খুঁজে পায় না!

তাই হেমন্ত সিংহ বললে, না প্রভা, শুধুমাত্র একজন অধিনায়কের আদেশে এ বিদ্রোহ নয়, সমগ্র বাংলার হিন্দু প্রজাদের মঙ্গল কামনা আছে এ বিদ্রোহের পিছনে। স্বেচ্ছাচারী পররাজ্যলোভী বিদ্রোহী নই আমরা। দেশের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় ধর্মের স্বাধীনতা। হিন্দু ধর্মের, শিক্ষার, সংস্কৃতির স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।

চন্দ্রপ্রভা হেসে বললে, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র কি হিন্দুর সংস্কৃতি নয়?

—না। শোভা সিংহ বললে, জ্যোতিষচর্চা হিন্দুর কুসংস্কার মাত্র।

শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। এ কী বিধর্মীয় কথা শুনতে হলো তাকে! দৈব মিথ্যা? জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা? দৈব মিথ্যা হলে যে দেবতাও মিথ্যা হয়ে যাবে।

বিশালাক্ষীর মন্দিরের কাছে ছুটে গেলো চন্দ্রপ্রভা। এ পাপ-উক্তির জন্যে দেবী বিশালাক্ষী যেন চিতোয়া-বরদার ভূম্যধিপতিকে ক্ষমা করেন।

কিন্তু কন্যার চোখে অশ্রুসজল আতঙ্ক দেখেও বিচলিত হলো না শোভা সিংহ।

বললে, জ্যোতিষাচার্যকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে হেমন্ত। উদ্দেশ্য জানতে পারবে তিনি রাজনগরে উপস্থিত হলেই।

অগ্রজের আদেশে বিষ্ণুপুর যাত্রা করলো হেমন্ত সিংহ। আর সেই সময়ে দূত ফিরে এলো বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে।

শোভা সিংহের উদ্দেশ্যকে কৃষ্ণরাম ভুল বুঝলেন। ঔদ্ধত্য মনে করে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন শোভা সিংহের প্রস্তাব।

দূতের মুখে সত্যবতীর বিদ্রূপ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো শোভা সিংহ।

পরমুহূর্তে অট্টহাসে কাঁপিয়ে তুললো চতুর্দিক। চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে উঠলো পাপের কুটিল ছায়া, সে দৃষ্টিতে অন্যায় লালসার শিখা দেখতে পেলো দূত।

শোভা সিংহ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, রাজনন্দিনী! শোভা সিংহের পত্নীর আসন প্রত্যাখ্যান করেছো অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে, কিন্তু একদিন এ সম্মানও পাবে না তুমি। সেদিন বারবিলাসিনীর মতো শুধুমাত্র অঙ্কশায়িনী হতে হবে এই তুচ্ছ ভূস্বামীর।

পরক্ষণেই নিজের কন্যার কথা মনে পড়লো শোভা সিংহের।

চন্দ্রপ্রভা!

নবাব ইব্রাহিম খাঁর লালসার হাত থেকে বাঁচাতে হবে চন্দ্রপ্রভাকে, বাঁচাতে হবে সমস্ত পাপ আর অন্যায়ের হাত থেকে।

ধীরে ধীরে চিত্তবিশ্রামের শয্যায় শরীর এলিয়ে দিলো শোভা সিংহ। কপালে ফুটে উঠলো দুশ্চিন্তার রেখা। নিজের কাছেই যেন ধরা পড়ে গেছে শোভা সিংহ। মোগল নবাবের সঙ্গে হিন্দু ভূস্বামীর বুঝি কোনো পার্থক্য নেই! নারীর সম্মান উভয়ের হাতেই বিপর্যস্ত—এ-সত্য হঠাৎ যেন ব্যঙ্গ করে উঠেছে শোভা সিংহকে।

হুকাবরদার তামাক সেজে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হুকুমের অপেক্ষায়। সুগন্ধি অম্বুরীর আমেজে ভরে গেলো সমস্ত ঘর।

ফরসির নলটায় হু'টো টান দিয়েই শোভা সিংহ ধীরে ধীরে চোখ বুজলো। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছে তখন।

চন্দ্রপ্রভা বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে পুষ্প আর চরণামৃত নিয়ে ফিরে এসে দেখলে, শোভা সিংহ নিদ্রাচ্ছন্ন।

ধীরে ধীরে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেলো চন্দ্রপ্রভা। পুষ্প আর চরণামৃত তুলে রেখে বাইরের অলিন্দে এসে দাঁড়ালো সুরঞ্জাক্ষীর পাশে।

মৃহু হাসলো সুরঞ্জাক্ষী। বললে, কার মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে এলে? কুমার রঘুনাথের?

চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিলে, না, শক্তি-পূজারী সমগ্র বাংলার, হিন্দু ধর্মের।

—কিন্তু কুমার রঘুনাথ শুনেছি বৈষ্ণব। সুরঞ্জাক্ষী মৃহু হেসে বললে, তাই রাধার প্রেমে ছুটে এসেছিলেন তিনি।

এ রসিকতায় সাড়া দিলো না চন্দ্রপ্রভা, ঈষৎ গাম্ভীর্যের স্বরে বললে, এ মিথ্যাচার আমার ভালো লাগে না সই, মনে হয় অন্যায়।

সুরঞ্জাক্ষী রসিকতার স্বরে প্রশ্ন করলে, কোনটা মিথ্যাচার রাজকন্যে? কুমার রঘুনাথের সঙ্গে প্রেমাভিসার, না পিতার কাছে অভিসারের কথা গোপন রাখা?

—বিষ্ণুপুর যুবরাজের সঙ্গে প্রেমাভিসার।

সুরঞ্জাক্ষী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, কেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা মৃহু স্বরে বললে, নিজের মনের ওপরই সন্দেহ হয়, মনে হয় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তাঁর সঙ্গে এই অভিনয় করেছি। অভিনয় নয়?

নবাবনিযুক্ত সিন্ধুকীর মুখে আনন্দ আর ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনেছে চন্দ্রপ্রভা বহুবার, প্রত্যাখ্যান করেছে তার সহস্র প্রলোভন। কিন্তু

কোনোদিন কল্পনাও করেনি, এমন অসম্মানের আহ্বান জানাবে বাংলার নবাব।

মনে পড়লো চন্দ্রপ্রভার।

ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছিলো শোভা সিংহের অনুরক্ত এক মুসলমান ঘাটোয়াল। শাহী সড়কে প্রহরা দিতে দিতে নবাবী তাঞ্জাম দেখে ছুটে এসেছিলো সে।

বাদশাহী সওয়ানে-নেগারের কাছ থেকে গোপন সংবাদ জানতে পেরেই সাবধান করতে এসেছিলো।

শুনে হেসেছিলো হেমন্ত সিংহ, হেসেছিলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর একসময় রিসালহা সৈন্যের দল এসে নেমেছিলো ঘোড়া থেকে। পিছনে পিছনে পাইকের সারি আর নবাবী তাঞ্জাম।

এক লক্ষ আসরফি উপঢৌকন দিয়ে চন্দ্রপ্রভাকে আহ্বান জানিয়েছিলো ইব্রাহিম খাঁ, অনুরোধ জানিয়েছিলো তার অন্দর-মহলের সম্পদ বাড়ানোর জন্যে, মহলসরার শোভা বাড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।

আর সে-চিঠি পড়ে ঘৃণায় বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠেছিলো চন্দ্রপ্রভার সমস্ত শরীর।

নবাব ইব্রাহিম খাঁর তাঞ্জামে পদাঘাত করে পাইকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা। তারপর চিন্তিতভাবে প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে করতে আশঙ্কার ছায়া দেখা দিয়েছিলো তার চোখে! শোভা সিংহ তখন দূর-উড়িষ্যায়।

সুরঞ্জাক্ষীর বুকেও সেদিন আতঙ্ক কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। আর চন্দ্রপ্রভার চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠেছিলো শৈশবের একটি দৃশ্য, যেদিন হার্মাদের হাত থেকে কিশোরী চন্দ্রপ্রভাকে রক্ষা করেছিলো রঘুনাথ।

সে-দৃশ্য মনে পড়তেই কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিলো চন্দ্রপ্রভা। কলমদান নিয়ে আসতে বলেছিলো পরমুহূর্তেই।

সুরঞ্জাক্ষী বিস্মিত হয়ে বলেছিলো, এত রাত্রে কলমদান কি হবে চন্দ্রপ্রভা ?

—প্রণয়পত্র লিখতে হবে বিষ্ণুপুর যুবরাজের কাছে। অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা।

বলেছিলো, যে-জীবন তিনি রক্ষা করেছিলেন সে-জীবন তাঁর পায়েই উৎসর্গ করবো। নবাবের ঘৃণ্য হাত সেখানে পৌঁছতে পারবে না, স্বয়ং আলমগীর বিষ্ণুপুরকে ভয় পায়।

উপযাচিকা চন্দ্রপ্রভার আমন্ত্রণে সেদিন সাড়া না দিয়ে পারেনি রঘুনাথ। যৌবনের উন্মাদনায় সেদিন রঘুনাথের সমগ্র মনের তারে প্রেমের সুর বেজে উঠেছিলো। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলো রঘুনাথ।

কিন্তু অভিসারিণী চন্দ্রপ্রভার সেই প্রণয় আমন্ত্রণ কি শুধুই কৌশল ? শুধুই প্রয়োজনের আহ্বান ?

চন্দ্রপ্রভার নিজেরই সন্দেহ হয় কখনো কখনো।

সুরঞ্জাক্ষী সান্ত্বনা দেয়।—না চন্দ্রপ্রভা, তোমার বুকের মধ্যে যে প্রেম সুপ্ত ছিলো, তা জেগে উঠেছিলো প্রমাদমুহূর্তে। অভিনয় নয়।

চন্দ্রপ্রভা লজ্জিত হাসি হেসে বলে, সে-সত্য আমার মনের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। কিন্তু এ প্রতীক্ষার জ্বালা সহ্য হয় না সই, মনে হয় সকলের অলক্ষ্যে নিজেই ছুটে যাই তাঁর কাছে।

—কিন্তু কুমার রঘুনাথ যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি না রাখেন ? চন্দ্রপ্রভার চোখে উষ্মা ফুটিয়ে তোলার জন্যে কপট আশঙ্কা প্রকাশ করে সুরঞ্জাক্ষী।

প্রশ্ন শুনে হাসি দেখা দেয় চন্দ্রপ্রভার মুখে।

তারপর অনামিকার বিষাক্ত অঙ্গুরীয় তুলে দেখায় চন্দ্রপ্রভা।

—এ বিষপাত্র কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে সুরঞ্জাক্ষী।

চোদ্দ

শোভা সিংহ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে না বললেও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে হেমন্ত সিংহ। বুঝতে পারে শোভা সিংহ কেন জ্যোতিষের শরণ নিতে চায়।

জ্যোতিষাচার্যের সন্ধানে হেমন্ত সিংহ যখন বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছলো তখন সমগ্র রাজপ্রাসাদ শোকে অভিভূত।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মৃত্যু হয়েছে রাজা দুর্জন সিংহের, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছে কুমার রঘুনাথ।

অতিথির আগমন সংবাদ পেয়ে রঘুনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এলো। সসম্মানে রাজপ্রাসাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানালে হেমন্ত সিংহকে।

রঘুনাথের ব্যবহারে মুগ্ধ হলো হেমন্ত সিংহ, আর বিস্মিত হলো জ্যোতিষাচার্যের কথায়।

চিতোয়া-বরদার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জ্যোতিষাচার্য বললেন, রাজনগরে পৌঁছতে আমার কিছু বিলম্ব হবে হেমন্ত। এই দুঃসময়ে আমি রঘুনাথকে ছেড়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া…

বিস্ময়ের চোখ তুলে জ্যোতিষাচার্যের মুখের দিকে তাকালো হেমন্ত সিংহ।

জ্যোতিষাচার্য মৃদু হেসে বললেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সংবাদ না এসে পৌঁছলে আমি বিষ্ণুপুর ত্যাগ করতে পারি না হেমন্ত।

—কি সংবাদের অপেক্ষায় আছেন গুরুদেব? বিস্ময়ের কণ্ঠে হেমন্ত সিংহ প্রশ্ন করলে!

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন। উত্তর দিলেন না এ প্রশ্নের। গোপনতা

রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম। কি করে এ দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করবেন তিনি হেমন্ত সিংহের কাছে।

দুর্জন সিংহের মৃত্যুর খবর পাঠানো হয়েছে মোগল সম্রাটের দরবারে। হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীর হয়তো এই সুযোগে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইবেন। হয়তো এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে চাইবেন।

জ্যোতিষাচার্যকে চিন্তিত দেখে হেমন্ত সিংহ বললে, দুশ্চিন্তা কিসের গুরুদেব?

প্রকৃত দুশ্চিন্তা গোপন করে জ্যোতিষাচার্য মৃদু হেসে বললেন, রঘুনাথ আমার পুত্রতুল্য, চিন্তা তার জন্যই হেমন্ত। দুর্জন সিংহের ইচ্ছা ছিলো বর্ধমানরাজের কন্যার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ দেবেন, কিন্তু...

কিন্তু? উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালো হেমন্ত সিংহ।

জ্যোতিষাচার্য ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর কোষ্ঠীবিচার করে এ বিবাহ-প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারিনি।

হেমন্ত সিংহ সহাস্যে বললে, তা হলে আমার একটি অনুরোধ আছে গুরুদেব। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী চন্দ্রপ্রভা রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া, চিতোয়া-বরদার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ দিন গুরুদেব।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকবে হেমন্ত, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার কোষ্ঠীবিচার না করে...

মনের বিরক্তি চাপা রাখলেন জ্যোতিষাচার্য। সামান্য এক ভূস্বামীর কন্যার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের যুবরাজের বিবাহ? যোটকবিচার শুভ হলেও এ বিবাহে তিনি রাজী হতে পারবেন না।

কিন্তু হেমন্ত সিংহ বুঝলো না জ্যোতিষাচার্যের গোপন মনের ইচ্ছা। কটিবন্ধ থেকে কৃপাণ বের করে মাটির ওপর চন্দ্রপ্রভার জন্মকুণ্ডলী

এঁকে দিলো হেমন্ত সিংহ। বললে, গণনা করে দেখুন গুরুদেব। এ বিবাহ শুধু বিষ্ণুপুরের মঙ্গলই নয়, হিন্দুধর্মের মঙ্গলও আনবে।

জ্যোতিষাচার্য গণনা শুরু করলেন। রাশি লগ্নের মিথ্যা সূত্র উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, না হেমন্ত, এ বিবাহ হতে পারে না, তোমার অনুরোধ অন্যায় অনুরোধ।

—কেন গুরুদেব ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে হেমন্ত সিংহ! আর জ্যোতিষাচার্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কৃষ্ণরামের কন্যার কোষ্ঠীবিচার করে এ বিবাহে বাধা দিয়েছি আমি, কিন্তু চন্দ্রপ্রভার অদৃষ্ট আরো সাংঘাতিক, আরো দুঃখময়। চন্দ্রপ্রভা অবিশ্বাসিনী হবে।

—অবিশ্বাসিনী! ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো হেমন্ত সিংহ। তারপর হঠাৎ অট্টহাসে হেসে উঠলো জ্যোতিষাচার্যের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মাটির ওপর নিজেরই কৃপাণে আঁকা জন্মকুণ্ডলীর ওপর পদাঘাত করে বললে, রাজনগরের রাজকন্যার নামে এ অপবাদ দেয় যে-জ্যোতিষশাস্ত্র সে-শাস্ত্রে পদাঘাত করি আমি। জ্যোতিষাচার্য! আপনার শাস্ত্রে বিশ্বাস করে আপনাকে আহ্বান জানাতে আসিনি। বিদ্রোহের আগে সমগ্র বাংলার প্রজাদের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্যে, বিদ্রোহ সফল হবে এই বিশ্বাস আনবার জন্যে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন। 'মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য', এই কথাটুকু জ্যোতিষীদের সাহায্যে দেশে দেশে প্রচার করবার জন্যেই আহ্বান জানিয়েছিলাম।

রাগে অপমানে আবার জন্মকুণ্ডলীর ওপর পদাঘাত করতে যাচ্ছিলো হেমন্ত সিংহ। এমন সময় হঠাৎ প্রাসাদে শঙ্খধ্বনি হলো।

শত শত শঙ্খ যেন একসঙ্গে বেজে উঠলো সেই মুহূর্তে। বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো হেমন্ত সিংহ।

ফিরে তাকিয়েই শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ঠিক তার পিছনেই একটি মোগল বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে তার আস্ফা লন দেখে।

নিজের মনেই হাসলেন জ্যোতিষাচার্য, হেমন্ত সিংহের দম্ভ দেখে। মিথ্যার আশ্রয় নিলেন তিনি, তবু অনুশোচনা হলো না। শাস্ত্রই তাঁর একমাত্র আরাধ্য নয়, তিনি রাজনীতিক। বিষ্ণুপুরের মঙ্গল অমঙ্গল তাঁর ওপর নির্ভর করে।

জ্যোতিষাচার্য ধীরে ধীরে রাজদরবারের দিকে চলে গেলেন। বুঝতে পারলেন, দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে দূত এসে পৌঁছেছে।

হেমন্ত সিংহ লক্ষ্য করলো না, মোগল বরকন্দাজ হঠাৎ কখন অদৃশ্য হলো। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে শোভা সিংহের বিদ্রোহের খবর পাঠাবার জন্যেই কি ছুটে গেলো সে? কে জানে!

এদিকে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সঙ্গে মোগলশক্তির সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্ব স্মরণ করে শুভাকাঙ্ক্ষা জানালেন আওরঙ্গজেব।

রঘুনাথের অভিষেকে সমগ্র পূর্ব ভারতের ভূস্বামী আর নবাবদের কাছ থেকে বহুমূল্য মণিরত্ন, দুর্মূল্য উপঢৌকন এসে জমা হলো বিষ্ণুপুর প্রাসাদে।

আর রাজমাতা, দুর্জন সিংহের বিধবা পত্নী, আশীর্বাদ করলেন রঘুনাথকে। আপন কনিষ্ঠ সন্তান গোপাল সিংহকে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আজ থেকে আমার ছুটি রঘুনাথ। আজ থেকে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের সব শুভাশুভের ভার তোমার হাতেই দিলাম।

ভ্রাতৃস্নেহে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরলো রঘুনাথ, সস্মিত হাসিতে।

কিন্তু সিংহাসনের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করলো না রঘুনাথ। মুখ্য অমাত্যের ওপর সব রাজ্যভার তুলে দিয়ে সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করতে পারলেই যেন চরম শান্তি।

অভিষেক-উৎসবের শেষে রাজবেশ ত্যাগ করে যমুনাবাঁধের ধারে চিত্তবিশ্রামে এসে উপস্থিত হলো রঘুনাথ।

সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে যমুনাবাঁধের জলে।

সুদৃশ্য চিত্তবিশ্রামের সঙ্গীতকক্ষে নরম কাশ্মীরী গালিচায় শরীর এলিয়ে দিয়ে রঘুনাথ রাগমূর্ছনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর কণ্ঠে সুরের লহরী খেলা করে। কখনও পীর বক্সের হাতে মৃদঙ্গের বোল ফোটে। সঙ্গীতজ্ঞ গদাধর চক্রবর্তীও রঘুনাথের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যান। সঙ্গীত-সাধক কিশোর কৃষ্ণমোহন তন্ময় হয়ে শোনে।

তারপর একসময় রঘুনাথ বলে, এই অর্থব্যয় শুধু আনন্দের জন্যে নয় চক্রবর্তী, বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীতের রাজ্য করে তুলতে হবে। যা শুধু মোগল দরবারের সম্পদ ছিলো, তা যেন সমগ্র বাংলার সম্পদ হয়ে ওঠে।

গদাধরের মনেও তো এই একই স্বপ্ন। হিন্দু-ভারত কেবল স্বাধীনতাই হারায়নি, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সব কলাজ্ঞান, সব ঐতিহ্যও যেন বন্দী হয়েছিলো দিল্লীর বাদশাহের কারাগারে। সঙ্গীত আর শিল্পচর্চাকে হত্যা করতে চেয়েছেন আওরঙ্গজেব, কিন্তু তার পরিবর্তে শিল্প আর কলা বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

রঘুনাথ যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। রাজ্যের সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানায় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে। সুকণ্ঠ গায়কের সন্ধান পেলেই আহ্বান জানায়।

বলে, ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং নহি।

সঙ্গীতের পরে আর কোনো বিদ্যা নেই, গানের পরে আর কিছু নেই।

বাহাদুর খাঁকে বলে, চক্রবর্তী আপনার প্রধান সাকরেদ ওস্তাদজী। আপনার সমস্ত জ্ঞান ওকে অর্পণ করে দিন এমনভাবে, যেন যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত।

বাহাদুর খাঁ সে-কথা শুনে মিঠি মিঠি খুশীর হাসি হাসে।

ওস্তাদের আঙুলে খেলা করে তানের ঝলক। হোরি-দাদরার রংদার সুরের গমকে ভরে যায় যমুনাবাঁধের বাতাস।

উচ্চনীচ ভেদ নেই, রাজাপ্রজায় ভেদ নেই। এই সঙ্গীতকক্ষে যেন সকলেই সমান। সকলেই সঙ্গীত-সরস্বতীর সাধক। ধর্মে ধর্মে ভেদ নেই। যে সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতই তার ধর্ম।

দাসদাসীরা আতর ছিটিয়ে দেয়, এলাচ আর কস্তুরীর সুগন্ধ-মাখানো পান বিতরণ করে। সোনার রেকাবিতে সোনালী তবকে মোড়া পান আর সিদ্ধির শরবত।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর মাথায় গোলাপী পেঁচদার পাগড়িতে জরি আর সল্‌মা চমক দেয়। তরন্দাম্ মসলিনের ঢিলা পাঞ্জাবি আর যোধপুরী পায়জামা। কানে হীরের কুণ্ডল ঝকমক করে ওঠে প্রতিটি তালের সঙ্গে। ওস্তাদ নয়, যেন পাঁচ-হাজারী এক মনসবদার।

গুনগুন করে তোম তায়নোম শুরু করে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। পরজ বসন্ত, জলদ একতারা। পুরিয়া রাগ—ঢিমাঠেকার সঙ্গে। সম এসে পড়ে খাদের কড়ির মাধ্যমে, বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন খাদের গান্ধার থেকে মুদারার কোমল রেখব পর্যন্ত।

কখনও দরবারী কানাড়ার ধৈবত গান্ধারের মূর্ছনা। পঞ্চম রেখবের মাধুর্য। ফিরৎ আর মুর্‌কির রোমাঞ্চ।

কোনোদিন হয়তো বা সঙ্গীতকক্ষ ছেড়ে নৌকাবিহারে বের হয় রঘুনাথ। সঙ্গে কিশোর কৃষ্ণমোহন, প্রৌঢ় গদাধর আর পীর বক্স।

পীর বক্সের লক্ষ্ণৌ টুপিতে চুনি আর পোখরাজ ঝলমল করে। চোখে সুর্মা, চিবুকে আতর।

নদীর বুক মৃদঙ্গের সুরে ভরে ওঠে।

সেদিনও এমনি নৌকাবিহারেই বেরিয়েছিলো রঘুনাথ। বিড়াই নদীর জলে নৌকাবিহার করে ফিরে এলো। এসে দেখলো ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুদৃশ্য রাজহংস।

ঘাটের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলে, কোনো অতিথি এসেছেন বিষ্ণুপুরে?

প্রহরী উত্তর দিলে, হ্যাঁ মহারাজ। এক সুকণ্ঠী নর্তকী এসেছেন এই রাজহংসে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

—কি নাম নর্তকীর? উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো রঘুনাথ।

উত্তর এলো, কোনো পরিচয় দেয়নি মহারাজ। শুধু নাম জেনেছি তাঁর।

—কি নাম?

—হীরাবাঈ।

—হীরাবাঈ?

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং নহি।

কিন্তু নৃত্য? নৃত্যও তো উচ্চমার্গের কলা।

রঘুনাথ বললে, না কৃষ্ণমোহন, ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরের পক্ষে দ্বিমুখী সাধনা সম্ভব নয়। হীরাবাঈ অতিথি হয়ে এসেছে, আপ্যায়নের ত্রুটি হবে না, কিন্তু নারী নরকের দ্বারী কৃষ্ণমোহন। হীরাবাঈকে স্থায়ী আশ্রয় দিলে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে।

পীর বক্স হেসে উঠলো সশব্দে। বললে, একজন বাঈসাহেবাকে এতো ভয় মহারাজ! সঙ্গীতজ্ঞের কোনো ধর্ম নেই, হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই আপনার মতে, তবে পুরুষ আর নারীর পার্থক্যই বা কেন সৃষ্টি করছেন মহারাজ?

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁও সায় দিলো। বললে, হীরাবাঈ হিন্দুস্থানের সেরা বাঈ, গানের সুরে চৈতী গাছে ফুল ফোটাতে পারে হীরাবাঈ। বাঈ নয়, বুলবুল সে। আর এখানে স্থায়ী আশ্রয় পাবার জন্যেও আসেনি সে। দু'দিনের ফুর্তি আর মৌজ নষ্ট করবেন না মহারাজ।

রঘুনাথ হেসে বললে, আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাই না ওস্তাদজী। হীরাবাঈ বিষ্ণুপুরের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে না।

চিত্তবিশ্রামে হীরাবাঈকে আমন্ত্রণ জানায় রঘুনাথ।

হীরাবাঈ নয়, সত্যিই যেন একটি বুলবুলের কণ্ঠ তার সুরের ঝলকে।

গান শুনে মাথা দোলায় পীর বক্স। বলে, বেশক বুলবুল।

শুনে হাসে হীরাবাঈ। সুর্মা-টানা চোখের কটাক্ষ হানে পীর

বক্ষের দিকে; তারপর রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, বুলবুল আমি নই মহারাজবাহাদুর। বুলবুল লালবাঈ।

—লালবাঈ! বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে রঘুনাথ।—কে লালবাঈ?

—হিন্দুস্থানের সেরা বুলবুল। ভগবান তাকে যেমন রূপযৌবন দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন কণ্ঠের সুর। এতো কম বয়সে এমনভাবে কেউ সুরকে আয়ত্ত করতে পারেনি মহারাজবাহাদুর।

রঘুনাথ বললে, ঠিকানা দাও তার। রূপযৌবনের মূল্য নেই বুলবুল। কিন্তু সুরকে যে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। তাকে বিষ্ণুপুরে আনতে হবে।

হীরাবাঈ হেসে বললে, এই বুলবুলকে নিয়েই খুশ থাকতে হবে মহারাজ, লাল কোয়েলকে আনা যাবে না এখানে।

—আনা যাবে না? কতো মোহর তার ভেট যে, বিষ্ণুপুরের রাজকোষ তা দিতে পারবে না?

হীরাবাঈ সহাস্যে বললে, পাঠান রহিম খাঁর আশ্রয়ে আছে সে মহারাজবাহাদুর, বিনা যুদ্ধে লালবাঈকে ছেড়ে দেবে না রহিম খাঁ।

রঘুনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, না বুলবুল, লালবাঈয়ের গান যতো লোভনীয়ই হোক তার জন্যে যুদ্ধ করতে রাজী নই আমি।

রঘুনাথের চোখে একটি তির্যক কটাক্ষ হেনে হীরাবাঈ মোহময় হাসি হাসলে। বললে, এ কি কথা শুনলাম মহারাজবাহাদুর! যে-হাতে সেতারের মিজরাব দুনিয়া ভোলানোর সুর তোলে সেই হাতেই তরোয়াল চমক দেয়, এই তাজ্জব খবর শুনেই ছুটে এসেছি এখানে।

প্রশংসা শুনে মাথা নুইয়ে লজ্জা প্রকাশ করলো রঘুনাথ।

বাহাদুর খাঁ হেসে সায় দিলো হীরাবাঈয়ের কথায়।

বললে, বেশক, বেশক। শুধু সিতার নয় বুলবুল, রাজাবাহাদুরের গলার কাজ তো শোনোনি; হাতেই নয়, গলার সুরেও ওস্তাদ তীরন্দাজ।

মৃদু হাসলে হীরাবাঈ।—সেরা তীরন্দাজের কাছে আমার নরম

দিল জখম করার লোভেই তো এসেছি ওস্তাদজী। বলে অপাঙ্গের মধুর হাসি ছিটিয়ে দিলো রঘুনাথের মুখে।

পুনরায় নতশিরে 'সাবাস' লুটে নিলো রঘুনাথ।

বললে, গান আমার পিয়ারী, ওস্তাদজী। তাই তরোয়ালকে বিদায় দিয়ে তানপুরা তুলে নিয়েছি।

হীরাবাঈ কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, সে কী মহারাজবাহাদুর! না, না, তরোয়াল ছেড়ে দিলে আমাদের ভরোসা দেবে কে?

—কেউ কাউকে আশ্রয় দেয় না বুলবুল। ধীর স্বরে উত্তর দিলে রঘুনাথ।—মানুষের ধর্ম সত্য পালন করা, কর্তব্য পালন করা।

—রাজার ধর্ম দৌলত বাড়ানো মহারাজবাহাদুর। রাজার ধর্ম যুদ্ধ। হীরাবাঈ বললে।

রঘুনাথ উত্তর দিলে, না হীরাবাঈ, আমার কর্তব্য হলো রাজ্যরক্ষা, ধর্ম গান। দৌলতের লোভ নেই আমার। যুদ্ধ চাই না আমি।

এই কথাটাই শোনবার জন্যে বুঝি এসেছিলো হীরাবাঈ, আশ্রয় পাবার জন্যে নয়। উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখে বললে, আপনার মতো সমঝদারের বাহবা না পেলে লালবাঈয়ের সব শিক্ষাই বরবাদ হয়ে যাবে। আমি তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো মহারাজ।

আবার উড়িষ্যায় ফিরে গেলো সে, রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে।

গিয়ে রহিম খাঁকে বললে, আমার ইনাম দিন শেখজী।

—কি খবর? রহিম খাঁ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

হীরাবাঈ হেসে বললে, বিষ্ণুপুরকে কোনো ভয় নেই শেখজী, যুদ্ধ চায় না রঘুনাথ, শান্তি চায়। বিষ্ণুপুর আক্রমণ না করলে অস্ত্রধারণ করবে না রঘুনাথ, বিদ্রোহে বাধা দেবে না। রঘুনাথ এখন সঙ্গীতে মত্ত।

রহিম খাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

গম্ভীর গলায় হঠাৎ হাঁক দিলো রহিম খাঁ।—সুলেমান!

কালো হাবশী দৈত্যটা সেলাম করে এসে দাঁড়ালো।

কুর্নিশ করে বললে, ফরমাইয়ে জাহাঁপনা।

হাসলো রহিম খাঁ। বললে, বিষ্ণুপুরের খবর পাওয়া গেছে সুলেমান, এবার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর ফৌজের খবর আনতে হবে তোমাকে।

আবার কুর্নিশ করে হাত পাতলো সুলেমান।

রহিম খাঁ বললে, যা ইনাম পেলে খুশী হও তুমি, তাই দেবো। কি চাও তুমি ?

সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো হাবশীটা, তারপর ইশারায় ঘরের এক কোণের দিকে দেখালে।

রহিম খাঁ বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো। দেখলে, অন্যদিকে মুখ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু আঁকছে লালবাঈ।

তবু বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে সুলেমানের মুখের দিকে তাকালো রহিম খাঁ।

হাবশীটা আবার সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো।

বললে, লালবাঈকে ইনাম দেবেন জাহাঁপনা, আপনার হুকুম মতো খবর আনতে পারলে।

ক্রোধ চাপা দিলো রহিম খাঁ। বললে, বেশ তাই হবে।

তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখলে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফণা তুলে তাকিয়ে আছে লালবাঈ। ত্ব' চোখে তার বিষাক্ত আক্রোশ ঝরে পড়ছে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লালবাঈ।

সুলেমান বিদায় নিতেই হাসতে হাসতে লালবাঈয়ের দিকে এগিয়ে এলো রহিম খাঁ। বললে, ভয় নেই, আমি যাকে বেগম করবার স্বপ্ন দেখছি তার দিকে যে লোভের হাত বাড়ায় তার ইনাম—

খাপ থেকে তরোয়ালটা বের করে আবার সশব্দে সেটা খাপে ভরে রহিম খাঁ বুঝিয়ে দিলো কথাটা। অর্থাৎ গর্দান দিতে হবে সুলেমানকে, এই লোভের জন্যে।

বিদ্যুতের মতো এক ঝিলিক মৃদু হাসি চমকে গেলো লালবাঈয়ের মুখে। বললে, আলবত্‌!

ঘৃণার পাত্র বুঝি ক্রমশ প্রেমের পাত্রে পরিণত হয়। যে রহিম খাঁকে শুধুই অর্থের প্রতিদান দিয়েছে মনের গোপনে ঘৃণা পুষে রেখে, ঐশ্বর্যের লোভে একদিন তাকেই ভালোবেসেছে লালী।

তার রক্তেও উন্মাদনা জেগে উঠেছে। স্বপ্ন দেখেছে সে রহিম খাঁর বেগম হবার। স্বপ্ন দেখেছে সারা ভারতের বাদশাহ হবে রহিম খাঁ, আর তার বেগমের আসনে নিজেকে বসিয়ে কল্পনার কুর্নিশ কুড়িয়েছে সে বান্দা আর বাঁদীদের। বিবিবাজারের ফকির সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় আনবে লালী, রাজ্যপরিচালনা করবে একদিন। তার জন্য যে-মূল্যই দিতে হোক রাজী আছে লালী।

তার যৌবনের প্রথম প্রেমকে যে অঙ্কুরে বিনাশ করেছে সেই হীরাবাঈয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেবে সেদিন। ধর্মের অহঙ্কারে যে অযোধ্যাপ্রসাদ তার অযাচিত প্রেম ফিরিয়ে দিয়েছে. সেই অযোধ্যাপ্রসাদকে বেতনভোগী করে রাখতে পারবে সেদিন।

কোমল শয্যায় দেহ এলিয়ে রহিম খাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে লালী, হিন্দুস্থানের বাদশা তুমি কবে হবে মেহের! কতোদিন পরে?

বিব্রত হাসি হেসে লালীকে কাছে টেনে নেয় রহিম খাঁ। বলে, দেরি নেই লাল, দেরি নেই।

—বাদশা হয়ে আমাকে বেকসুর ভুলে যাবে না তো সেদিন? কৌতুকের কটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করে লালী।

রহিম খাঁ হাসে। বলে, তোমার এ সুরত যে একবার দেখেছে সে কি ভুলতে পারে তোমাকে? চাঁদ তোমাকে দেখে

লজ্জা পায় লাল, বাগিচার গুলাব রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পাপড়ি খোলে।

খুশীতে ভরে ওঠে লালীর মুখ। আনন্দে চোখ বুজে যায় তার। চোখ বুজে স্বপ্ন দেখে।

রহিম খাঁ বলে, যেদিন বাদশা হবো এই হিন্দুস্থানের, সেদিন কি পেলে খুশী হবে লাল?

কি পেলে খুশী হবে লালী? বাদশাহের বেগম তো যা চাইবে তাই পাবে হাতের মুঠোয়, কোন্ প্রার্থনা তার অপূর্ণ থাকবে সেদিন!

তবু হঠাৎ কখনো-কখনো ভয় পায় লালী। মনে পড়ে বাঁদীবাজারের সেই ফকির সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী।—চিরকাল তোমাকে অনূঢ়া থাকতে হবে কন্যা!

লালী ধীরে ধীরে বলে, বেগমের ইজ্জত চাই মেহের, আর কিছু নয়।

—আর কিছু নয়? শুধু বেগম হতে চাও?

—হ্যাঁ। বেগমের ইজ্জত চাই পিয়ার। আর···

—আর?

—আর তোমার মোহব্বত চাই মেহের! অস্ফুটে উচ্চারণ করে লালী।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে যায় একটি সুদর্শন মুখ। সেদিন বেগম হবার বাসনা জাগেনি লালীর, শুধু প্রণয়স্পর্শেই হয়তো সুখী হতো।

বিবিবাজারের সেই সুদর্শন অশ্বারোহীকে দেখে জীবনে প্রথম রোমাঞ্চ জেগেছিলো তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে সেই দৃশ্যটাই বার বার ভেসে ওঠে মনের পটে। সুখস্বপ্নে নাড়াচাড়া করে একটুকরো বিধর্মী নাম।

কিন্তু রঘুনাথের মন থেকে মুছে গেছে যবনীর রূপের মোহ। পরিবর্তে স্নিগ্ধ চন্দনের সুগন্ধে ভরে আছে তার মন।

তার যৌবন-মনের সব স্থানটুকু জুড়ে আছে উপযাচিকা এক রূপময়ী ভৌমিক-কন্যা। চন্দ্রপ্রভা!

উদাস-বিষণ্ণ বিকেলে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে বিড়াই নদীতে

নৌকাবিহারে কোনো কোনো দিন বেরিয়ে পড়ে রঘুনাথ। কামনার ধনকে কাছে পাবার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

গদাধর কৌতুকে হাসে, বলে, এ-ভাবে হৃদয়ের জ্বালা লুকিয়ে রেখে কি লাভ বন্ধু।

রঘুনাথও হাসে। বলে, সেইজন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছি চক্রবর্তী। তোমার গানের মন্ত্রে আমার জ্বালা দূর করে দাও।

—বিরহের জ্বালা কি গানের সুরে দূর করা যায়, তার চেয়ে রানীমাকে বলে বরং বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারি।

রঘুনাথ হেসে বলে, না চক্রবর্তী, তা সম্ভব নয়। গুরুদেব চন্দ্রপ্রভার কোষ্ঠীবিচার করে এ-বিবাহে অসম্মতি জানিয়েছেন। বিষ্ণুপুর সব শক্তিকে তাচ্ছিল্য দেখাবার সাহস রাখে, কিন্তু দৈবকে অবিশ্বাস করতে পারে না।

গদাধর উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে, আপনিও কি দৈবে বিশ্বাস রাখেন?

রঘুনাথ হাসে। বলে, না চক্রবর্তী, সত্য আমার কাছে আরো বড়ো। চন্দ্রপ্রভার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

গদাধর কৌতুকের কণ্ঠে বলে, শুধু সত্যাশ্রয়ের জন্যে? আর কিছু নয়?

রঘুনাথ গদাধরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, মনের ভাবকে গানে প্রকাশ করো তুমি, তাই বোধহয় মনের গোপন ব্যথাও তুমি দেখতে পাও। না চক্রবর্তী, সত্যের চেয়েও প্রেম মহান। চন্দ্রপ্রভা আমার সব সুখ হরণ করে নিয়েছে, চন্দ্রপ্রভাই আমার একমাত্র সুখ!

গদাধর তানপুরা তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু হাসে, তারপর ধীর স্বরে গান গাইতে শুরু করে। একসময় হঠাৎ গান থামিয়ে বলে, যে আপনার সব সুখ হরণ করেছে তাকেই হরণ করে আনতে হবে বন্ধু।

রঘুনাথ সহাস্যে বলে, না গদাধর, তা হয় না। দস্যুর রক্ত আমার শিরায়, বীর হাম্বীরের যে অভিশাপ লুকিয়ে আছে বিষ্ণুপুর

রাজপ্রাসাদে, সুযোগ পেলে তা আবার পাপের পথ খুঁজবে। দস্যুতাকে আমি ভয় পাই, গদাধর।

—কিন্তু উপযাচিকাকে হরণ করা দস্যুতা নয় বন্ধু, পৌরুষ!

—না চক্রবর্তী, হরণ করে আনতে চাই না আমি চন্দ্রপ্রভাকে। আপন গৌরবেই সে বিষ্ণুপুর সিংহাসনে পাটরানীর মর্যাদা পাবে। তবু অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয় গোপনে আবার ছুটে যাই তার কাছে।

হতাশ-বিষণ্ণ মনে নৌকাবিহার থেকে ফিরে আসে রঘুনাথ, মন থেকে দূর করতে পারে না চন্দ্রপ্রভাকে।

গোপনে চিতোয়া-বরদা যাত্রা করার ইচ্ছায় চর নিয়োগ করে শোভা সিংহের খবর আনার জন্যে।

চর ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে।

বিদ্রোহের জন্যে তৈরী হচ্ছে শোভা সিংহ। সুবিস্তৃত দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সহস্র পদাতিক আর অশ্বারোহীতে পূর্ণ চিতোয়া-বরদার অরণ্যদুর্গ।

খবর শুনে বিচলিত বোধ করে রঘুনাথ।

দেওয়ানজীকে বলে, বিষ্ণুপুরের সৈন্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে দেওয়ানজী; শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে পারে।

ঢোল-শোহরত খবর পৌঁছে দেয় দিকে দিকে। সৈন্য-সংখ্যা বেড়ে চলে দিনে দিনে।

যুদ্ধ চায় না রঘুনাথ, শান্তি চায়। কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি রাখতে হবে। শক্তি রাখতে হবে সত্য পালনের।

অকস্মাৎ মনে পড়ে রঘুনাথের, বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষ্ণরাম সাহায্য প্রার্থনা করলে ছুটে যেতে হবে। বিদ্রোহ দমন করতে হবে। হয়তো চন্দ্রপ্রভার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে। প্রেমের চেয়ে সত্য বড়ো, সত্যাশ্রয় মানুষের ধর্ম।

পনেরো

শুধু শোভা সিংহই নয়, রাঢ়ভূমির অধিবাসীরা, সমগ্র বাংলার নির্যাতিত প্রজারাও তখন বিদ্রোহের জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণরামের অধীনস্থ ভূস্বামীরাও গোপনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাঠায়। ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজার কাছ থেকেও আসে বন্ধুত্বের উপহার।

সমগ্র বাংলা তখন আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এদিকে বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ অকর্মণ্য। রুচিহীন কাব্যপাঠ আর বিলাসব্যসনে আসক্ত ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নুরুল্লা খাঁর হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে অন্দর-মহলের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু আরেকটা অদৃশ্য শক্তির খবর জানতো না শোভা সিংহ। লোক-চক্ষুর আড়ালে ধীরে ধীরে যে-শক্তি সঞ্চিত হচ্ছিলো হুগলীর বন্দরে, তার দিকে চোখ ছিলো না কারও।

সাজাহান তখন ভারতসম্রাট।

মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতায় গোপন-সন্তর্পণে বুঝি নিজের কক্ষে ফিরে আসছিলো সাজাহান-কন্যা জাহানারা। অকস্মাৎ তার রেশমবস্ত্রের অঙ্গাবরণ জ্বলে উঠলো অলিন্দের দীপশিখার স্পর্শে। নিঃশব্দে দ্রুত ছুটতে ছুটতে নিজের কক্ষে চলে এলো জাহানারা, চিৎকার করে বাঁদীদের ডাকতে সাহস হলো না। সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়ে গেলো জাহানারার।

এ-খবর অন্দর-মহলের বাইরেও এসে পৌঁছতে সময় লাগলো না।

রাষ্ট্র হলো, সাজাহানের অগ্নিদগ্ধ কন্যাকে সারিয়ে তুললে পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে।

গেব্রিয়েল বাউটনের কানে গেলো সে-খবর। ইংরেজ চিকিৎসক বাউটন রাজধানীতে অপেক্ষা করছিলো সাজাহানের দর্শন পাবার জন্যে। তার বণিকমন বুঝতে পারলো এই সুযোগ। সাজাহানের দরবারে গিয়ে তস্‌লিম করে দাঁড়ালো বাউটন। বললে, শাহজাদীকে সারিয়ে তুলবো আমি।

সত্যিই আরোগ্যলাভ করলো জাহানারা। আর খুশী হয়ে সাজাহান জিজ্ঞেস করলেন, কি পুরস্কার চাও, বলো ইংরেজবন্ধু। আমার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্নের জীবনদান করেছো তুমি, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবো না।

গেব্রিয়েল বাউটন টুপি খুলে কুর্নিশ করলো সাজাহানকে। বললে, শাহ আলম, বাংলাদেশে আমরা বাণিজ্য করতে চাই, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অনুমতি পেলেই কৃতার্থ হবো।

শুধু স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি? মণি-মুক্তা হীরে-জহরত নয়? রাজ্যের কোনো রূপসী নারী নয়? কোনো বিস্তৃত ভূখণ্ডের স্বামিত্ব নয়? শুধু স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি?

খুশী হয়ে অনুমতি দিয়ে দিলেন সাজাহান। বুঝতে পারলেন না, এই তুচ্ছ অনুমতি ইতিহাসের পট পরিবর্তন করতে পারে।

বাংলার মসনদে তখন শাহসুজা।

সাজাহানের অনুমতি নিয়ে বাংলায় এসে সুজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হলো বাউটনের। চিকিৎসক বাউটনের কৃতিত্বের কথা শুনে মুগ্ধ হলো সুজা। বললে, আমার অন্তঃপুরেও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে আমার এক প্রিয় বেগম।

বাউটন তাকেও সরিয়ে তুললো অতি অল্প দিনের মধ্যে।

মুগ্ধ হলো সুজা। বললে, দিল্লীশ্বর তোমাকে বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন, আমার কাছে পাবে যাবতীয় সাহায্য। ইংরেজ বণিকের সমৃদ্ধি মানেই বাংলার সমৃদ্ধি।

হুগলীর বন্দরে আর বালেশ্বরে দু'টি কুঠি স্থাপিত হলো ইংরেজ বণিকদের। তারপর বছরের পর বছর বাণিজ্যের নামে পর্তুগীজ ও দেশীয় ঠগ এবং দস্যুদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করার নামে ক্রমে ক্রমে দুর্গ গড়ে তুললো ইংরেজ কুঠিয়ালরা, পণ্যের আড়ালে এনে জড়ো করলো কামান, বন্দুক, আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্র।

কুঠি নয়, দুর্গ।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে কতো পরিবর্তন ঘটে গেলো, ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো! কিন্তু কেউই খবর রাখলো না অরণ্য-সঙ্কুল ভাগীরথী তীরে হুগলীর কুঠিতে কি পরিবর্তন ঘটে চলছে।

সাজাহান বন্দী হলেন পুত্র আওরঙ্গজেবের কাছে। বাংলার মসনদ থেকে অপসৃত হলো শাহসুজা, গ্লানির মৃত্যু বরণ করতে হলো তাকে। এলো শায়েস্তা খাঁ, সেও চলে গেলো হার্মাদদের বিতাড়ন করে। বাংলার মসনদে এলো অলস আর ভীরু-স্বভাব ইব্রাহিম খাঁ।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা বুঝলো, বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের একমাত্র পথ ইব্রাহিমের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে পরিতৃপ্ত করা।

বাণিজ্যের লোভ দেখালো তারা নুরুল্লা খাঁকে।

যুদ্ধই যার ধর্ম, অপরিমিত ঐশ্বর্যের লোভ দেখতে পেলো সে। তরবারির বদলে বণিকের মানদণ্ড তুলে নিলো নুরুল্লা খাঁ, গোপনে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুললো।

এ সংবাদ কিন্তু অজ্ঞাত রইলো না নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে, আলমগীর আওরঙ্গজেবের কাছে।

ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ তখন মসলিনের ব্যবসায় মগ্ন। কাপাশিয়া, সোনার গাঁ, তিতবর্দি অঞ্চলে সেই কারণেই ঘুরে বেড়াতো নুরুল্লা খাঁ। কুঠিয়ালদের চাহিদা মতো দাদন দিয়ে তৈরি করাতো বিশেষ বিশেষ ধরনের মসলিন। কখনও হুগলীর বন্দর থেকে, কখনও দক্ষিণের মসলিপত্তন থেকে বিদেশে রপ্তানি হতো সে-বস্ত্রসম্ভার।

রহিম খাঁর হাবশী চর সুলেমান জানতো না এ-খবর। সুবাদারের অন্দর-মহলে প্রবেশ করার উপায় ঠিক করে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা আর মেঘনার সঙ্গমস্থলে বিস্তৃত মসলিন-তুনিয়ায় এসে হাজির হলো সে।

সরাইখানা থেকে সরাইখানায় ঘুরে বেড়ালো। তাদের বয়ন-কৌশল দেখে বিস্মিত হলো। দাসব্যবসায়ীর নফর ছিলো সে, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঠান রহিম খাঁর চর নিযুক্ত হয়েছিলো। দূর থেকে লালবাঈয়ের অঙ্গে এই সূক্ষ্ম মসলিনের শোভা দেখেছে সে। কিন্তু এ কল্পরাজ্যে এসে বিব্রত হয়ে পড়লো সুলেমান।

রহিম খাঁর নির্দেশ মনে পড়লো। কোনো বারাঙ্গনাকে অর্থের বিনিময়ে করায়ত্ত করে মসলিন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাকে পাঠাতে হবে ইব্রাহিম খাঁর অন্তঃপুরে। দিনে দিনে বেগম-মহল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে সেই রূপজীবিনীর সাহায্যে। আর এই মসলিন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে সুলেমানকে যেতে হবে ফৌজ ও রিসালহা সৈন্যদের বসতিতে।

ক্রমে ক্রমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সুলেমান। মসলিন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে তাকে। তা না হলে হয়তো মনসবদারদের কাছে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাবে! আর এ অভিনয় প্রকাশ হয়ে পড়ার অর্থ—মৃত্যু।

কিন্তু তখনই মনের গোপনে প্রলুব্ধি জেগে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে লালবাঈয়ের যৌবনরূপ। অতৃপ্ত কামনার শিখা জ্বলে ওঠে তার ধমনীতে।

লালবাঈকে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে হাবশী সুলেমান।

মৃত্যুকে তুচ্ছ করে নির্দিষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। মনিবের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে। রহিম খাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে লালবাঈকে উপহার পাবে।

লালবাঈয়ের রূপযৌবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সোনারগাঁও আরঙের মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিলো সুলেমান।

ভারতের নানা বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে বণিকের দল এসে জমায়েত হতো এই মুসাফিরখানায়। আওরঙ্গজেবের নিষেধ অমান্য করে মদ আর শরীরের বিপণি খোলা হতো রাত্রির গোপনতায়! জুয়া আর শতরঞ্জের নেশায় মশগুল হয়ে যেতো সমস্ত সরাইখানা। হাজার হাজার তাঁতের ঐকতান চাপা পড়ে যেতো বিলাসব্যসনের হট্টগোলে।

আর দিনের আলোকে আনাগোনা হতো আরঙদার মহাজনদের। ডেমড়া, বালিয়াপাড়া, মৈকুলি, নবীগঞ্জ, শাহপুর থেকে আসতো তাঁতীরা। সরাসরি নিজেদের হাতের তৈরী মসলিন বিক্রি করে যেতো তারা।

হাবশী স্থলেমানকেও মসলিন ব্যবসায়ী মনে করে একটি মেয়ে এসে হাজির হলো একদিন।

টুক্-টুক্ টুক্-টুক্—টোকা পড়লো স্থলেমানের দরজায়।

বিস্মিত হয়ে কপাট খুলে দিলে স্থলেমান, আর সামনে একটি শ্যামাঙ্গী কিশোরী মেয়েকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

কোমল একহারা তন্বী শরীর, চোখে অপরূপ কমনীয়তা। রূপোপজীবিনী মনে করে তার দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকালো স্থলেমান। ইশারায় ভেতরে আসতে বললে তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে কৌতুকের ছন্দ নাচিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি।

বললে, বেচতেই এসেছি কালাসাহেব, তবে আমাকে নয়, আমার হাতের তৈরী মসলিন।

কপাটের আড়ালে বেতের গোলাকার টুকরিটা সে নামিয়ে রেখেছিলো, সেটাকে সামনে এনে বসলো মেয়েটি। বললে, তোমার এমন কালো কুচকুচে শরীর হাবশী সাহেব, মসলিন পরলে খোলতাই হবে। নিজে না চাও বিবির জন্যে নিয়ে যাও একটা। বলে আবার হেসে উঠলো।

বেতের টুকরি খুলে একে একে কাপড় দেখাতে শুরু করলো সে।

বাফতায় মোড়া বাণ্ডিল খুলে ফেললো, ঝকঝক করে উঠলো রেশমী আবরণ।

সুলেমান মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলো, বাঃ বাঃ, চমৎকার।

খিলখিল করে আবার হেসে উঠলো কিশোরী মেয়ে। বললে, বেকুফের মতো কথা বলো না, এ রেশমে মসলিন মোড়া থাকে, আসল কাপড় আছে এর ভেতর।

বোকার মতো হাসলো সুলেমান, নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ হয়ে পড়ায়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার?

—ফিরোজা।

—ফিরোজা? বাঃ বেশ নাম তো! তুষ্ট করবার চেষ্টা করে সুলেমান বললে।

ফিরোজা আবার হেসে উঠলো। বললে, তার চেয়ে ভালো আমার হাতে তৈরী এই মসলিন।

—তোমার হাতে তৈরী? বিস্মিত হয়ে সুলেমান প্রশ্ন করলে, মেয়েরাও মসলিন বানাতে পারে?

হাসি চাপলো ফিরোজা। বললে, মসলিন মেয়েরাই তৈরী করে হাবশীসাহেব। তিরিশ বছর বয়স হলে মেয়েরাও পারে না, হাত নরম থাকে না আর।

—তাজ্জব! বিস্ময়ের সুরে বললে সুলেমান।

সুলেমানকে আরো একটু তাজ্জব বানিয়ে ফিরোজা একে একে মসলিনের ভাণ্ডার খুলে দিলো তার চোখের সামনে।

ঝুনা, রংদার, সরকার-আলি। কতো বিভিন্ন রঙের, নানা ধরনের কল্কাতোলা, বুটিদার, চুমকিচমক।

ফিরোজা এক থান মসলিন এগিয়ে দিয়ে বললে, এই সরকার-আলি একখানা নিয়ে যাও হাবশীসাহেব, নবাব বাদশারা এই কাপড় পরে। আর এটা 'খাসা', এটা সবনম্—সাঁঝের শিশিরের মতো...

এমন সময়ে বেগমসাহেবা দিল্‌রস এসে দাঁড়ালো ইব্রাহিম খাঁর পিছনে।

একজন বাঁদীকে প্রশ্ন করলে, সাকিনা বেগম বুঝি তাঁর হামাম-ই-গুলাবে আছে? বলে মৃদু হাসলে দিল্‌রস।

বাঁদী ভয় পেয়ে নবাবের মুখের দিকে তাকালে, দিল্‌রসের অর্থপূর্ণ হাসিটা ইব্রাহিম খাঁ বুঝতে পেরেছেন কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। তারপর বললে, না বেগমসাহেবা, মালিকা বেগম তোশাখানা থেকে সাজ করে আসছেন এখনই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদীপরিবৃতা হয়ে সাকিনা বেগম এসে উপস্থিত হলো। গির্দায় হেলান দিয়ে বসলো ইব্রাহিম খাঁর পাশে। অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে, খাস-বেগমরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছে কি-না।

জাফর খাঁর কাছে উপহার পাওয়া পেশোয়াজ পরে এসেছে সাকিনা। দিল্‌রসের চোখ এড়ালো না!

সাকিনা হয়তো ভেবেছে, তার হাজার হাজার পেশোয়াজের মধ্যে এটি কেউই চিনতে পারবে না, সন্দেহ হবে না ইব্রাহিম খাঁরও।

এই সুযোগ। দিল্‌রস ধীরে ধীরে বললে, মহলে একজন মসলিন-ওয়ালী এসেছে সাকিনা। এখানে তসলিম দিতে বলবো?

ইব্রাহিম খাঁ ফিরে তাকালো। বললে, হ্যাঁ এখানেই!

সাকিনার দিকে বিদ্রূপের হাসিতে তাকিয়ে বাঁদীকে ইশারা করলো দিল্‌রস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছলো ফিরোজা।

একজোড়া আবরোয়ান মেলে ধরে বললে, আপনার জন্যেই বানিয়েছি মালিকা বেগম, দশ হাজার পাক আছে সুতোয়।

আরেকটা থান খুলতে যাচ্ছিলো ফিরোজা, দিল্‌রস বললে, সাকিনা বেগম যা পরে আছেন, ঐ মসলিন আছে আর?

ফিরোজা হেসে বলল, বেগমসাহেবা, এই আবরোয়ানই তো পরে আছেন উনি।

দিল্‌রস অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, উঁহু, ও মসলিন তুমি বুনতে পারবে না।

বুঝতে পারলো না ফিরোজা, বললে, মেহেরবানী করে দেখতে দেন তো ঐ রকমই বুনে দেবো বেগমসাহেবা।

দিল্‌রস হেসে বললে, বে-এক্তিয়ার কথা বলো না, ও আবরোয়ান বোনা শক্ত, দেখাও না সাকিনা।

সাকিনাকে কেমন যেন ম্লান দেখালো। তবু মুখে হাসি টেনে পেশোয়াজের মগজিটা ফিরোজার সামনে এগিয়ে দিলো সাকিনা। কুর্নিশ করে মগজিটা চোখের সামনে তুলে ধরেই চমকে উঠলো ফিরোজা। বললে, বেগমসাহেবা, এ পেশোয়াজের আবরোয়ান তো আমারই হাতে বোনা, এরই জোড় সাহেবান। কিন্তু এ মসলিন আপনার কাছে কি করে এলো মালিকা বেগম, এ তো···

অস্বস্তি ঢেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সাকিনা। দ্রুত পায়ে নিজের কক্ষের দিকে চলে গেলো।

কৌতুকের হাসি হাসলে বেগমসাহেবা দিল্‌রস। তারপর বললে, একশো সরবন্দ চাই আমার।

—কার জন্যে সাহেবান?

উত্তর এলো, তিলকুঠির কাফেররা যে মন্দির বানিয়েছে, আলমগীরের হুকুম, একশো রিসালহা যাবে সে মন্দির ভাঙতে। তাদেরই খেলাত দেবো।

একশো মসলিন রেখে দিয়ে দিল্‌রস বাঁদীকে বললে, খাজাঞ্চীকে বলো দাম দিয়ে দিতে।

ফিরোজা বিদায় নিতেই ইব্রাহিম খাঁর পাশে এসে বসলো দিল্‌রস। হয়তো বা ইব্রাহিম খাঁর মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার জন্যেই।

সন্দেহ উঁকি দিলো আরেকজনের মনে। ফিরোজার।

নির্দিষ্ট স্থানে সুলেমানের সঙ্গে দেখা হলো ফিরোজার। জানলে, তুরানী মনসবদার জাফর খাঁর কাছে সে বিক্রি করেছিলো আবরোয়ানের পেশোয়াজটা।

হাবশী সুলেমান প্রশ্ন করলে, কিন্তু আমার খবর এনেছো তুমি ?

ফিরোজা হেসে বললে, নিজের বেগমদের যে সামাল দিতে পারে না, সুবা সামলাবে সে কি করে। সাকিনা বেগমের মাশুক জাফর খাঁ, আর দিল্‌রস বেগমসাহেবা সাকিনা বেগমের শত্রু।

—আর কোনো খবর ? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে সুলেমান।

ফিরোজা বললে, একশো রিসালহা পাঠানো হচ্ছে মেদিনীপুরে, তিলকুঠির মন্দির ধ্বংস করবার জন্যে।

সুলেমান আনন্দে একমুঠো আসরফি দিয়ে ফেললো ফিরোজাকে। বললে, সবচেয়ে বড়ো খবর এনেছো ফিরোজা। যদি সুবা-বাংলার ফৌজদার হতে পারি তা হলে তুমি হবে আমার খাস বেগম।

ফিরোজা বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালো হাবশীর মুখের দিকে। এই মূর্খ হাবশী হবে বাংলার ফৌজদার! নিজের মনেই হাসলো ফিরোজা।

ষোলো

সংবাদ এসে পৌঁছলো কৃষ্ণরামের দরবারেও।

স্বয়ং আলমগীর পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। হয়তো তাঁর কাছেও গিয়ে পৌঁছেছে ক্ষুদ্র চিতোয়া-বরদার খবর।

সমগ্র ভারতে জ্যোতিষচর্চা নিষিদ্ধ করেছেন আওরঙ্গজেব। প্রধান প্রধান শহরের জ্যোতিষীদের শৃঙ্খলে বেঁধে চাবুক-সওয়ারদের হুকুম দিয়েছেন শাস্তি দেবার জন্যে। হুকুম দিয়েছেন, যেখানে যতো জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথিপত্র আছে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে।

'মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের দেরি নেই'—এই ভবিষ্যদ্বাণী রাষ্ট্র করে হিন্দু প্রজাদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব।

অবশিষ্ট দেবমন্দিরগুলি বিনষ্ট করার জন্য পরোয়ানা পাঠালেন প্রতিটি থানা-ফৌজদার, মুৎসুদ্দি, জায়গীরদার, ক্রোড়ী এবং আমলার নামে। কটক থেকে মেদিনীপুরের মধ্যে যেখানেই নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

আলমগীরের আদেশে আসাদ খাঁর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলো সুবে বাংলার একশো রিসালহা সৈন্য। উড়িষ্যার সওয়ানে-নেগারের গুপ্তপত্রে তিনি জানতে পেরেছেন মেদিনীপুরের তিলকুঠিতে এবং রাজনগরে নতুন মন্দির গড়েছে বিধর্মীরা। সে মন্দির ধূলিসাৎ করার পরোয়ানা এসে পৌঁছলো। আর পুনরায় যাতে হিন্দুরা মন্দিরগুলি গড়ে তুলতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ এলো পরোয়ানায়।

থানা-ফৌজদার আর মুৎসুদ্দিদের ওপর আদেশ এলো দেবমন্দির

সমূলে বিনষ্ট হওয়ার পর কাজী ও শেখদের সাক্ষ্য সমেত খবর পাঠাতে হবে আলমগীরকে।

আমলাদের ঘুষ আর উপঢৌকন দিয়ে বর্ধমান-হুগলীর যে ক'টি প্রাচীন দেবমন্দির রক্ষা পেয়েছে তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার কাজে নবাবসৈন্যদের সাহায্য করার পরোয়ানা এসে পৌঁছলো রাজা কৃষ্ণরামের দরবারে।

পরোয়ানা পাঠ করে বিভ্রান্তের মতো একবার দেওয়ান আরেকবার পুত্র জগৎরামের মুখের দিকে তাকালেন কৃষ্ণরাম। তারপর বিনাবাক্যে সম্রাটের নির্দেশপত্র এগিয়ে দিলেন দেওয়ানের হাতে।

অনুগত ভূমিপতির ওপর এমন আদেশ কোনোদিন কল্পনাও করেননি কৃষ্ণরাম। সমগ্র ভারতে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছেন আওরঙ্গজেব তখনও রক্ষা পেয়েছে কৃষ্ণরামের অধীনস্থ এলাকা। কখনও নবাবের হস্তক্ষেপে, কখনও বা অর্থমূল্যের বিনিময়ে। কিন্তু কাজী ও শেখদের মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে হলে নিঃস্ব হয়ে যাবে তাঁর রাজকোষ। অথচ আপন ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন না রাজা কৃষ্ণরাম। হিন্দুর রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে। ঐশ্বর্যের চেয়ে ধর্ম বড়ো তাঁর কাছে, সম্মানের চেয়ে বিশ্বাস।

আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আক্রোশ ফণা তুললো হঠাৎ, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সব বংশগৌরব পদমর্যাদা ত্যাগ করে শোভা সিংহের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনিও যোগ দেবেন বিদ্রোহীদের দলে। কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্কিত বোধ করলেন আলমগীরের নৃশংস অত্যাচারের কথা ভেবে। না, নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন পুত্র জগৎরাম এবং কন্যা সত্যবতীর কথা। পিতা হয়ে চোখের সামনে তাদের অসম্ভ্রম, তাদের যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু দেখতে চান না কৃষ্ণরাম।

ধীরে ধীরে অন্দর-মহলে ঢুকলেন কৃষ্ণরাম। দু'চোখে তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়লো দুঃখের অশ্রু।

আলাপনী কাদম্বরী ছুটে এলো।—কি হয়েছে রাজাবাহাদুর ?

ব্যথার হাসি হাসলেন কৃষ্ণরাম। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আশ্চর্য হয়েছো আলাপনী! সত্যি, আমাকেও কাঁদতে হয়, রাজা কৃষ্ণরামের চোখেও জল দেখা দেয়।

বিস্মিত কাদম্বরী বললে, আমার কাছে বলুন রাজাবাহাদুর, আপনার কন্যাতুল্য আমি, আমার কাছে খুলে বলুন কে আপনাকে ব্যথা দিয়েছে।

কৃষ্ণরাম হাসলেন, দুঃখের হাসি। খুলে বললেন আওরঙ্গজেবের পরোয়ানার কথা।

শুনলো কাদম্বরী।

কৃষ্ণরাম বললেন, একদিকে আমার মা সর্বেশ্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী কালো মেয়ে আমার একদিকে; আর অন্যদিকে মা সত্যবতী, আমার বুকের হৃৎপিণ্ড জগৎরাম। দুই-ই সমান প্রিয় আমার কাছে, একজনের শুভ যে আরেকজনের অশুভ ডেকে আনবে কাদম্বরী।

বিস্ময়ের চোখে কৃষ্ণরামের মুখের দিকে তাকালো কাদম্বরী। রাজা কৃষ্ণরামের বুকে এতো স্নেহ, এমন গভীর ভক্তি!

তাঁর রূঢ় রাজসিকতার আড়ালে যে এমন একটি কোমল প্রাণ লুকিয়ে আছে কে জানতো।

কৃষ্ণরামের অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাদম্বরীর দু'চোখ জলে ভরে গেলো। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো কাদম্বরী।

অন্দরের কক্ষে এসে দেখলে মখমলের গালিচায় বসে সোনার খাঁচায় পোষা ময়নাকে বুলি পড়াচ্ছে সত্যবতী।

কাদম্বরী ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে সত্যবতী।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো সত্যবতী। শুনলো আওরঙ্গজেবের নির্দেশ। ক্রমে ক্রমে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো তার চোখে। রাজা কৃষ্ণরামের রাজ্যে হিন্দুর মন্দির ধূলিসাৎ হবে নবাবী সৈন্যের

হাতে? আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়লো সত্যবতীর চোখ থেকে। উঠে দাঁড়ালো সে হঠাৎ। বললে, বাংলাদেশ কি নপুংসক হয়ে গেছে কাদম্বরী? এমন একজনও কি নেই যে এই হৃদয়হীন সম্রাটের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আসতে পারে?

আলাপনী কাদম্বরী চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আছে সত্যবতী, আছে।

—আছে? কে কাদম্বরী? কে সেই বীরশ্রেষ্ঠ? সম্রাটের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস যার আছে তাকেই আমি বরমাল্য দেবো কাদম্বরী, নিজে উপযাচিকা হয়ে ছুটে যাবো আমি তাঁর কাছে। কে তিনি?

বিষণ্ণ হাসি দেখা দিলো আলাপনীর মুখে।

বললে, শুনেছি এই অনাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চান একজন সাধারণ ভূস্বামী।

—কে কাদম্বরী, কে তিনি?

উত্তর দিতে পারলো না আলাপনী, চুপ করে রইলো। তারপর ধীরস্বরে উচ্চারণ করলে, চিতোয়া-বরদার শোভা সিংহ, যিনি একদিন তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন।

চমকে চোখ তুললে সত্যবতী। তারপর লজ্জায় মাথা নত করে বললে, মানুষের জীবনে ভুলের শেষ নেই কাদম্বরী। কেশর দিয়েই সিংহের বিচার করি আমরা, ঐশ্বর্য দিয়ে যোগ্যতার। তাই এমন পুরুষোত্তমকেও অপমানিত করেছি!

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, কিন্তু শোভা সিংহ তোমার পিতারও শত্রু সত্যবতী।

—না কাদম্বরী। হিন্দু ধর্মের যিনি বন্ধু, তিনি বর্ধমানরাজেরও বন্ধু। হয়তো আমার হঠকারিতার জন্যেই তিনি শত্রু হয়েছেন। পূজাপুষ্প নিয়ে আসতে বলো কাদম্বরী, সর্বমঙ্গলার পূজা দিতে যাবো আমি।

স্নান করে এসে পট্টবস্ত্রে শরীর জড়িয়ে সর্বমঙ্গলার মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলো সত্যবতী। শোভা সিংহের মঙ্গলের জন্যে, বিদ্রোহীদের সাফল্য প্রার্থনার জন্যে।

মনে মনে কল্পনা করলে, সুপুরুষ এক যুবাকে যেন পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে চলেছে সে, বিদায় দিতে চলেছে বীর স্বামীকে।

কিন্তু শঙ্কিত হলো আলাপনী কাদম্বরী। শিউরে উঠলো সে ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। এ কী করতে চলেছে সত্যবতী!

শোভা সিংহের মঙ্গল রাজা কৃষ্ণরামের অমঙ্গল, কুমার জগৎরামের অমঙ্গল। কাদম্বরী জানে, বিবিবাজারের জলসায় শোভা সিংহ যে দম্ভের আস্ফালন দেখিয়ে গিয়েছিলো, কৃষ্ণরাম তা ক্ষমা করতে পারবেন না, ভুলতে পারবেন না অধীনস্থ তালুকদারের অহঙ্কার।

তা ছাড়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ভয় পায় কাদম্বরী। তার গোপন মনে লুকিয়ে আছে একটি প্রণয়লালিত নাম। তার মনের বাসনা একান্ত তারই। কারও কাছে তা প্রকাশ করেনি কাদম্বরী, প্রকাশ করতে চায়ও না! বছরের পর বছর সযত্নে সঙ্গোপনে একজনের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে।

কুমার জগৎরাম।

জগৎরামকে ভালোবেসেছে আলাপনী। জানে সে, তুচ্ছ আলাপনীর প্রেম কোনো প্রতিদানই পাবে না তাঁর কাছে। জানে, তার গোপন ব্যথাকে প্রকাশ করা চরম হঠকারিতা।

তাই কুমার জগৎরামের মঙ্গল চায় সে, জগৎরামের কুশলই তার আনন্দ।

না, জগৎরামকে বীরবেশে যুদ্ধে পাঠাতে পারবে না কাদম্বরী। চাইবে না তার গৌরবের মৃত্যু। নিরুপদ্রব শান্তিতে থাকতে চায় কাদম্বরী। দেখতে এবং দেখা পেতে।

সত্যবতী সর্বমঙ্গলার মন্দিরের দিকে যাত্রা করতেই জগৎরামের শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হলো কাদম্বরী।

দেখলে, পালঙ্কে অর্ধশয়ান হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছে জগৎরাম। আলাপনীকে যেন লক্ষ্যই করলে না।

কাদম্বরী কাছে এসে দাঁড়ালো।

তবু কোনো কথা বললো না জগৎরাম, সুরাপাত্র তুলে নিলো হাত বাড়িয়ে।

জগৎরামের মুখে হাসি ছিটিয়ে হাত বাড়ালো কাদম্বরী, জগৎরামের হাত থেকে সুরাপাত্র কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখলো।

মুখ বিকৃত করলো জগৎরাম।—বিরক্ত কোরো না কাদম্বরী!

অভিমানাহত অপ্রতিভ মুখে বেরিয়ে এলো সে। তারপর পান-ঘরের দাসীদের সঙ্গে বসে সোনার রেকাবি ভরে নিলো নিজের হাতে সাজা কস্তুরী পানে। সোনালী রাংতায় মোড়া সুগন্ধি পান আর শরবত।

এসে হাজির হলো আবার জগৎরামের পালঙ্কের কাছে। দেখলে, সুরার পাত্র নিঃশেষ করে চলেছে জগৎরাম।

হাত থেকে পুনরায় সুরাপাত্র সরিয়ে রেখে পানের রেকাবি এগিয়ে দিলো কাদম্বরী।

পর-মুহূর্তে ঝন্‌ঝন্‌ করে শব্দ হলো, সযত্নে-সাজা পানের রাশি ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।

আড়াল থেকে এ দৃশ্য দেখে দাসীর দল সশব্দে হেসে উঠলো কৌতুকে। বিরক্তিতে রাগে কাদম্বরীর হাত থেকে সোনার রেকাবি কেড়ে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জগৎরাম!

লজ্জায় অভিমানে পালিয়ে এলো কাদম্বরী। নিজের কক্ষে পালিয়ে এসে সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিলো। লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। বিছানায় লুটিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদলো।

সতেরো

বিদ্রোহ-মুহূর্তের জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো শোভা সিংহ। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিলো আওরঙ্গজেবের পরোয়ানা।

মহলসরার তাজা খবর নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উড়িষ্যায় এসে উপস্থিত হলো হাবশী সুলেমান। নবাব দরবারের সব খবর জানিয়ে কুর্নিশ করে হাত পাতলো।

রহিম খাঁ মুখে হাসি টেনে বললে, পাবে, ইনাম পাবে সুলেমান! যুদ্ধে জয়লাভ করলে তুমি হবে আমার প্রধান ফৌজদার। উপহার পাবে লালবাঈকে।

তারপর বললে, এখনই ঘোড়া ছোটাও চিতোয়া-বরদায়। আমার দোস্ত্ শোভা সিংহকে সব খবর জানিয়ে তৈরী হতে বলো, আমি চললাম সসৈন্যে।

হাতির সারি, উটের সারি, অশ্বারোহী রিসালহা। পিছনে পিছনে পদাতিক সৈন্যের দল, কামানের সারি, গোলাবারুদ, রসদ আর জেনানা-মহলের তাঁবু।

কটক থেকে মেদিনীপুর সমগ্র অঞ্চল জয় করে রহিম খাঁ এসে পৌঁছলো চিতোয়া-বরদা।

চিতোয়া-বরদার দুর্গে লালবাঈ এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের চন্দ্রপ্রভার আশ্রয়ে রেখে এগিয়ে চললো রহিম খাঁ, শোভা সিংহের নেতৃত্বে।

গ্রামের পর গ্রাম বিদ্রোহীদের পদানত হলো।

খবর এসে পৌঁছলো বর্ধমানরাজের দরবারে।

ভীতত্রস্ত কৃষ্ণরাম ভূরীশ্রেষ্ঠের রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পাঠালেন। কিন্তু কোনো সাহায্যই এসে পৌঁছলো না।

বুঝলেন, ভূরীশ্রেষ্ঠও গোপনে যোগদান করেছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণরাম। কিন্তু উপায় নেই। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো সৈন্যবল নেই তাঁর। তিনি কল্পনাও করেননি তাঁর অধীনস্থ তালুকদার এবং জায়গীরভোগীরা গোপনে শোভা সিংহের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

রুষ্ট হয়ে উঠলেন কৃষ্ণরাম।

তাঁরই জায়গীরভোগী তুচ্ছ এক ভৌমিক শুধু তাঁর বিরুদ্ধেই নয়, নবাবের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেছে।

ক্ষিপ্ত বিমূঢ় কৃষ্ণরাম আদেশ দিলেন, নগরকেন্দ্রে সর্বজনসমক্ষে শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা দাহ করার।

সে-খবর শুনে সত্যবতীর কাছে ছুটে এলো কাদম্বরী।

বিস্মিত না হয়ে পারে না আলাপনী। যে শোভা সিংহকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলো সত্যবতী, সেই সামান্য এক ভৌমিকের বিজয়-বার্তায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণরাম-কন্যা। আশ্চর্য!

কিন্তু জগৎরামকে অমঙ্গল থেকে বাঁচাতে চায় কাদম্বরী। সে জানে, শোভা সিংহের সাফল্য কৃষ্ণরামের পরাজয়, জগৎরামের পরাজয়। হয়তো বা মৃত্যু।

সত্যবতীর আনন্দ লক্ষ্য করে রুষ্ট হয়ে ওঠে কাদম্বরী। বিষাক্ত নাগিনী হয়ে সত্যবতীকে দংশন করতে ইচ্ছা হয়।

তাই কুশপুত্তলিকা দাহ করার আদেশ শুনে ছুটে এলো কাদম্বরী। দুঃসংবাদ জানিয়ে যদি সত্যবতীকে এতোটুকু আঘাত দিতে পারে তা হলেও যেন আনন্দ।

বললে, শুভ সংবাদ আছে সত্যবতী!

—কি সংবাদ কাদম্বরী? যেন শোভা সিংহের অভিযান আরও এগিয়ে এসেছে এই সংবাদটুকু শোনবার জন্যেই উদ্গ্রীব সে।

কাদম্বরী হাসলো। বললে, নগরকেন্দ্রে আজ সন্ধ্যায় শোভা সিংহকে দাহ করা হবে!

—শোভা সিংহকে? অবোধ্য চোখ তুলে প্রশ্ন করলে সত্যবতী।

কাদম্বরী আঘাতের স্বরে বললে, হ্যাঁ, রাজকুমারী, তোমার পুরুষোত্তমকে!

ব্যথায় কাতর দেখালো সত্যবতীকে। বললে, সত্য কাদম্বরী? বন্দী হয়েছেন তিনি, না মৃত?

—হ্যাঁ, বন্দী হয়েছেন, জীবন্তে দগ্ধ করা হবে তাঁকে। দৃঢ় স্বরে কাদম্বরী বললে।

চুপ করে রইলো সত্যবতী। তারপর ধীরে ধীরে বললে, না, কাদম্বরী, তাঁকে জীবন্তে দগ্ধ করার শক্তি নেই কারও। তাঁর কুশ-পুত্তলিকাও দাহ করার শক্তি নেই। মা সর্বমঙ্গলা তাঁকে রক্ষা করবেন।

অট্টহাসে হেসে উঠলো কাদম্বরী।

প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়।

নগরকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবে কাদম্বরী। দেখবে, তিল তিল করে কি ভাবে ভস্মীভূত হয় শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে নগরবাসীদের লক্ষ্য করে কাদম্বরী। দেখে, দলে দলে নগর ত্যাগ করে চলেছে তারা। শ্রেষ্ঠী এবং ধনিকের দল সপরিবারে হুগলীর পথে চলেছে।

মাঝে মাঝে ভীত হয়ে পড়ে কাদম্বরী। ইচ্ছা হয়, রাজা কৃষ্ণ-রামকে গিয়ে অনুরোধ করে, নগর ত্যাগ করে যেতে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে রাজা কৃষ্ণরামের সান্ত্বনা-বাক্য! নবাবী সৈন্য এসে পৌঁছবে এখনই, ভয় নেই কাদম্বরী।

বিচলিত পায়ে একবার নিজের কক্ষে ফিরে আসে কাদম্বরী, একবার অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নগরকেন্দ্রের দিকে পা বাড়ায় সে।

লোকে লোকারণ্য চতুর্দিক। শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা দেখতে পায় কাদম্বরী।

জনতার সঙ্গে মিশে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় দেখতে পায় একজন বরকন্দাজ জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে শোভা সিংহের কুশমূর্তির দিকে।

উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে কাদম্বরী। কিন্তু তার উল্লাসধ্বনি চাপা পড়ে যায় জনতার হট্টগোলে।

সত্যবতী!

হ্যাঁ, রাজকুমারী সত্যবতী হঠাৎ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে কুশপুত্তলিকা।

রাজা কৃষ্ণরাম এগিয়ে এলেন।—সরে যাও সত্যবতী, অগ্নিসংযোগ করা হবে এখনই।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে কাদম্বরী। অবিশ্বাস্য মনে হয়।

কুশপুত্তলিকার সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সত্যবতী উত্তর দেয়। —এ-কুশমূর্তিতে আগুন দিতে হলে আমাকেও দাহ করতে হবে।

জগৎরাম এগিয়ে আসে।—সরে এসো সত্যবতী! ধমকের সুরে বলে জগৎরাম।

সেই এক উত্তর আসে।—আমাকে দগ্ধ না করে এ-মূর্তিতে আগুন লাগাতে পারবে না কেউ।

মশাল হাতে বরকন্দাজ ভয়ে পিছু হটে।

জনতা হট্টগোল করে ওঠে। বিচলিত বোধ করেন রাজা কৃষ্ণরাম, কুমার জগৎরাম।

এমন সময় কামানের তোপধ্বনি শোনা যায়। বিভ্রান্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের দিকে ছুটে চলেন রাজা কৃষ্ণরাম। সত্যবতীকে সঙ্গে নিয়ে জগৎরামও প্রাসাদ অভিমুখে ছুটে যায়। হঠাৎ প্রাণভয়ে কাদম্বরীও তাদের অনুসরণ করে ছুটে চলে।

নবাবী সৈন্যের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হলো কৃষ্ণরামের।

বর্ধমান রাজপ্রাসাদ অবরোধ করলো শোভা সিংহ। নগণ্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন কৃষ্ণরাম।

বন্দী হলেন রাজকুমারী সত্যবতী। কিন্তু জগৎরামের সন্ধান মিললো না সমস্ত প্রাসাদ তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও।

সত্যবতীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলো শোভা সিংহ। আদেশ দিলো, রাজপরিবারের অন্যান্য নারীদের ওপর যেন অত্যাচার না হয়।

শুধু সত্যবতীর স্পর্ধার জবাব দিতে চায় শোভা সিংহ। উচিত শিক্ষা দিতে চায় অহঙ্কারী কৃষ্ণরামের কন্যাকে।

কিন্তু জগৎরাম কোথায়?

সমগ্র রাজপ্রাসাদ ঘিরে তাই প্রহরী মোতায়েন হলো। যদি কোনো গুপ্তকক্ষে আশ্রয় নিয়ে থাকে জগৎরাম তা হলেও যেন পলায়নের পথ না পায়।

ক্রমশ রাত গভীর হলো, শান্ত নিঃশব্দ হলো নগর, প্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ মধ্যরাত্রে প্রহরীরা দেখলে একটি পালকি বেরিয়ে আসছে প্রাসাদ থেকে।

চঞ্চল হয়ে উঠলো প্রহরারত সৈন্যের দল।

প্রহরীদের সামনে এসে থামলো বর্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্নিত পালকি। সঙ্গে একজন দাসী সেই বহুমূল্য পালকি অনুসরণ করছে।

বিস্মিত স্বরে প্রহরী প্রশ্ন করলে, কে আছেন পালকিতে?

দাসী উত্তর দিলে, মহারাজার আলাপনী!

—এতো রাত্রে কোথায় চলেছেন তিনি? প্রহরী সবিস্ময়ে পুনরায় প্রশ্ন করলে।

পালকির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের উত্তর এলো, বিদ্রোহীদের অধিনায়ক শোভা সিংহের তাঁবুতে।

ভীত হয়ে পড়লো প্রহরী! ভাবলে, হয়তো অধিনায়কের নির্দেশেই চলেছে আলাপনী। বললে, চলো, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি।

শোভা সিংহ তখন সুরায় আসক্ত, তাঁবুর লাল তুলিচার ওপর নেচে চলেছে নর্তকীর দল।

প্রহরী এসে খবর দিলো দ্বারীকে, দ্বারী এসে ফিসফিস করে শোভা সিংহকে বললে, কৃষ্ণরামের আলাপনী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

অনুমতি দিতেই অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কাদম্বরী এসে নতমস্তকে অভিবাদন জানালে শোভা সিংহকে।

পাশে আসন দেখিয়ে বসতে বললে শোভা সিংহ।

আলাপনী আসন গ্রহণ করে মৃদুস্বরে বললে, একটি অনুরোধ আছে মহারাজ।

—কি অনুরোধ রঙ্গিণী? কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করলে শোভা সিংহ।

—রাজকুমারী সত্যবতীর মুক্তি ভিক্ষা করতে এসেছি আপনার কাছে।

উত্তর শুনে সশব্দে হেসে উঠলো শোভা সিংহ।

বললে, এত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এতো দূর থেকে এসেছি যাকে বন্দী করবার জন্যে, তাকেই মুক্তি দিতে হবে? হেসে উঠলো শোভা সিংহ। সুরার পাত্রটা তুলে নিয়ে কাদম্বরীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললে, কঙ্কণ কার হাতে মানাবে পরীক্ষা না করে তো তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায় না কাদম্বরী!

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, আপনি কি সত্যই রাজকুমারীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, না শুধুই অপমান করবার জন্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন ?

শোভা সিংহ বললে, সত্যবতীকে আমার অঙ্কশায়িনী করতে চাই রসবতী, বিবাহ করেই হোক আর বাহুবলেই হোক। বলে হাসলো শোভা সিংহ।

কাদম্বরী আতঙ্কে শিউরে উঠলো সেকথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রাজকুমারী আপনাকে অপমান করতে চায়নি মহারাজ, আপনার প্রস্তাবকে বিশ্বাস না করে বিদ্রূপ ভেবেছিলেন। তাকে ক্ষমা করুন আপনি, আর আমাকে সপ্তাহকাল সময় দিন, এ-বিবাহে আমি সত্যবতীকে সম্মত করাবো।

শোভা সিংহ খুশী হয়ে বললে, বেশ, সাত দিন অপেক্ষা করবো কাদম্বরী।

—তা হলে রাজকুমারীর সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিন আমাকে।

প্রহরীর দিকে তাকিয়ে ইশারায় সম্মতি জানালো শোভা সিংহ।

কাদম্বরী মৃদুস্বরে বললে, আরেকটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি আপনার।

মৃদু হাসি হেসে কাদম্বরীর মুখের দিকে তাকালো শোভা সিংহ।

—বলো আলাপনী, বলো!

কাদম্বরী বললে, মহারাজ কৃষ্ণরামের আলাপনী আমি, আলাপনই আমার পেশা। যদি অনুমতি করেন, প্রতি সন্ধ্যায় আপনার চিত্ত-বিশ্রামে এসে যোগ দেবো।

শোভা সিংহ খুশী হয়ে সম্মতি জানালো, তারপর খাজাঞ্চীকে ইশারা করলে।

খাজাঞ্চী স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে হাজির হতেই কাদম্বরী বললে, পুরস্কার চাই না মহারাজ, যথাসময়ে পুরস্কার আদায় করে নেবো

আমি। কিন্তু অনুগ্রহ করে এই আদেশ দিন প্রহরীদের যে, আপনার এখানে আসার সময়ে যেন কোনো প্রহরী আমার সঙ্গে না আসে।

—কেন কাদম্বরী? বিস্মিত হয়ে শোভা সিংহ প্রশ্ন করলে।

কাদম্বরী মৃদু হেসে বললে, প্রহরীর, সঙ্গে প্রতিদিন আপনার এখানে এলে নারীর সম্মান যে ধুলোয় লুটিয়ে যাবে মহারাজ!

বিকৃতচিত্ত শোভা সিংহ খুশী হয়ে উঠলো।

বললে, আদেশ দিচ্ছি, কোনো প্রহরী তোমাকে একাকী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দেবে না।

খুশী হয়ে ফিরে এলো কাদম্বরী।

তারপর দিনে দিনে বিচিত্র রসালাপে মুগ্ধ করলো শোভা সিংহকে।

উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার এক বিচিত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আলাপনীর মুখ। শোভা সিংহ লক্ষ্য করলো না, প্রহরীরা লক্ষ্য করলো না। হয়তো বা লক্ষ্য করেও কাদম্বরীর উৎফুল্ল মুখের অন্তর্নিহিত অর্থটুকু বুঝতে পারলো না।

পালকি ফিরে এলো রাজপ্রাসাদে, সাবধানী ঘুঙুর বাজিয়ে কাদম্বরী প্রবেশ করলো অন্দর-মহলে।

দিনের পর দিন কেটে চলে এমনি ভাবেই। প্রতি সন্ধ্যায় প্রহরীদের সামনে দিয়েই শোভা সিংহের তাঁবুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আলাপনী, সুরাসক্ত শোভা সিংহকে খুশী করে সুচতুর আলাপ কৌশলে, তারপর আবার ফিরে আসে রাজপ্রাসাদে।

সেদিনও এমনি দৈনন্দিন আলাপের পর ফিরে এলো কাদম্বরী।

প্রহরীকে বললে, রাজকুমারী সত্যবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

প্রহরী বিনত সম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো সত্যবতীর কারাকক্ষে।

কারাগারের ক্ষীণ আলোকে সত্যবতীর ম্লান বিষণ্ণ দেহকান্তি দেখতে পেলো কাদম্বরী।

মনের গোপনে যেন খুশী হয়ে উঠলো।

সত্যবতীকে কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারে না কাদম্বরী, ক্ষমা করতে চায় না। বর্ধমানরাজের পরাজয়ের জন্যে সত্যবতীকে দায়ী মনে হয় তার।

পিতার শত্রু, ভ্রাতার শত্রুকে যে নারী ভালোবাসতে পারে তাকে কোনো যুক্তি দিয়েই যেন ক্ষমা করা যায় না। মনে মনে তাই সত্যবতীর নির্বুদ্ধিতার জন্যে অন্ধ আক্রোশে জ্বলে ওঠে কাদম্বরী।

প্রায়ান্ধকার কারাগার-কক্ষের পালঙ্কে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে হয়তো অদৃষ্টের কথা ভাবছিলো সত্যবতী।

দ্বারপ্রান্তে প্রহরীর সঙ্গে কাদম্বরীকে দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ। তবে কি মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছে আলাপনী? কোনো মধুর প্রস্তাব পাঠিয়েছে ধর্মরক্ষক শোভা সিংহ?

উন্মুখ-বিস্ময়ে শয্যা ছেড়ে এগিয়ে এলো সত্যবতী।

প্রহরী লৌহদ্বার খুলে দিলো।

কক্ষে প্রবেশ করলো কাদম্বরী।

পুনরায় দ্বার বন্ধ করে দিলো প্রহরী। তারপর টহল দিতে দিতে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেলো।

কাদম্বরী কটিবন্ধ থেকে কৃপাণ বের করে বললে, এই নাও কৃপাণ, সত্যবতী। গোপনে তোমার ইচ্ছামৃত্যুর অস্ত্র এনে দিলাম।

চকিতে দ্বারপ্রান্তে তাকালো সত্যবতী। না, প্রহরী দূরে সরে গেছে।

নিমেষের মধ্যে শয্যাতলে কৃপাণ লুকিয়ে ফেললো সত্যবতী।

হাসলো কাদম্বরী, তাচ্ছিল্যের হাসি।

বললে, মৃত্যুকে তোমার এতো ভয় সত্যবতী? ভেবেছিলাম

আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তুমি প্রস্তুত হয়ে আছো। সম্মান বিসর্জন দিয়েও বেঁচে থাকতে এতো লোভ তোমার?

ব্যথাতুর চোখ তুলে তাকালো সত্যবতী। বললে, সম্মান তো বিসর্জন আমি দিইনি কাদম্বরী।

—এর চেয়ে অসম্মান আর কি হতে পারে রাজকুমারী? এর চেয়ে বড়ো লজ্জা কি আছে?

সত্যবতী মৃদু হেসে বললে, আমি বিদ্রোহীদের অধিনায়কের জন্যে অপেক্ষা করছি কাদম্বরী।

বিদ্রূপের স্বরে হেসে উঠলো কাদম্বরী। বললে, কিন্তু বরমাল্য কই? দর্শন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দেবে না?

চুপ করে রইলো সত্যবতী, কোনো উত্তর দিলো না এ প্রশ্নের। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো তার। অসত্য নয় আলাপনীর বিদ্রূপ! যে স্বেচ্ছাচারীর হাতে কৃষ্ণরাম নিহত হয়েছেন, ভ্রাতার জীবন বিপন্ন, তাকেই পতিত্বে বরণ করার স্বপ্ন দেখছে সত্যবতী দিনের পর দিন।

কিন্তু শোভা সিংহ কি সত্যই স্বেচ্ছাচারী? প্রবলপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে-বীরশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়, মোগল শক্তিকে পদানত করে হিন্দুর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনাই যার কাম্য, সেই শোভা সিংহকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে সত্যবতী।

মায়া মমতা, আত্মীয় স্বজন, সকলের চেয়ে বড়ো ধর্ম। সেই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গৌরব বোধ করে সত্যবতী।

শোভা সিংহকে ধর্মরক্ষকের প্রতীক মনে হয়। শোভা সিংহের জয় যেন সত্যবতীরও জয়।

ধীরস্বরে সত্যবতী বলে, মায়া মমতার চেয়ে ধর্ম বড়ো কাদম্বরী, স্নেহ ভালোবাসার চেয়ে দেবতা। তাই সন্তানের স্নেহ, আত্মীয় পরিজনের ভালোবাসা উপেক্ষা করেও ধর্মের জন্যে স্বামীর চিতায় জীবন দিতে চায় হিন্দু নারী।

সত্যবতীর কথা যেন আগুন ধরিয়ে দেয় কাদম্বরীর মনে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ায় কাদম্বরী, চিৎকার করে প্রহরীকে ডাক দেয়।

প্রহরী দ্বার খুলে দেয়।

সত্যবতীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হয় না কাদম্বরীর।

কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে রোষদীপ্ত পা ফেলে ফেলে অন্দর-মহলের দিকে এগিয়ে যায়।

পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় কারাকক্ষের লৌহদ্বার।

আর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সত্যবতীর বুক ঠেলে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও অন্দর-মহল থেকে পর্দায় ঢাকা পালকি এসে থামলো প্রাসাদের দরজায়। পালকি অনুসরণ করে অন্দর-মহলের দাসী।

প্রহরী দাসীকে প্রশ্ন করলে, কে আছেন পালকিতে?

—আলাপনী কাদম্বরী।

দাসীর কণ্ঠস্বর বুঝি কেঁপে উঠলো।

—আর কে আছে? সন্দেহের স্বরে প্রশ্ন করে প্রহরী।

উত্তর দিতে পারলো না দাসী। বিব্রত বোধ করলো প্রশ্ন শুনে।

—কে আছে আলাপনীর সঙ্গে, বলো? পুনরায় প্রশ্ন করলো প্রহরী।

দাসী ভীতস্বরে বললে, আলাপনী একাই আছেন, শোভা সিংহের তাঁবুতে চলেছেন তিনি।

কিন্তু দাসীর অপ্রতিভ ভাব দেখে সন্দেহ দৃঢ় হলো। পালকির পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখলে একজন অবগুণ্ঠিতা নারী, আর একজন পুরুষ।

ক্রুদ্ধ স্বরে প্রহরী প্রশ্ন করলে, কে ইনি?

প্রহরীর মুখের সামনেই পর্দা টেনে দিলো দাসী।

—রাজকুমার জগৎরাম। শোভা সিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে চলেছেন। দৃঢ় সংযত কণ্ঠে আলাপনী উত্তর দিলো পর্দার আড়াল থেকে।

জগৎরাম ?

চাঞ্চল্য দেখা দিলো প্রহরীদের মধ্যে। জগৎরামকে তন্নতন্ন করে খুজে পায়নি তারা। তবে কি অন্দর-মহলেই এতোদিন লুকিয়ে ছিলো জগৎরাম ?

প্রহরী বললে, আলাপনী যেতে পারেন, কিন্তু জগৎরামকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাকে শৃঙ্খলে বন্দী করে নিয়ে যেতে চাই।

পর্দা সরে গেলো আবার। বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত জগৎরাম নেমে দাঁড়ালো পালকি থেকে। প্রহরীরা মুগ্ধ হলো জগৎরামের দিকে তাকিয়ে। মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে মখমলের বিলাতী খেলাত, কটিবন্ধে তরবারি, কিন্তু মুখে এক অপূর্ব কমনীয় ভাব।

শৃঙ্খলে জগৎরামকে বেঁধে ফেললো তারা, তারপর পালকির পর্দা সরিয়ে দেখলে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বসে আছে কাদম্বরী।

ইশারা করতেই কাদম্বরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো পালকিবাহীরা, আর উল্লাস প্রকাশ করতে করতে শৃঙ্খলিত জগৎরামকে নিয়ে শোভা সিংহের তাঁবুর দিকে চললো প্রহরীরা। উপস্থিত করলো তাকে শোভা সিংহের কাছে। বললে, জগৎরামকে বন্দী করে এনেছি রাজাবাহাদুর!

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে শোভা সিংহ বললে, আসুন কুমারবাহাদুর, আপনার জন্যেই এতোদিন অপেক্ষা করে আছি!

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষবেশী কাদম্বরী মাথার উষ্ণীষ খুলে ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, জগৎরাম এখন ঘোড়া ছুটিয়ে নবাবের দরবারে চলেছে শোভা সিংহ, কারো শক্তি নেই তাকে বন্দী করে। আমি জগৎরাম নই, আমি আলাপনী কাদম্বরী।

চমকে উঠলো সকলে।

ক্রুদ্ধ বিমূঢ় শোভা সিংহ শুধু বললে, অবিশ্বাসিনীকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে দাও।

বর্ধমান-যুবরাজ জগৎরাম এদিকে ভাগীরথী অতিক্রম করে ছুটে চলেছে ঢাকার পথে। বর্ধমান থেকে হুগলী পর্যন্ত রাঢ়ভূমি বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে, এ-খবরে হয়তো সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর সুরার নেশা কেটে যেতে পারে!

আশ্চর্য! কেউ সন্দেহও করেনি কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম এ-ভাবে নারীর ছদ্মবেশে মুক্তি লাভ করবে। সন্দেহও করেনি এ-ভাবে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দিতে যাবে জগৎরাম।

কখনো নারীর ছদ্মবেশে, কখনও বা গ্রাম্য চাষীর বেশে হুগলী অতিক্রম করেছে জগৎরাম। আর ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এক অবলা নারীমূর্তি। আলাপনী কাদম্বরী।

নিজের জীবন রক্ষা করার চিন্তাতেই বিভোর হয়েছিলো জগৎরাম! আলাপনীর সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করেছে প্রাসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। চোখের সামনে তখন একটিমাত্র পথ। ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে খবর পৌঁছে দিতে হবে ঢাকার দরবারে। শাহী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে হবে।

যৌবনের বিলাসব্যসনে নিদ্রিত ছিলো জগৎরাম। চটুল চোখের তারায় শুধু আনন্দের ছায়া দেখেছে, তার কটাক্ষে দেখেছে শুধু মোহমদির প্রেমবিলাস। কখনো সন্দেহ হয়েছে, আলাপনী কাদম্বরী হয়তো সত্যই রাজকুমার জগৎরামের প্রেমে অবগাহন করতে চায়। কখনো বা আলাপনীর আলাপকৌশল বলে মনে হয়েছে তার চোখের রহস্যময় দৃষ্টিকে।

কিন্তু এ-চক্রান্তের মধ্যে কাদম্বরী তার নিজের মৃত্যুকে এ-ভাবে

লুকিয়ে রাখবে, কল্পনাও করেনি জগৎরাম। মৃত্যুবরণ করেই বুঝি প্রণয়পাত্রকে জীবন দিয়ে গেলো কাদম্বরী।

সন্দেহ নেই, কাদম্বরীর কৌশল ধরা পড়ে যাবে বিদ্রোহীদের কাছে। তারপর হয়তো নৃশংস অত্যাচারে কাদম্বরীকে হত্যা করবে তারা। হয়তো বা—

কল্পনার চোখে যেন সে-দৃশ্য দেখতে পেলো জগৎরাম। উন্মত্ত একটি হাতির সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে কাদম্বরী। কামনা চরিতার্থ হওয়ার হাসি তার মুখে। গোপন মনের প্রণয়াস্পদের জীবন রক্ষা করতে পেরেছে নিজের জীবন দিয়ে—সেই আনন্দেই যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু মত্তহস্তী তো ত্যাগের মহিমা বোঝে না! জগৎরাম যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলো, হাতির শুঁড় ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরলো কাদম্বরীর অসহায় দেহকে। তারপর, আতঙ্কে যেন চীৎকার করে উঠলো কাদম্বরী। শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করে কাদম্বরীকে পায়ের তলায় পিষে ফেললো যেন মত্তহস্তীর আক্রোশ। কানের পাশে সত্যই যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো কাদম্বরী।

মন ভরে গেলো আত্মগ্লানিতে। নদী থেকে এক আঁজলা জল পান করে নিলো সে।

তারপর সুতানুটির মহাজনের কাছে স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রেখে একটি ঘোড়া সংগ্রহ করে যাত্রা করলো ঢাকার পথে।

সমস্ত খবর শুনলো ইব্রাহিম খাঁ। ভীত হয়ে উঠলো। আলমগীরের রাজত্বে বিদ্রোহীদের এমন দুঃসাহস হবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

নিরুপায় অস্বস্তিতে বললে, এ বিদ্রোহ আপনা থেকেই থেমে যাবে জগৎরাম, সৈন্য পাঠানোর হয়তো প্রয়োজন হবে না।

জগৎরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, হ্যাঁ নবাববাহাদুর, আপনা থেকেই থেমে যাবে। হুগলী পর্যন্ত অধিকার করেছে রহিম খাঁ,

দু'এক দিনের মধ্যেই ঢাকার পথেও যাত্রা করবে তারা। ঢাকা অধিকার করলেই বিদ্রোহ থেমে যাবে; কিন্তু আপনার সুবেদারী তক্তে তখন বসবে শোভা সিংহ।

নির্বোধের মতো হাসলো ইব্রাহিম খাঁ, তারপর দার্শনিকের ভাষায় বললে, যুদ্ধ অশান্তির মূল জগৎরাম। যুদ্ধবিগ্রহে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু শান্তিরক্ষার জন্যে প্রজারাই কেন বিদ্রোহীদের বাধা দিচ্ছে না?

জগৎরাম চুপ করে রইলো। কি উত্তর দেবে সে এই অর্থহীন প্রশ্নের? সমগ্র বাংলার প্রজারা দারিদ্র্যে, অত্যাচারে, ধর্মের ওপর অন্যায় আক্রমণের ফলে আস্থা হারিয়েছে আলমগীরের ওপর। বিদ্রোহীদের হাতে এখন লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। অর্থের লোভে, দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় দলে দলে তারা ছুটে চলেছে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করার জন্যে। সে-খবর কি নবাব ইব্রাহিম খাঁ জানে না!

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে জগৎরাম বললে, আপনি যদি বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হন তা হলে সম্রাটের কাছে যেতে হবে আমাকে। আলমগীরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এ-খবর।

বিচলিত হয়ে উঠলো ইব্রাহিম খাঁ, আলমগীরের নাম শুনে।

বললো, না, না জগৎরাম। এ বিদ্রোহ দমনের ভার আমিই নিলাম।

জগৎরামকে বিশ্রামকক্ষে পাঠিয়ে ইব্রাহিম খাঁ মহলসরার অন্দর-মহলে ছুটে এলো উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

—সাকিনা! পিয়ারী!

সাকিনা বেগমের প্রমোদকক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলো ইব্রাহিম খাঁ।

ডাক শুনে চমকে উঠলো সাকিনা বেগম। ইব্রাহিম খাঁ দরবারে গিয়েছে শুনেই অসতর্ক ছিলো সাকিনা। কিন্তু…

সাকিনা এবং জাফর খাঁ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো বিভ্রান্তের মতো। উপায়?

আঠারো

জগৎরাম ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। জগৎরাম নবাব-দরবারে খবর পৌঁছে দিতে চলেছে শুনেই চাঞ্চল্য দেখা দিলো শোভা সিংহের শিবিরে।

আত্মধিক্কারে ক্ষণেকের জন্যে বিমর্ষ হয়ে পড়লো শোভা সিংহ, সামান্যা এক নারীর কৌশলের কাছে পরাজিত হওয়ার লজ্জায়। পরক্ষণেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাদম্বরীকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে নৃশংসভাবে হত্যা করার আদেশ দিলো।

কিন্তু শোভা সিংহ বুঝলো না, কৌশল নয়, এক সামান্যা নারীর আত্মবিসর্জনের কাছে পরাজিত হয়েছে সে।

পুনরায় সুরাপাত্র তুলে নিয়ে নেশাগ্রস্ত চোখে শোভা সিংহ হুকুম দিলো, রাজনন্দিনী সত্যবতীকে নিয়ে এসো আমার বিলাসকক্ষে।

সুরাসক্ত শোভা সিংহের আদেশ কানে আসতেই রক্ষীদের ইশারায় নিষেধ জানালো রহিম খাঁ।

তারপর শোভা সিংহের হাতের ওপর হাত রেখে বললে, ভুল কোরো না দোস্ত্। সমগ্র সুবা হাতের মুঠোয় আনতে এখনও অনেক দেরি।

সপ্রশ্ন রক্তিম চোখ তুলে তাকালো শোভা সিংহ।—সুবা? হঠাৎ অট্টহাসে হেসে উঠলো শোভা সিংহ, বললে, সারা সুবা আমার পায়ের তলায়, সুবা আমার।

রহিম খাঁ মৃদু হেসে বললে, না শোভাজী। সুবা এখনও আলমগীরের। ভুলে যেও না জগৎরাম ছুটে চলেছে ঢাকার পথে, বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দেবার জন্যে।

শোভা সিংহ হেসে উঠলো সশব্দে।

বললে, খবর পৌঁছে দিলেও ইব্রাহিম খাঁর নেশা ভাঙবে না বন্ধু, যুদ্ধের নামই শুনে সুবেদারী ফেলে রেখে পালাবে বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ নবাব। শোভা সিংহের রসিকতায় হেসে উঠলো রহিম শেখ।

—কিন্তু আলমগীর ভীরু ইব্রাহিম খাঁ নয় শোভাজী। রহিম খাঁ দৃঢ় গলায় উত্তর দিলো। বললে, আলমগীরের সৈন্য এসে পৌঁছনোর আগেই সারা বাংলা জয় করে নিতে হবে। সময় নষ্ট করার সময় নয় এখন।

শোভা সিংহ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।—ঠিক, সময় নষ্ট করার সময় নয় এখন। রাজনন্দিনীকে আজ রাত্রেই অঙ্কশায়িনী করতে হবে।

রহিম খাঁ হেসে বললে, সত্যবতী চিড়িয়া নয় যে উড়ে পালাবে। অপমানের প্রতিশোধ নেবার অনেক সময় পাবে দোস্ত, কিন্তু রাজ্য জয় করার সুযোগ মিলবে না এর পর।

নেশা ছুটে গেল শোভা সিংহের। ঠিক কথাই বলেছে রহিম খাঁ। তার যুক্তিই স্বীকার করে নিলো শোভা সিংহ, বন্যার বেগে সসৈন্যে হুগলীর দিকে এগিয়ে যেতে হবে অবিলম্বে।

পাঁচশত সৈন্যের একটি রক্ষীবাহিনী রেখে যেতে হবে বর্ধমানে। সত্যবতী ততোদিন কারাগারে নির্জন যন্ত্রণা ভোগ করুক। সারা বাংলা জয় করে ফিরে আসবে শোভা সিংহ।

জগৎরাম সেদিন তার সামনেই কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াবে। আর সত্যবতী?

কল্পনার চোখে দেখতে পায় শোভা সিংহ, তার ভোগ লালসা মেটাবার জন্যে যেন বর্ধমানরাজের পরমাসুন্দরী কন্যা নিজেই উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

আবার জয়ধ্বনি উঠলো বিদ্রোহী প্রজাদের, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো শোভা সিংহের বিজয়-বার্তা।

হাবশী সুলেমানের ওপর বর্ধমান শাসনের ভার দিয়ে বন্যার

বেগেই এগিয়ে চললো বিদ্রোহী সৈন্য। দরিদ্র গ্রামবাসীর দল অত্যাচারে অনাহারে দিন কাটিয়ে এসে হঠাৎ এক আশার আলো দেখতে পেয়েছে। একদিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, অন্যদিকে অর্থের লোভ, লুটের ধনে অদৃষ্ট ফিরিয়ে নেবার লোভ। দলে দলে তারা ছুটে এলো শোভা সিংহের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে।

হুগলী পর্যন্ত অধিকার করে ভাগীরথী তীরে এসে থামলো শোভা সিংহ। কটক থেকে হুগলী পর্যন্ত সমস্ত রাঢ়ভূমি তখন বিদ্রোহী-অধিকৃত।

ভাগীরথীর তীরে তাঁবু ফেলে পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরী হবার আদেশ দিলো শোভা সিংহ। গুপ্তচর পাঠিয়ে অপেক্ষা করলো নবাবী সৈন্যের খবর জানবার জন্যে।

বিশ্রাম পেয়ে বিদ্রোহী সৈন্যরা অত্যাচার শুরু করলো চতুর্দিকে। ইংরেজ আর ওলন্দাজের বণিককুঠি লুণ্ঠিত হলো, গ্রামের পর গ্রাম।

সব অনাচার ছাপিয়ে হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বনি উঠলো সৈন্যদের কণ্ঠে। জয়ধ্বনি নয়, যেন হিন্দুর ধর্মকে বিদ্রূপ করলো তাদের নৃশংসতা।

রাজ্যলোভের উন্মাদনায় শোভা সিংহও বুঝি সব আদর্শ ভুলে গেলো, উদ্দেশ্য হারালো অহঙ্কারের কুহেলিকায়। সব জয়ধ্বনির ফাঁকে একটি নারীর শরীর কুহকিনীর মতো বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে। শোভা সিংহের অভ্রংলিহ অহঙ্কার যেন মাটিতে মিশিয়ে দেয় অতীতের একটি তুচ্ছ ঘটনার বিষাক্ত স্মৃতি।

সত্যবতীর আভিজাত্যের গরিমাকে গ্লানির পদাঘাতে নিষ্পেষিত না করে যেন শান্তি নেই। বর্ধমান-রাজকন্যার গৌরবের মুকুটকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে এক অবলা নারীর উপহাসের। জবাব দিতে হবে তার ঔদ্ধত্যের।

শুধুই প্রতিশোধ? না, কামনার শিখার মতো সত্যবতীর যৌবন-রূপ ভেসে উঠলো শোভা সিংহের চোখের সামনে। প্রবৃত্তি জেগে উঠলো।

রহিম খাঁর ওপর বিদ্রোহী সৈন্যের ভার দিয়ে বর্ধমানে ফিরে এলো শোভা সিংহ।

হাবশী সুলেমান কুর্নিশ করে হাত পাতলে শোভা সিংহের সামনে।—ফরমাইয়ে জাহাঁপনা!

শোভা সিংহ সহাস্যে প্রশ্ন করলো—সত্যবতী?

ঘাড় নেড়ে ইশারায় সুলেমান জানালে, সব ঠিক আছে।

শোভা সিংহ খুশী মনে ইশারা করলে 'জরিয়া' দাসীকে।

পান-পাত্র এনে দিলো জরিয়া। সুরার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলো শোভা সিংহ। ক্রমশ অন্যায়ের আগুন জ্বলে উঠলো তার সুরাসক্ত রক্তিম চোখে।

রাতের অন্ধকার নেমে এলো রাজপ্রাসাদ ঘিরে। একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠলো প্রাসাদের কক্ষে। সত্যবতীর কারাগারে।

উন্মত্ত কামনায় টলতে টলতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো শোভা সিংহ। সঙ্গে হাবশী সুলেমান।

সত্যবতীর কারাকক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো শোভা সিংহ।

সুলেমান লৌহদ্বার তুলে দিলো। পুনরায় দ্বার বন্ধ করে দিলো শোভা সিংহ প্রবেশ করতেই।

সত্যবতী বিস্ময়ে চোখ খুলে তাকালো শোভা সিংহের দিকে। মত্তপ শোভা সিংহের কামনাকুটিল উন্মত্ত চোখের দিকে।

একজোড়া স্বর্ণকঙ্কণ হাতে নিয়ে সত্যবতীর সামনে মেলে ধরলো শোভা সিংহ। অট্টহাসে হেসে উঠলো নিঃশব্দ প্রাসাদ কাঁপিয়ে।

বললে, যে-কঙ্কণ ফিরিয়ে দিয়েছিলে রাজনন্দিনী, সেই কঙ্কণই তোমার হাতে পরিয়ে দিতে এসেছি।

ঘৃণায় বিভীষিকায় আতঙ্ক ফুটে উঠলো সত্যবতীর চোখে। ভয়ে পিছিয়ে এলো সত্যবতী।

দিনের পর দিন প্রহরীদের কাছে শোভা সিংহের বিজয়বার্তা শুনেছে সত্যবতী, মনে মনে উল্লসিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছে সারা ভারতে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার। স্বপ্ন দেখেছে বীরশ্রেষ্ঠ শোভা সিংহের।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে সত্যবতী, স্বপ্ন দেখেছে শোভা সিংহ সমগ্র বাংলা জয় করে এসে দাঁড়াবে তার সামনে, আর শোভা সিংহের গলায় জয়মালা পরিয়ে দেবে সত্যবতী। বিনিময়ে চেয়ে নেবে ভ্রাতার জীবন, হৃতরাজ্য বর্ধমান।

কিন্তু এ কি বীভৎস রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে শোভা সিংহ!

শোভা সিংহ তখনও অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্দিনীর রূপের মোহে। রূপলাবণ্যময়ী রাজকুমারীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করলো শোভা সিংহকে। স্থরার নেশায় বুঝি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো বিদ্রোহী নেতা।

মৃদু হেসে শোভা সিংহ বললে, একদিন তুচ্ছ ভূস্বামী বলে আমার পাণিগ্রহণ করতে চাওনি রাজকুমারী, অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে আমার প্রস্তাব। এখনও কি সেই স্পর্ধা আছে তোমার?

সত্যবতী কোনো উত্তর দিলো না।

শোভা সিংহ বললে, এখনও চিন্তা করে দেখো সত্যবতী, স্বেচ্ছায় যদি বিবাহ করতে চাও তা হলে এই বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পাবে, শোভা সিংহের পত্নীর সম্মান পাবে।

সত্যবতী ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যাকে পশুরও অধম মনে করে, তাকে পতিত্বে বরণ করতে পারে না কোনো হিন্দু নারী।

অট্টহাসে হেসে উঠলো শোভা সিংহ।

কামান্ধ দৃষ্টিতে সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে শোভা সিংহ বললে, কিন্তু এখনো আমার মধ্যে পশুত্ব দেখোনি সত্যবতী। আমি সত্যই পশু!

টলতে টলতে এগিয়ে এলো শোভা সিংহ। বললে, না সত্যবতী, বিবাহ করে তোমার মর্যাদা নষ্ট করতে চাই না আমি। আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। যে ঐশ্বর্য চাও, তোমার কোনো কামনাই অতৃপ্ত রাখবো না, কিন্তু আমার কামনাকেও অতৃপ্ত রেখো না তুমি।

সত্যবতী ঘৃণায় আতঙ্কে পিছিয়ে এলো শোভা সিংহের কামলুব্ধ হাত থেকে বাঁচবার আশায়।

মত্তপ শোভা সিংহ স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীর মনে হলো, উন্মত্ত একটা অসুর যেন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

বলিষ্ঠ দু'টি হাতের আলিঙ্গনে ধরা পড়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো রাজকুমারী। ছাড়া পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলে।

শোভা সিংহের শরীরে তখন পশুত্ব জেগে উঠেছে। ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সব কিছু ভুলে গেলো সে।

লালসামত্তের আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হলো সত্যবতীর বেশবাস, বিস্রস্তবসনা রাজকন্যাকে জয় করবার অদম্য আগ্রহে উন্মত্ত হয়ে উঠলো শোভা সিংহ।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো সত্যবতী, বাধা দিলো না।

বললে, আপনার কামনায় সম্মতি জানাচ্ছি আমি। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বীর আপনি, এ-ভাবে ক্ষত্রিয়াণীর সম্মান প্রহরীদের সামনে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন না, এই ভিক্ষা আমার। সত্যবতীর চোখের কোণে বেদনার অশ্রু দেখা দিলো।

শোভা সিংহ সন্তুষ্টির হাসি হেসে সে-কথা বিশ্বাস করলো। অদম্য কামনা চরিতার্থ করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আলিঙ্গন শিথিল করলো।

পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠলো শোভা সিংহ।

কটিবন্ধের গুপ্ত কৃপাণ বের করে শোভা সিংহের বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে রাজকুমারী।

চিৎকার শুনে ছুটে এলো হাবশী সুলেমান, ছুটে এলো প্রহরীর দল। দেখলে, রক্তাক্ত কৃপাণ হাতে উন্মাদের হাসি হাসছে বর্ধমান-রাজকন্যা, আর শোভা সিংহের মৃতদেহ পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। রক্তে ভেসে গেছে সমস্ত কারাকক্ষ।

রাজকুমারী সত্যবতীর কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পেলো না সুলেমান।

কারাদ্বারের বাইরে থেকে দেখলে, হাতের রক্তাক্ত কৃপাণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাগলের মতো সশব্দে হেসে উঠলো সত্যবতী। দেখলে, উন্মাদিনী রাজকুমারীর ছু'চোখ বেয়ে অশ্রুর মালা ঝরে পড়ছে।

নিজের মনেই যেন সত্যবতী বললে, তোমার বীরত্বকে আমি ভালোবেসেছিলাম শোভা সিংহ, যে হিন্দুধর্মের ধ্বজা ওড়াতে চেয়েছিলে তুমি, সেই ধর্মকে আমি ভালোবেসেছিলাম। গোপন মনে প্রেমের আসন দিয়েছিলাম তোমাকে···কিন্তু তুমি এতো ক্ষুদ্র? এতো হীন তুমি? পঙ্ককীটের মতো এমন নীচ তুমি?

সশব্দে আবার হেসে উঠলো সত্যবতী। পাগলিনীর মতো। সমগ্র নিঃশব্দ প্রাসাদ কেঁপে কেঁপে উঠলো তার হাসিতে। তারপর রক্তাক্ত কৃপাণটা সজোরে বসিয়ে দিলো সে নিজের বুকে।

শোভা সিংহের মৃতদেহের পাশে লুটিয়ে পড়লো পরমাসুন্দরী সত্যবতীর রক্তাক্ত দেহ।

উনিশ

গুজব এসে পৌঁছলো চিতোয়া-বরদার দুর্গপ্রাসাদে।

অধিনায়ক শোভা সিংহের মৃত্যুর খবর শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো দুর্গরক্ষী আর পাইক বরকন্দাজের দল। সংবাদের পিছনে পিছনে এলো মিথ্যা আশঙ্কার গুজব।

প্রধান রক্ষীর কাছ থেকে শুনলো সুরঞ্জাক্ষী, সুরঞ্জাক্ষীর কাছ থেকে চন্দ্রপ্রভা। মৃত্যু হয়েছে শোভা সিংহের, পরাজিত হয়েছে বিদ্রোহীরা। আর সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নির্দেশে নাকি দশ সহস্র সৈন্য এগিয়ে আসছে মেদিনীপুরের দিকে।

সুরঞ্জাক্ষী ভীত শঙ্কিত চোখে তাকালো চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে। না, সে-মুখে ভয় নেই, আশঙ্কা নেই। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার চোখের অশ্রুও কি শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে? পিতার মৃত্যুর খবর কিভাবে চন্দ্রপ্রভার কাছে প্রকাশ করবে ভেবে পায়নি সুরঞ্জাক্ষী। ভয় ছিলো, সে-খবর শুনে হয়তো কন্নায় ভেঙে পড়বে চন্দ্রপ্রভা, জ্ঞান হারাবে শোকে দুঃখে।

কিন্তু এতোটুকু বিচলিত বোধ করলো না চন্দ্রপ্রভা। বললে, ভয় নেই সুরঞ্জাক্ষী, ইব্রাহিম খাঁকে আমার ভয় নেই। আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধ!

বিস্মিত চোখ তুলে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকালো সুরঞ্জাক্ষী। বলে কী চন্দ্রপ্রভা! গোপনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে অপেক্ষা করবে ইব্রাহিম খাঁর জন্যে? সুবেদারের বিপুল সৈন্য-সংখ্যার সামনে কি দাঁড়াতে পারবে দুর্গরক্ষীরা?

সুরঞ্জাক্ষীর মনের প্রশ্ন যেন বুঝতে পারলো চন্দ্রপ্রভা।

বললে, যুদ্ধসাজেই সাজতে হবে আজ। অপেক্ষা করতে হবে ইব্রাহিম খাঁর জন্যে। কিন্তু তার আগে···

অনামিকা থেকে অঙ্গুরীয় খুলে সুরঞ্জাক্ষীর চোখের সামনে মেলে ধরলো। মৃদু হাসলো তার চোখে চোখ রেখে।

শঙ্কিত হয়ে উঠলো সুরঞ্জাক্ষী।—আত্মহত্যা!

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বললে, না, যুদ্ধ! যুদ্ধে আমরাই জয়ী হবো সুরঞ্জাক্ষী, এই আমার রক্ষাকবচ সব বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

রক্ষাকবচ ?

মনে পড়লো সুরঞ্জাক্ষীর। বিষ্ণুপুর-যুবরাজ রঘুনাথের অভিজ্ঞান। যে-কোনো বিপদে-আপদে স্মরণ করলেই ছুটে আসবেন তিনি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই গোপন অভিসারলগ্নে। সেই প্রণয়াস্পদ যুবরাজ আজ বিষ্ণুপুররাজ।

সুরঞ্জাক্ষীকে তখনো দুর্বোধ্য বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে চন্দ্রপ্রভা বললে, চলো, পারাবত-কক্ষে যেতে হবে এখনই।

সংক্ষেপে বিপদের কথা জানিয়ে বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের উদ্দেশে চিঠি লিখে চন্দ্রপ্রভা এসে দাঁড়ালো পারাবত-কক্ষে।

দেশে বিদেশে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ পাঠাবার জন্যে শত শত শিক্ষিত পারাবতের কক্ষ! খুঁজে খুজে বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদের জন্যে নির্দিষ্ট পারাবতটিকে বের করে স্নেহের স্পর্শে তাকে বুকে চেপে বেরিয়ে এলো চন্দ্রপ্রভা। চিঠি আর অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় বেঁধে দিলো তার পায়ে।

তারপর ধীরে ধীরে প্রসাদের শীর্ষে উঠে এলো চন্দ্রপ্রভা। নীল নির্মেঘ আকাশের গায়ে উড়িয়ে দিলো তাকে।

দুর্গের চারিপাশে কয়েকবার চক্র দিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে উড়ে গেলো সংবাদবাহী পারাবত। একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা, তাকিয়ে রইলো সুরঞ্জাক্ষী। দূরে, দূরে, ক্রমশ মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেলো একটি শ্বেতবিন্দু। নির্নিমেষ নয়নে আশার চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা—উদাস বিষণ্ন

দৃষ্টিতে। আর সুরঙ্গাক্ষী দেখলো, চন্দ্রপ্রভার রূপোজ্জ্বল দু'টি চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। আশান্বিত আনন্দের, না বেদনার?

গান, শুধু গান! দুর্জন সিংহের মৃত্যুতে রাজা রঘুনাথ পেয়েছিল রাজভাণ্ডারের অধিকার। মাতার মৃত্যুর পর সব বাধা-নিষেধ সরে গেছে। একদিকে বিরহ যন্ত্রণা, অন্যদিকে শোকের ছায়া। গানের সুরে সব ভুলতে চেয়েছে রঘুনাথ।

বিষ্ণুপুর রাজভবনের মৃদুমন্দ বাতাসে সুর কেঁপে কেঁপে যায়। সেতারের তারে কখনো কান্নার আর্তনাদ, কখনো উচ্ছল আনন্দের রেশ বাজে।

কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ আর গণ্টনবাঁধের নিস্তব্ধ কালোজলের পরিবেষ্টনে রঘুনাথের সঙ্গীতসৌধ যেন এক কল্পরাজ্যের মায়া সৃজন করে থমকে আছে।

তম্বুরার তারে বিভোর হয়ে যায় বাহাদুর খাঁ। কখনো বা মৃদঙ্গে মৃদু মধুর বোল ফোটে পীর বক্সের অঙ্গুলিস্পর্শে। আর রঘুনাথ? না, বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীশ্বর নয়। শৌর্যের সম্পদের উত্তরাধিকারী নয় যেন। কিশোর কৃষ্ণমোহনের মতোই এক সঙ্গীত-সাধক। সঙ্গীতই যেন তার প্রাণের স্পন্দন।

রাজসিক বিশ্রাম আর আনন্দের মধুস্নিগ্ধ আসর নয়—সাধনা। বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীতের কেন্দ্রভূমি করে তুলতে না পারলে যেন শান্তি নেই। চোখের সামনে কিশোর কৃষ্ণমোহন তিলে তিলে যৌবনের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, দেখতে পায় রঘুনাথ। আর দিব্য-চক্ষে যেন দেখতে পায়, বিষ্ণুপুরের সাধনা সার্থক করে তুলেছে এই তরুণ সঙ্গীতরথী।

রাজকার্য ভুলে সঙ্গীতভবনে ছুটে আসে রঘুনাথ। মৃত্যুপূর্বের মুহূর্তে রানীমা তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে রঘুনাথের হাতে তুলে দিয়ে

বলেছিলেন, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম রঘুনাথ।

আর রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করেছিল, অনুজকে পালন করবে সে সন্তানস্নেহে। কিন্তু গানের নেশায় তাকেও তুলে দিলো সে বৃত্তিভোগী দাসদাসীদের হাতে। হায়, রঘুনাথ যদি বুঝতে পারতো এই গোপালকে ঘিরেই একদিন বিষ্ণুপুরের বাতাস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হবে!

এদিকে গান, শুধু গান। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে বলে, চক্রবর্তীকে তালিম দিন ওস্তাদজী। যেন হিন্দুস্থানে বিষ্ণুপুর বিখ্যাত হতে পারে তার গানের জলুসে।

গদাধরকে বলে, সুরকে আয়ত্তে আনাই তোমার একমাত্র আদর্শ নয় চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুর তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, সারা ভারতবর্ষ তোমার কাছে এক নতুন ঘরোয়ানা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গদাধর। এ কি মিথ্যা স্বপ্ন দেখছেন রঘুনাথ। না, সে দেবদত্ত কণ্ঠস্বর নেই তার। নিজে বড়ো হবার স্বপ্ন দেখে না গদাধর; স্বপ্ন দেখে কবে কৃষ্ণমোহন ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠবে। গদাধর জানে, ওস্তাদজীর কাছ থেকে সে পেয়েছে শুধু জ্ঞান, কৃষ্ণমোহনের আছে প্রতিভা।

কৃষ্ণমোহনের মনেও বুঝি এই একই স্বপ্ন, একই আশা। কে জানতো, সঙ্গীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক অপার্থিব আনন্দ, এমন স্বর্গীয় পুলক!

তৃপ্তির হাসি হাসে রঘুনাথ। কৃষ্ণমোহনের সিদ্ধি যেন রঘুনাথেরই সিদ্ধি!

রঘুনাথ নৌকাবিহারে টেনে নিয়ে যায় কৃষ্ণমোহনকে। যমুনা-বাঁধের তরঙ্গে তরঙ্গে গানের জোয়ার আসে। ময়ূরপঙ্খী নৌকার পাটাতনে নরম গালিচায় শরীর এলিয়ে বসে রঘুনাথ আর বাহাদুর খাঁ। কৃষ্ণমোহনের হাতে কখনো রবাব, কখনো সুরশৃঙ্গার। সেতার, সুরবাহার, দিলরুবা, পাখোয়াজ আর তবলার মৃদু মৃদু ধ্বনি।

গানের অরমাঁ আর আসাওরির দরিয়ায় তন্ময় হয়ে ডুবে যায় সকলে।

সেদিনও এমনি এক মোহাবেশে মুগ্ধ হয়ে নৌকাবিহার করছিলো রঘুনাথ। জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত্রি। যমুনাবাঁধের জলে, রাজপ্রাসাদের ওপর চন্দ্রালোকের আলোকবিচ্ছুরণ। আর বাতাসে মৃদঙ্গের বোল।

তন্ময় হয়ে পীর বক্সের মৃদঙ্গ শুনছিলো রঘুনাথ, রাতের আকাশের দুগ্ধফেনিল বীথিপথের দিকে চোখ রেখে।

হঠাৎ তন্ময়তা ঘুচে গেলো। দেখলে, একটি শ্বেত পারাবত উড়ে এলো প্রাসাদের দিকে, উড়ে এসে চক্র দিতে শুরু করলো প্রাসাদ-শীর্ষকে কেন্দ্র করে।

সংবাদবাহী পারাবত! রঘুনাথ বুঝতে পারলো। তবু, উদ্‌গ্রীব হলো না সংবাদ জানবার জন্যে।

মুখ্য অমাত্যের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে গানের সুরেই বুঝি তন্ময় হয়ে থাকতে চায় রঘুনাথ।

কিন্তু তন্ময়ভাব কেটে গেলো। রঘুনাথের চোখের সামনেই পারাবতটি চক্র দিতে দিতে প্রাসাদের নির্দিষ্ট কক্ষে নেমে এলো। আর ক্ষণপরেই একজন রক্ষী ছুটে এলো ঘাটের দিকে।

রঘুনাথ বুঝতে পারলো, কোনো জরুরী খবর এসে পৌঁছেছে। ঘাটে নৌকা ভিড়োবার আদেশ দিলো রঘুনাথ।

রক্ষী সসম্মানে অভিবাদন করে রঘুনাথের হাতে তুলে দিলো চন্দ্রপ্রভার চিঠি। বিষ্ণুপুরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়।

চন্দ্রপ্রভার চিঠি। চন্দ্রপ্রভার আহ্বান।

বিচলিত হয়ে উঠলো রঘুনাথ। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই লাজনম্র অভিসারিণীর সুন্দর মুখখানি।

প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লো রঘুনাথের। মনে পড়লো, উপযাচিকা চন্দ্রপ্রভার প্রেমের যোগ্য প্রতিদান দেবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলো সে।

বিস্মিত হলো রঘুনাথ। সঙ্গীত কি প্রেমের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ? গানের নেশা কি মনের নেশাকেও ভুলিয়ে রাখে?

কতো বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্নে ভেসে উঠেছে চন্দ্রপ্রভার রূপ, মানস রোমন্থনে কতো না প্রণয়গভীর কাহিনী বুনেছে রঘুনাথ। তারপর ধীরে ধীরে কখন নিজেরই অজান্তে চন্দ্রপ্রভাকে মুছে ফেলেছে মন থেকে। অথচ যৌবন-সন্ধিক্ষণে একদিন যে-কোনো বিপদে-আপদে চন্দ্রপ্রভাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

চন্দ্রপ্রভার আত্মসমর্পণের সেই বিস্মৃত মুহূর্তের কয়েকটি ছবি যেন আবার নতুন করে ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

কুড়ি

শোভা সিংহের মৃত্যুর খবর পেয়ে নবাবী সৈন্যের চিতোয়া-বরদা আক্রমণের গুজবে বিশ্বাস করেছিলো চন্দ্রপ্রভা। অথচ শোভা সিংহের মৃত্যুসংবাদও গিয়ে পৌঁছলো না ইব্রাহিম খাঁর দরবারে।

জগৎরামের কাছে বিদ্রোহের খবর শুনেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে সাকিনা বেগমের হামাম-ই-গুলাবে গিয়ে দরজার বাইরে থেকেই ইব্রাহিম খাঁ ডাকলে, সাকিনা, পিয়ারী!

ইব্রাহিম খাঁ দরবারে গিয়েছে শুনেই অসতর্ক ছিলো সাকিনা, জাফর খাঁ। ডাক শুনে বিভ্রান্তের মতো পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো। আখরোট কাঠে ঢাকা জলশূন্য শ্বেতপাথরের জলাধারের দিকে ইশারা করলে সাকিনা।

শিউরে উঠলো জাফর খাঁ। চকিতে মনে পড়লো নবাবের অঙ্গুলি নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে ফুটন্ত জল এসে পড়তে পারে ঐ জলাধারে।

জাফর খাঁ মাথা নেড়ে বললে, না সাকিনা, কাপুরুষের মতো মৃত্যু বরণ করতে পারবো না।

জাফর খাঁর মনের চোখে হয়তো একটি পুরানো দিনের দৃশ্য ভেসে উঠলো। হয়তো সে-কাহিনী সত্য নয়, হয়তো কিংবদন্তী মাত্র। শাজাহান-কন্যা জাহানারা বেগমসাহেবার কক্ষেও এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন শাহ্ আলম। হয়তো কন্যার গুপ্ত প্রণয়ের খবর তাঁর কানেও পৌঁছেছিলো। হামামের মধ্যে তখন মনসবদার আকেল খাঁ উপস্থিত।

নিরুপায় জাহানারা তাই প্রণয়পাত্রকে একটি তাম্রকটাহে লুকিয়ে রাখলেন। শাজাহান কিন্তু কক্ষে ঢুকেই বুঝতে পারলেন কন্যার

প্রেমাস্পদ কোথায় লুকিয়ে আছে। তবে মুখে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্নান করোনি জাহানারা ?

জাহানারা উত্তর দিলে, না।

হাসলেন শাজাহান, তারপর বাঁদীদের নির্দেশ দিলেন জল গরম করার জন্যে। উষ্ণজলে শাহজাদী স্নান করবেন।

চোখের সামনে আগুন জ্বলে উঠলো বিরাটাকৃতি তাম্রপাত্রের নীচে, ফুটন্ত জলের নৃশংসতায় নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করলো আকেল খাঁ।

মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী শাজাহানকে সেবা আর যত্ন দিয়ে জাহানারা তার চরিত্রের মহত্ব প্রমাণ করে গেছে, প্রমাণ করেছে এ-অপবাদ মিথ্যা, কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু পরিণতির সম্ভাবনাকে মুছে ফেলতে পারেনি জাফর খাঁ মন থেকে। এমন অগৌরবের মৃত্যু বরণ করতে চায় না তুরানী মনসবদার।

কটিবন্ধ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে জাফর খাঁ বললে, সাকিনা, মৃত্যু যদি হয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা করেই মৃত্যুবরণ করবো।

বিস্মিত-চোখে জাফর খাঁর মুখের দিকে তাকালো সাকিনা।

এদিকে সাকিনার উত্তর বা অনুমতি না পেয়ে পর্দার ওপার থেকে ভীতত্রস্ত ইব্রাহিম খাঁ আবার ডাকতে যাচ্ছিলো, আর সেই মুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠলো সাকিনা।

সশস্ত্র খোজারা ছুটে এলো, বাঁদীরা ছুটে এলো। আর ইব্রাহিম খাঁ পর্দা সরিয়ে সাকিনা বেগমের স্নানাগারে ঢুকে পড়লো। খোজাদের ডাকলো চিৎকার করে। দেখলো, হাতে মুক্ত তরবারি নিয়ে বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে একজন তুরানী মনসবদার, আর সাকিনা আর্তনাদ করছে।

খোজারা ছুটে এসে শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললো জাফর খাঁকে।

বিমূঢ় বিভ্রান্ত জাফর খাঁ তখনও দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সাকিনার দিকে।

ইব্রাহিম খাঁ প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে সাকিনা ? কি হয়েছে?

ভয়ভীরু চোখ তুলে তাকিয়েই ইব্রাহিম খাঁকে এসে জড়িয়ে ধরলো সাকিনা। কাঁপতে কাঁপতে বললে, হামামে এই লম্পট মনসবদারটা লুকিয়ে ছিলো নবাব বাহাদুর। তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে আমার ইজ্জত নষ্ট করতে এসেছিলো···

অগ্নিবর্ষী চোখে জাফর খাঁর মুখের দিকে তাকালো ইব্রাহিম খাঁ। তারপর খোজাদের ইশারা করলে। খোজারা সরিয়ে নিয়ে গেলো জাফর খাঁকে। সাকিনা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ওকে কোতল করার হুকুম দিন নবাব বাহাদুর, কোতল করুন বেয়াদবকে।

ইব্রাহিম খাঁ খোজাদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় বললে, হ্যাঁ, কোতল!

হাতের তালি বাজিয়ে বাঁদীদের বিদায় নিতে বললে ইব্রাহিম খাঁ। তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু বেতমিজ্ লোকটা মহলসরায় ঢুকলো কি করে?

সাকিনা কপট উষ্মা প্রকাশ করে বললে, এ নিশ্চয় বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগমের কাজ, আমাকে অপমান করার জন্যে। নুরুল্লা খাঁর সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে বেগমসাহেবা, তাই···

—নুরুল্লা? আমার বিরুদ্ধে? বিচলিত হলো ইব্রাহিম খাঁ।

সাকিনা উত্তর দিলে, হ্যাঁ জাহাঁপনা, আপনার বিরুদ্ধে।

—তা হলে, তা হলে বিদ্রোহ দমন করতে যাবে কে?

—বিদ্রোহ?

ইব্রাহিম খাঁ বললে, হ্যাঁ সাকিনা, বিদ্রোহীরা হুগলী পর্যন্ত অধিকার করে ঢাকা আক্রমণ করতে আসছে।

সাকিনা বেগম বললে, নুরুল্লা খাঁকেই পাঠিয়ে দিন জাহাঁপনা। যদি বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ফিরে আসে তখন শাস্তি দেবেন তার চক্রান্তের, আর যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়···

—তাই ভালো সাকিনা, তাই ভালো। খুশী হয়ে উঠলো ইব্রাহিম খাঁ।

বেগমসাহেবা দিল্‌রসের সব চক্রান্ত বুঝি ব্যর্থ হলো। আপন প্রণয়পাত্রকে এ-ভাবে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে নবাবের বিশ্বাস অর্জন করবে সাকিনা, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি দিল্‌রস।

স্পষ্ট বুঝতে পারলে, নুরুল্লা খাঁকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চায় সাকিনা। হয়তো বা গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই নুরুল্লাকে হত্যা করতে চায়।

তাই ইব্রাহিম খাঁর সুরাসক্ত দুর্বল মুহূর্তে আরজি পেশ করলো দিল্‌রস। বললে, বাদশাহর সক্ষম পুত্র জবরদস্ত্ খাঁ থাকতে বিদ্রোহ দমনের ভার নুরুল্লার ওপর দেওয়া কি উচিত?

ইব্রাহিম খাঁ তখন অসন্তুষ্ট হয়ে আছে বেগমসাহেবার ওপর। বললে, জবরদস্ত্ নালায়েক এখন, সে যাবে বিদ্রোহ দমনে?

দিল্‌রস মৃদু হেসে বললে, বিদ্রোহ আপনা থেকেই শান্ত হবে বাদশাহ, কিন্তু তার গৌরব পাবে নুরুল্লা! আলমগীরের কাছে কি সে-খবর পৌঁছবে না? আপনি কি জবরদস্তের বদলে ভবিষ্যতে বাংলার নবাবের মর্যাদা দিতে চান নুরুল্লা খাঁকে?

ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু বিচলিত হলো না এ কূট যুক্তিতে।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো দিল্‌রস বেগমের।

শেষে জবরদস্ত্ খাঁকেই পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো দিল্‌রস। বললে, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার পিতার হাতেই নষ্ট হতে চলেছে জবরদস্ত্।

—উপায়? জবরদস্ত্ সপ্রশ্নে তাকালো বেগমসাহেবার দিকে।

বেগমসাহেবা কুটিল হাসি হেসে বললে, উপায় আছে। আমার উপদেশ শুনে কাজ করলে কোনোদিন ঠকতে হবে না জবরদস্ত্, বাংলার মসনদ হাতছাড়া হবে না ভবিষ্যতে। কিন্তু…

—কিন্তু?

বেগমসাহেবা হেসে বললে, আমি তোমার সঙ্গে কোনোদিন বঞ্চনা করিনি জবরদস্ত্, বঞ্চিত হতেও চাই না তোমার কাছে। যদি

জুলেখাকে তুমি বিবাহ করতে রাজী হও তা হলে আমার জামাতাকে আমিই নবাবী তক্তে বসিয়ে যাবো।

ঈষৎ লজ্জা প্রকাশ করে জবরদস্ত্ বললে, আপনার উপদেশকে আমি আদেশ বলে মনে করবো। আর, জুলেখাকে যদি দান করেন, তা হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো আমি।

দিলূরস খুশী হয়ে উঠলো। বললে, তা হলে আজই সমস্ত অবস্থা জানিয়ে আলমগীরের কাছে চিঠি পাঠাও। বিদ্রোহ দমনে যাবার জন্যে আলমগীরের অনুমতি প্রার্থনা করো। হ্যাঁ, জানাতে ভুলো না যে, বাংলার মসনদ যখন বিদ্রোহীদের নাগালে এসে গেছে তখনও তোমাকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজী নন নবাব বাহাদুর।

ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু জানতে পারলো না অন্দর-মহলের চক্রান্তে তার পুত্র তারই বিরুদ্ধে নালিশ পাঠাচ্ছে আলমগীরের কাছে।

সাকিনা বেগমের পরামর্শে ফৌজদার নুরুল্লা খাঁর নামে পরোয়ানা জারি করেই নিশ্চিন্ত হলো বাংলার নবাব।

এদিকে যশোহরের বিলাসকক্ষে তন্দ্রাচ্ছন্ন নুরুল্লার মোহ ঘুচে গেলো নবাবের পরোয়ানা পেয়ে। যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত ফৌজদার নুরুল্লা! মনসবদারের মন তখন সওদার দিকে। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে গোপন ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঐশ্বর্যের বিলাসব্যসনে তখন সব বীরত্ব বিসর্জন দিয়ে বসে আছে নুরুল্লা। যুদ্ধই যার ধর্ম, অর্থের পিছনে ছুটে চলেছে সে। ধনরত্নের কামনায় আহুতি দিয়েছে যুদ্ধবিদ্যা।

নেশা ছুটে গেলো নুরুল্লা খাঁর। মসলিনের ব্যবসায়ীকে যেতে হবে ফৌজের অধিনায়ক হয়ে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে।

যুদ্ধের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হলো তার। অথচ উপায় নেই, সুবেদারের হুকুম। পরোয়ানা অমান্য করলে হয়তো আওরঙ্গজেবের দরবারেও গিয়ে পৌঁছবে তার অকর্মণ্যতার খবর।

অর্থের বিনিময়ে অন্য কোনো মনসবদারকে পাঠান যায় কিনা খোঁজ করলে নুরুল্লা খাঁ। কিন্তু সাহস হলো না।

শেষে নিজেই কিছু নবাবী ফৌজ নিয়ে যাত্রা করলো হুগলীর দিকে। মাঝ-পথেই শুনলো, রহিম খাঁ শাহ উপাধি নিয়ে নিজেকে বাংলার বাদশাহ বলে জাহির করেছে। সসৈন্যে নাকি এগিয়ে আসছে নবাবী ফৌজকে ধ্বংস করবার জন্যে।

রহিম খাঁর সৈন্য-সংখ্যা তখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একদিকে আলমগীরের ওপর অসন্তুষ্ট হিন্দু প্রজার দল—অন্যদিকে অর্থলোভী দরিদ্র গ্রামীণ। সকলেই যোগ দিচ্ছে রহিম খাঁর সৈন্যদলে। স্বয়ং আলমগীরও নাকি তার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাবে না।

গুজব শুনেই দ্রুত চুঁচুড়ার দিকে সসৈন্যে পালিয়ে গেলো নুরুল্লা খাঁ। আশ্রয় নিলো ওলন্দাজদের দুর্গে। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। নিশীথের অন্ধকারে গোপনে দুর্গ থেকে বেরিয়ে সাধারণ বেশে যশোহরে পালিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে রহিম খাঁ দুর্গ অবরোধ করলো। নবাবী ফৌজ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো নুরুল্লা খাঁকে। অনুসন্ধান ব্যর্থ হলো তাদের। বুঝতে পারলো, নুরুল্লা খাঁ প্রাণভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছে।

অন্ধ আক্রোশে ফৌজদারের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো তারা। দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো তারা রহিম খাঁর কাছে। নবাবী সৈন্যের গ্লানিময় পরাজয় উচ্ছৃঙ্খল করে তুললো রহিম খাঁর সৈন্যদের। শুরু হলো লুণ্ঠন, অত্যাচার, অবিচার। হুগলী থেকে আবার এগিয়ে চললো রহিম খাঁ—মুখসুদাবাদের দিকে, রাজমহলের দিকে। ইব্রাহিম খাঁ দেখলে, আর উপায় নেই। জরুরী খবর পাঠালো আওরঙ্গজেবের কাছে।

আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে। জবরদস্ত্ খাঁর অনুযোগকে অসার মনে করে চুপ করে ছিলেন আওরঙ্গজেব। ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে খবর পেয়েই আদেশ পাঠালেন, জবরদস্ত্ খাঁকে অধিনায়ক করে

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাও। কিন্তু জবরদস্ত্ খাঁর ওপরও আস্থা রাখতে পারলেন না তিনি। পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাংলা ও বিহারের শাসন কর্তৃত্বের ভার দিয়ে সৈন্য পাঠালেন। বিহারে এসে পৌঁছলো আজিমুশ্বান। সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে করতেই খবর এলো, জবরদস্ত্ বিদ্রোহীদের বর্ধমান পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছে।

প্রমাদ গণলো আজিমুশ্বান। বিদ্রোহদমনের সব গৌরব বুঝি জবরদস্ত্ খাঁ পেয়ে যায়। শাহজাদা সুলতান আজিমুশ্বান শঙ্কিত হয়ে উঠলো নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে। হয়তো বাদশাহ বিরক্ত হয়ে জবরদস্ত্ খাঁকেই সুবাদার নিযুক্ত করবেন, আশঙ্কা হলো শাহজাদার।

বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ অপসরণের খবর গোপন রেখে যুদ্ধযাত্রার ভান করে এগিয়ে গেলো আজিমুশ্বান। এমন এক অভিনয় করলো যেন শাহজাদা নিজেই বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়েছে।

জবরদস্ত্ ক্ষুব্ধ হলো আজিমুশ্বানের ব্যবহারে।

দিল্‌রস বেগমকে বললে, উপায় বাতলে দিন বেগমসাহেবা।

বেগমসাহেবাও উষ্মা প্রকাশ করলো। বললে, আলমগীরের কাছে গিয়ে সব খবর জানিয়ে এসো জবরদস্ত্।

ইব্রাহিম খাঁ আর জবরদস্ত্ ছুটলো দাক্ষিণাত্যের পথে! আর রহিম খাঁ সে-সংবাদ পেয়েই আবার বর্ধমানে সৈন্য মোতায়েন করে অপেক্ষা করলো আজিমুশ্বানের জন্যে।

গজেন্দ্রগমনে বিলাসী শাহজাদা এসে পৌঁছলো, শিবির স্থাপন করলো বর্ধমানে। তারপর রাজসিক গর্বে শৃঙ্খল আর তরবারি পাঠালে রহিম খাঁর শিবিরে।

রহিম খাঁ তরবারি তুলে নিয়ে দূতমুখে উপদেশ দিলো সন্ধি করার জন্যে। স্মরণ করিয়ে দিলো রাজ্যলোভে শাজাহানের পুত্রদের গৃহ-বিবাদের কথা। জানালে, আফগান রহিম খাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করাই বিচক্ষণতা। এই সৌহার্দ্যের ফলে হয়তো আওরঙ্গজেবের পর আজিমুশ্বানই শাহ্ আলম হতে পারবে।

সন্ধিপত্রের আলোচনার জন্যে শাহজাদার মন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে আহ্বান জানালে রহিম খাঁ।

এমন সময় খবর এসে পৌঁছলো মেদিনীপুর আক্রমণ করতে পারেন বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ। সামনে এবং পিছনে হু'দিকেই শত্রু।

রহিম খাঁ ডাকলে, সুলেমান!

হাবশী দৈত্যটা এসে দাঁড়ালো তাঁবুর পর্দা তুলে। কুর্নিশ করে বললে, হুকুম বাদশাহ?

রহিম খাঁ চিতোয়া-বরদার হুর্গ আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে বললে, রাজনগরে এখনই কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। যে-কোনো উপায়ে লালবাঈকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

—আমার ইনাম বাদশাহ! আবার কুর্নিশ করে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো হাবশীটা, তারপর কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে রহিম খাঁর সামনে হাত বাড়িয়ে দিলো।

—পাবে ইনাম, পাবে। সারা বাংলার ফৌজদার হবে তুমি। সান্ত্বনা দিলে রহিম খাঁ।

আর হঠাৎ সে-কথা শুনে অট্টহাসে হেসে উঠলো সুলেমান। নিজের বুকে একটা আঙুল ঠুকে প্রশ্ন করলে, আমি ফৌজদার? আর আপনি বাদশাহ? সশব্দে আবার হেসে উঠলো সুলেমান।

তারপর বললে, ও ইনাম চাই না বাদশাহ, লালবাঈ আমার ইনাম।

—বেয়াদবের মতো কথা বোলো না সুলেমান। ধমক দিলো রহিম খাঁ। বললে, লালবাঈ আমার বেগম, বাদশাহর বেগমকে ইনাম চাও তুমি!

—বাদশাহ! বিদ্রূপের স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করলে সুলেমান। তারপর বেরিয়ে এসেই লাফ দিয়ে উঠলো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো পরমুহূর্তে।

একুশ

সংবাদবাহী পারাবত নিয়ে এলো চন্দ্রপ্রভার আহ্বান। বিদ্রোহী শোভা সিংহের মৃত্যু হয়েছে, নবাব-সৈন্য নাকি এগিয়ে আসছে চিতোয়া-বরদা অধিকার করে রূপময়ী চন্দ্রপ্রভাকে বন্দিনী করবার জন্যে। ইব্রাহিম খাঁর যে তাঞ্জাম ফিরিয়ে দিয়েছিলো সে পদাঘাত করে, সেই তাঞ্জামই বুঝি যাত্রা করেছে কুমারী কন্যার রূপযৌবনে নবাবের মহলসরার শোভা বাড়াবার বাসনায়।

দ্রুত প্রাসাদে ফিরে এলো রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভার চিঠি পেয়ে।

রক্ষীকে বললে, শহরতকে খবর দাও, আর দেওয়ানজীকে।

দু'শো নাওয়ারা সুসজ্জিত হলো। পদাতিক আর নাওয়ারা সৈনিকের রণতরী একদিকে, আরেকদিকে এক সহস্র অশ্বারোহী।

সঙ্গীত-সাধক নয়, মল্লবংশের বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ। তানপুরা ফেলে দিয়ে তলোয়ার তুলে নিলো সত্যাশ্রয়ী রঘুনাথ।

কিশোর কৃষ্ণমোহনকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, রাজার কর্তব্য পালন করতে চললাম বন্ধু, তোমার কর্তব্য তুমি ভুলো না। সঙ্গীতকে ফিরিয়ে আনতে হবে, শুধু শৌর্য নয়, সুরের যুদ্ধেও জয়লাভ করতে হবে।

কৃষ্ণমোহন বিনয়-সহাস্যে বললে, শুধু সঙ্গীত-সরস্বতীই নয়, লক্ষ্মীরূপিণী চন্দ্রপ্রভারও যেন অধিষ্ঠান ঘটে এ-রাজ্যে।

বিদ্যুৎগতিতে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে এগিয়ে চললো রঘুনাথ, রাজনগরের উদ্দেশে, চিতোয়া-বরদার উদ্দেশে।

অন্যদিকে বিড়াই আর কংসবতীর ওপর দিয়ে মেদিনীপুরকে পরিবেষ্টন করে চললো সুদক্ষ নাওয়ারা সৈন্য।

বাংলার গ্রামীণ প্রজারা বাধা দিলো না। অবনত মস্তকে প্রভুত্ব

মেনে নিলো রঘুনাথের। গ্রামের পর গ্রাম পদানত হলো বিষ্ণুপুর-রাজের।

রহিম খাঁকেও বাধা দেয়নি তারা একদিন।

যুদ্ধ চায় না গ্রামবাসীরা, চায় শান্তি, চায় শৃঙ্খলা।

দিল্লীর প্রাসাদে কিংবা আগ্রার দুর্গে কি পরিবর্তন ঘটলো জানতে চায় না তারা। বাংলার নবাবী মসনদের পরিবর্তন অনুভব করে না। দারিদ্র্য আর অত্যাচার তাদের চিরসঙ্গী। গ্রাম্য রাজপ্রতিনিধির হাতে রাজস্ব তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চায়। জানে, রাজসিংহাসনে যারই অধিষ্ঠান ঘটুক প্রজাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন হবে না।

শোভা সিংহের স্বাধীনতার জয়ধ্বনিতে উল্লাস দেখা দিয়েছিলো তাদের মনে। আনন্দ দেখা দিয়েছিলো! শোভা সিংহের জয়ধ্বনিকে ভেবেছিলো হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি। হিন্দুধর্মের বিজয়বার্তাকে ভেবেছিলো স্বাধীনতার বার্তা।

সে ভুল ভেঙেছে তাদের। বুঝেছে, এ-বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগসূত্র নেই। এ শুধুই স্বাধীনতার মোহ। প্রচণ্ড এক বিভ্রান্তি!

রাজনগরের দুর্গরক্ষীরাও কোনো বাধা দিলো না। শোভা সিংহের মৃত্যু-সংবাদে সাহস হারিয়েছিলো তারা। অপেক্ষা করছিলো নবাবী সৈন্যের। যুদ্ধ নয়, আত্মসমর্পণের জন্যেই যেন প্রস্তুত হয়ে ছিলো। রঘুনাথের আকস্মিক আক্রমণে তাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো তারা। অক্লেশে চিতোয়া-বরদা অধিকার করলো রঘুনাথ।

বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে তখন আসন্ন যুদ্ধের অপেক্ষায় থমকে আছে উভয় পক্ষের সৈন্য। খরস্রোতা দামোদরের একদিকে আজিমুশ্বানের তাঁবুর সারি, অন্য তীরে আম্রকুঞ্জের আড়ালে রহিম খাঁর সৈন্য-শিবির।

হু'পক্ষই কর্মব্যস্ত, হু'জনেই সতর্ক দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে গোপনে ব্যূহ রচনা করে চলেছে।

আজিমুশ্বানের সেনাপতি খাজা আনোয়ার বিচক্ষণ রণনায়ক। সময়ের মূল্য বোঝে সে।

তাই আজিমুশ্বানকে বললে, এ-ভাবে অপেক্ষা করলে বিদ্রোহীরা শক্তিসঞ্চয় করার সুযোগ পাবে শাহজাদা। নাওয়ারা ভাসিয়ে দামোদর পার হবার হুকুম দিন শাহজাদা, বিদ্রোহীদের এই দুর্বল মুহূর্তেই আক্রমণ করা উচিত।

আজিমুশ্বান বললে, কিন্তু তার আগে রহিম খাঁর সন্ধির শর্তগুলো জেনে নেওয়া ভালো আনোয়ার।

সন্ধির শর্ত! হাসলো খাজা আনোয়ার। যুদ্ধজয়ের মুহূর্তে কিনা সন্ধির শর্ত জানতে হবে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে! আজিমুশ্বানের আদর্শের অর্থ বুঝতে পারলো না আনোয়ার।

কিন্তু আজিমুশ্বানের মনে তখন দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। রহিম খাঁ দূতমুখে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রাজ্যলোভে শাজাহান-পুত্রদের বিবাদের কথা। বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে এই বিবাদ পুনরায় দেখা দেবে, সাম্রাজ্যের লোভে নৃশংস হয়ে উঠবে উত্তরাধিকারীর দল।

সুতরাং রহিম খাঁর বন্ধুত্বকে অস্বীকার করা হয়তো উচিত হবে না।

জবরদস্ত্ আর ইব্রাহিম খাঁ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে দাক্ষিণাত্যে দরবার করতে গেছে আলমগীরের কাছে। আজিমুশ্বানের মিথ্যা আড়ম্বরের কথা জানতে পারবেন আওরঙ্গজেব, জানতে পারবেন বিদ্রোহ দমনের কৃতিত্ব তাঁর পৌত্রের নয়, ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্তের।

হয়তো আজিমুশ্বানকে অপসৃত করে বাংলা বিহারের শাসন-কর্তৃত্বের ভার জবরদস্তের হাতেই তুলে দেবেন তিনি।

দুর্দিনের আশঙ্কায় রহিম খাঁকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো আজিমুশ্বান।

বললে, যাও আনোয়ার, রহিম খাঁ আমন্ত্রণ জানিয়েছে তোমাকে সন্ধিশর্ত আলোচনা করবার জন্যে।

বিস্মিত চোখ তুলে তাকালো আনোয়ার, তারপর কুর্নিশ করে বললে, শাহজাদার হুকুম অমান্য করার সাহস নেই আমার, কিন্তু এর জন্যে অনুশোচনা করতে হবে আপনাকে।

বলে, সদর্পে বিদায় নিলো আনোয়ার।

অপেক্ষা করে রইলো আজিমুশ্বান।

রহিম খাঁর তাঁবুতে সন্ধির আলোচনা বুঝি শেষ হয় না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সেনাপতি খাজা আনোয়ার কি এখনো আলোচনা করছে রহিম খাঁর শিবিরে?

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলো আজিমুশ্বান।

উৎকণ্ঠায় তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো দ্রুতপায়ে, দেখলে একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তার দিকেই।

অন্ধকারে চিনতে পারলো না অশ্বারোহীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো লোকটির চেহারা। দেখলে, নবাবী সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

শিবিররক্ষী এসে খবর দিলো, বিদ্রোহীদলের একজন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

—কি নাম তার? প্রশ্ন করলে আজিমুশ্বান।

হাবশী সুলেমান এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো ইতিমধ্যে। প্রকৃত নাম গোপন করে বললে, হামিদ খাঁ আমার নাম শাহজাদা, আপনার গোলাম।

এমন সময় গুপ্তচর এসে বললে, দুঃসংবাদ আছে শাহজাদা।

—কি খবর? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে আজিমুশ্বান।

উত্তর এলো, সন্ধির শর্তের আলোচনা করার অভিনয় করে খাজা আনোয়ারকে হত্যা করেছে বিশ্বাসঘাতক রহিম খাঁ।

হতাশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো আজিমুশ্বান। খাজা আনোয়ারকে হত্যা করেছে রহিম খাঁ ?

মনে পড়লো আনোয়ারের সাবধানবাণী। 'শাহজাদার হুকুম অমান্য করার সাহস আমার নেই, কিন্তু এর জন্যে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে শাহজাদা!'

অনুশোচনা নয়, সেনাপতির মৃত্যুতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো আজিমুশ্বান।

শুধু হাবশী সুলেমান বললে, ভয় নেই শাহজাদা, আনোয়ার নেই, কিন্তু আপনার নফর হামিদ খাঁ আছে।

সমগ্র রাঢ়ভূমিতে তখন লুণ্ঠন, অত্যাচার, অরাজকতা। সম্পদশীল বণিক, রাজকর্মচারী আর তালুকদারদের ধনরত্ন এবং জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। হুগলী বর্ধমানের দরিদ্র গ্রামবাসীরা বিদ্রোহের মধ্যে নতুন এক আশার আলো দেখতে পেয়েছে, আস্বাদ পেয়েছে ঐশ্বর্যের। যুগ যুগ ধরে ধনীর বিরুদ্ধে, জমিদার আর তালুকদারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো তা যেন সুযোগ পেয়েছে বনবহ্নির মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার।

বিদেশী কুঠিয়ালরা দেখলে, বাংলার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত! মোগল বাদশাহদের চিরকাল তারা স্তবস্তুতি আর উপহার উপচারে প্রীত করেছে, বিনিময়ে পেয়েছে শুধু বাণিজ্যের অধিকার। কিন্তু এই রত্নপ্রসূ মাটির লোভ জেগে উঠেছে তাদের মনেও। বাণিজ্য নয়, স্বামিত্ব পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে তারাও।

অরাজকতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের কুঠি আর জীবন বাঁচাবার নামে ইংরেজ বণিকরা অস্ত্রশস্ত্র আমদানির অনুমতি লাভ করলো। অস্ত্রের নামে কামান আমদানি হলো, কুঠির নামে গড়ে উঠলো গোপন দুর্গ। জলদস্যুর অত্যাচারে বাধা দেবার নামে আমদানি হয়েছিলো

বিদেশী যুদ্ধজাহাজ, বিদ্রোহীদের বাধা দেবার নামে বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজের সুদৃঢ় দুর্গ। অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করতে শুরু করলো সাম্রাজ্যলোভী বিদেশীরা।

দূরদৃষ্টির অভাবে মোগলসাম্রাজ্য তার নিজের কবর খোঁড়ার অনুমতি দিলো ইংরেজ বণিকদের। ফরাসী, দিনেমার আর ওলন্দাজরা বাড়িয়ে তুললো তাদের নৌবহর।

বাংলার অধিবাসীরা বুঝতে পারলো, এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছে। মোগলের দিন শেষ হতে চলেছে।

সাম্রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বণিকশক্তির। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের যুদ্ধ অনিবার্য। ক্রমে ক্রমে হয়তো বিদেশী বণিকরাই সিংহাসন অধিকার করবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কার চেয়ে বর্তমানের লোভ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো মোগল নবাবদের চোখে। আজিমুশ্বানের চোখেও সেই একই লোভ দেখা দিলো।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই সওয়ানে-নেগারের গোপন পত্রে আজিমুশ্বান জানতে পেরেছিলো, অনুমতির সীমা লঙ্ঘন করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে ইংরেজ আর ফরাসী বণিকরা। তবু সাবধান করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি শাহীফৌজের অধিনায়ক।

বাংলা দেশ তখন সারা পৃথিবীর বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সারি সারি সমুদ্রজাহাজ তখন বাংলার পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে পাশ্চাত্যজগতে, পারস্যে, আরবে, জর্জিয়ায়, আর্মেনিয়ায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। সূক্ষ্মবস্ত্র, গালিচা, নীল, রেশম, আফিং, চাল, আতর, চিনি, বিভিন্ন মসলা, মুক্তা, প্রবাল, তামাক। জাহাজের পর জাহাজ রপ্তানি হতো, বিদেশী বণিকদের মারফত ফিরে আসতো স্বর্ণমুদ্রার রাশি। রাজকোষ ভরে উঠতো বাণিজ্যশুল্কে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় বহন করতে হলে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে আরো বেশি কর আদায় করতে হবে, সুতরাং তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে

আপত্তি জানালে চলবে না। আজিমুশ্বান তার নিজেরই মনকে প্রবোধ দিলে, ইংরেজ আর ফরাসীদের সৈন্য নিয়োগের পিছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই, নিজেদের ধনসম্পদ রক্ষা করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু রহিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত হয়ে পড়লো আজিমুশ্বান। সেনাপতি খাজা আনোয়ারের উপর নির্ভর করে এতোদূর এগিয়ে এসেছে সে। তার নিবুদ্ধিতার জন্যেই রহিম খাঁর হাতে নিহত হয়েছে আনোয়ার।

কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে ইংরেজ আর ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের সাহায্য চেয়ে পাঠালো। কিন্তু কোনো সাহায্যই এসে পৌছলো না।

শুধু সুলেমান বললে, সময় নষ্ট করবেন না শাহজাদা, রহিম খাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করতে হবে এখনই।

আজিমুশ্বান অসহায় চোখ তুলে বললে, কিন্তু নবাবী সৈন্যের যদি পরাজয় ঘটে ধূর্ত রহিম খাঁর কাছে?

সুলেমান বললে, মিথ্যা ভয় শাহজাদা। খবর এসেছে, বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের সৈন্য মেদিনীপুর আক্রমণ করেছে। সম্ভবত আলমগীরের অনুরোধেই রঘুনাথ বিদ্রোহীদের পলায়নের পথ বন্ধ করে আছে, আমাদের পক্ষে এই সুযোগ।

বাধ্য হয়েই শত্রুশিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলো আজিমুশ্বান। অন্ধকার রাত্রিতে দামোদরের শত শত রণতরী থেকে হঠাৎ তোপধ্বনি উঠলো। গোলাবর্ষণ শুরু হলো রহিম খাঁর শিবির লক্ষ্য করে।

রহিম খাঁর শিবির থেকেও কামানের ধ্বনি উঠলো। কয়েকটি রণতরী জ্বলে উঠলো দাউ-দাউ করে। কিন্তু নবাবী সৈন্য তখন রণোন্মত্ত! উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা রহিম খাঁর সৈন্য-শিবিরে।

জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটে চললো রিসালহা সৈন্যের দল। আগুন

আর আর্তনাদ! প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে উভয়পক্ষই খুঁজছে প্রতিপক্ষের নেতাকে।

রহিম খাঁ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে আজিমুশ্বানকে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মশালের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে বাদশাহী তাজ দেখতে পেলো রহিম খাঁ। আজিমুশ্বানের দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো রহিম খাঁ, হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

একটি মুহূর্ত।

হঠাৎ কে চিৎকার করে উঠলো, রহিম খাঁ! আমি আজিমুশ্বান, সাহস থাকে তো···

লাগাম টেনে ধরলো রহিম খাঁ। ফিরে দাঁড়ালো। আর সেই মুহূর্তে একটি বর্শা এসে তার বক্ষ ভেদ করলো।

মাটিতে লুটিয়ে পড়লো রহিম খাঁ!

অশ্বারোহী নেমে দাঁড়ালো রহিম খাঁর পাশে। বাদশাহী তাজ খুলে অট্টহাসে হেসে উঠলো হামিদ খাঁ। হামিদ খাঁ নয়, হাবশী সুলেমান।

বললে, আমার ইনাম পেয়ে গেছি বাদশাহ। আর তোমার ইনামও তুমি পেয়েছো!

বলেই সশব্দে আবার হেসে উঠলো কালো চেহারার দৈত্যটা।

বাইশ

শান্তি নামলো রাঢ়ভূমিতে। জয় হলো নবাব আজিমুশ্বানের।

বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ তখন চিতোয়া-বরদার দুর্গ অবরোধ করেছে।

চন্দ্রপ্রভার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করলো দুর্গরক্ষীরা।

রাজসিক সম্মানে রঘুনাথকে আমন্ত্রণ জানালো চন্দ্রপ্রভা, দুর্গ-প্রাসাদের অলিন্দে গবাক্ষে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠলো।

সঙ্গদাসীর দল নৃত্যগীতে আহ্বান করলো রঘুনাথকে। চিতোয়া-বরদার প্রজারা জয়ধ্বনি তুললো বিষ্ণুপুররাজের। প্রাসাদ সুসজ্জিত হলো পত্রে-পুষ্পে, লক্ষ লক্ষ প্রদীপের মালা জ্বলে উঠলো প্রাসাদের অলিন্দে, শীর্ষে, দুর্গ-প্রাকারের চতুর্দিকে।

রাজনগরের বিদ্রোহী সৈন্যের আত্মসমর্পণ নয়, যেন এক অপেক্ষিতা অভিসারিণীর দয়িতবক্ষে আত্মসমর্পণ। যুদ্ধজয়ের নিনাদ নয়, মিলনের সুমধুর বংশীধ্বনি।

সানাইয়ের আনন্দ-করুণ সুরে ভরে উঠলো রাজনগরের আকাশ বাতাস। রঘুনাথের মনের তারেও প্রেমের সুর কাঁপলো। একটি লজ্জারুণ সুন্দর মুখের ছবি বারংবার ভেসে ওঠে চোখের সামনে, হৃদয়ের গভীরে দীর্ঘশ্বাসের মতো থমকে থাকে দীর্ঘ অপেক্ষার কামনা।

পরাজিত রাজদুর্গ নয়, বিবাহের আনন্দ-বাসর। পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত হলো দুর্গ, প্রাসাদ, রঙমহল। রক্তপটে সুশোভন নহবতখানায় আগমনীর সুর ফুটলো কেঁপে কেঁপে। প্রতিটি গবাক্ষে শঙ্খধ্বনি তুললো সদ্যস্নাতা নারীর দল। শিলাময় বুরুজ ও মুরুচাও যেন আহ্বান জানালো রঘুনাথকে, কামানের গর্জনে। রক্ষ

শিবিরে বেজে উঠলো কাড়া-নাকাড়ার দামামা, শুভ শিঙার প্রমোদ-সঙ্কেত।

বিজিত রাজনগর দুর্গ রূপান্তরিত হলো আনন্দ-উদ্যানে।

শুঁড় তুলে অভিবাদন জানালো হাতির সারি, গলার ঘুঙুর বাজলো ঝুমঝুম ঝুমঝুম। খোজা-থানার থানাদার সেলাম জানালো, ঢালী আর রায়বেঁশের দল কসরত শুরু করলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

স্বর্ণমোহর পুরস্কার দিতে দিতে এগিয়ে চললো রঘুনাথের তাঞ্জাম। জমাদার আর বক্‌শীর দল ভিড় করলো পেসকসের লোভে।

প্রাসাদের সামনে এসে তাঞ্জাম থেকে নামলো রঘুনাথ। উলুধ্বনি আর শঙ্খস্বরে মুখরিত হয়ে উঠলো চতুর্দিক। উলু আর শঙ্খধ্বনিতেও সাতটি সুরের মূর্ছনা শুনে বিস্মিত হলো রঘুনাথ। গীতরসিক রঘুনাথের মনে মুহূর্তের জন্যে বিষাদ দেখা দিলো।

বাংলার গ্রামীণাদের লোকসঙ্গীতের ধারাই লুপ্ত হবার পথে এগিয়ে চলেছে—ভেবেছিলো রঘুনাথ। জানতো না উলুধ্বনির মাধ্যমেও সাতটি সুরের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, জানতো না ঐকতান শঙ্খধ্বনির মধ্যেও লুকিয়ে আছে দুরূহতম রাগরাগিণী।

লোভ জেগে উঠলো রঘুনাথের মনে। বিষ্ণুপুরের দরবারদাসীদের শঙ্খধ্বনিতে এমন সুরময় মাধুর্য শোনেনি সে কোনোদিন। এই নতুন সম্পদকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে, রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করলো মনে মনে। নিজেকে প্রবোধ দিলে, বিজয়ী রাজার মতো ধন-ঐশ্বর্য নারী লুণ্ঠন নয়, প্রায়-অবলুপ্ত শিল্প আর সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যেই দুর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য আর নারীদের বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে।

পুনরায় শঙ্খধ্বনি হলো। তন্ময়তা ভাঙলো রঘুনাথের।

মৃদু হেসে অভিবাদন জানালে সুরঞ্জাক্ষী। চটুল চোখের ইশারায় আহ্বান জানালে।

চন্দ্রপ্রভার কক্ষে এসে উপস্থিত হলো রঘুনাথ। শরমে নত দু'টি অপরূপ চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো।

এ-রূপ বুঝি কবির কল্পনাতেই চিত্রিত হয়, আর প্রেমিকের বাসনারঙিন মনের পটে।

রঘুনাথ দেখলে, সারা কক্ষ পুষ্পে পুষ্পে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুবাসিত কুসুমের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। অগুরু চন্দনের রাজটীকা, সুগন্ধির ধারাবর্ষণ। সুন্দরী দাসীদের পুষ্পিত বেণীর কলা-কৌশল, চিকন চূড়া, মৃদু মধুর হাসি, মুগ্ধমধুর বাঁশীর সুর। ভুরুর ভঙ্গিমায়, নয়নের ইঙ্গিতে যেন এক কল্পরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর তার মাঝে ইন্দ্রাণীর রূপ-ঐশ্বর্যে ভূষিতা চন্দ্রপ্রভার লাজনম্র হাসি।

রাজসিক সম্ভ্রমে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভা পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠে মাল্যদান করলো। কৌতুকের হাসি হেসে বিদায় নিলো সঙ্গদাসীর দল।

রাত ঘন হলো। থামলো উৎসবের হট্টগোল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ নিশ্চুপ। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছে রঘুনাথের। বিষ্ণুপুরের সৈনিকরা তখন রাজনগরের যাবতীয় রত্ন-ঐশ্বর্য, শিল্পকলার ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি নিয়ে চলেছে বিষ্ণুপুরের বজরায়। বাংলার নবাব কিংবা রহিম শাহ—কোনোপক্ষের হাতেই যেন এ ঐশ্বর্য না পড়ে। উভয়েই বিধর্মী, তাই চন্দ্রপ্রভা নির্দেশ দিয়েছে সমস্ত সম্পদ বিষ্ণুপুরে নিয়ে যেতে হবে।

প্রত্যূষের প্রথম ক্ষণেই রাজনগর ছেড়ে যাবে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভা। নবাবী সৈন্য এসে পৌঁছানোর আগেই।

তাই চন্দ্রপ্রভার চোখে ঘুম নামেনি। এক নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে চন্দ্রপ্রভা। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার। পিতার দুঃসাহসিক বিদ্রোহের মধ্যে যে-আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা যেন শোভা সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে

সঙ্গেই শেষ হয়ে না যায়। ধর্মের মুক্তিকেই দেশের স্বাধীনতা মনে করে চন্দ্রপ্রভা, তাই পিতার আদর্শকে পতির জীবনে জ্বালিয়ে তুলতে চায়।

নিদ্রিতা চন্দ্রপ্রভার গাঢ় বাহুবন্ধনে ঘুম ভেঙে গেলো রঘুনাথের।

একটি করুণ সুর ভেসে আসছে তখন অদূরের অট্টালিকা থেকে।

বেহাগ রাগিণীর একটি বিষাদম্লান নারীকণ্ঠ শুনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো রঘুনাথ।

পুষ্পিত শয্যার ওপর উঠে বসলো, কান পেতে রইলো বাতাসে ভেসে আসা গানের সুরে।

ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে বাইরের অলিন্দে এসে দাঁড়ালো রঘুনাথ— জলপূর্ণ গড়ের ওপারের অট্টালিকার দিকে উদাস চোখ মেলে।

এমন স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ রাগমূর্ছনা বুঝি কোনো নারীকণ্ঠে সম্ভব নয়। তন্ময় হয়ে একাগ্রচিত্তে সেদিকে কান পেতে রইলো রঘুনাথ।

শান্ত স্তব্ধ নিশীথের বুকে একটি উদাস ব্যর্থ সুর যেন তার প্রেমিককে খুঁজে ফিরছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙলো রঘুনাথের। দেখলে, বিস্রস্তকেশ চন্দ্রপ্রভা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

মৃদুস্বরে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, কে গায় চন্দ্রপ্রভা? কে ওই সুকণ্ঠ গায়িকা?

চন্দ্রপ্রভার নিদ্রাজড়িত সুন্দর দু'টি চোখের তারায় চোখ রেখে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কে ওই গায়িকা চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিলো রঘুনাথের মুখে। বললে, বিধর্মী।

—বিধর্মী? চমকে উঠলো রঘুনাথ। বললে, সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীতই একমাত্র ধর্ম চন্দ্রপ্রভা, শিল্পের জগতে ধর্মের ভেদাভেদ নেই।

চন্দ্রপ্রভা বুঝতে পারলো না রঘুনাথের কথা। বললে, রহিম খাঁর বেগম বি[illegible] নয় ?

মনে মনে হাসলো রঘুনাথ। কিন্তু ভুলতে পারলো না মুসলমানীর কণ্ঠস্বর।

সৈনিকদের আদেশ দিলো, রাজনগর দুর্গের বালাখানায় আছে রহিম খাঁর বেগম, তাকেও বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে বিষ্ণুপুরে।

মনকে প্রবোধ দিলো, এ তো নারীলুণ্ঠন নয়, সুগায়িকার যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যই রহিম খাঁর বেগমকে নিয়ে চলেছি।

কিন্তু সৈনিকেরা খুঁজে পেলো না কে রহিম খাঁর বেগম।

বললে, বালাখানায় রহিম খাঁর পত্নীর পরিচয় কেউই দিতে চায় না মহারাজ। গায়িকার সংখ্যাও নগণ্য নয়।

রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, তা হলে বালাখানার সকলকেই বন্দী করে নিয়ে চলো।

ময়ূরপঙ্খী বজরায় বসে অপেক্ষা করলো রঘুনাথ।

পালকির সারি এসে নামলো ঘাটে।

বোরখায় সমস্ত শরীর আবৃত মুসলমানীর দল অন্য একটি বজরায় গিয়ে উঠলো সৈনিকদের নির্দেশে।

রহিম খাঁর বেগম! সেই সুকণ্ঠ গায়িকার মুখশ্রী দেখবার লোভে উন্মুখ হয়ে উঠলো রঘুনাথ।

কিন্তু উপায় নেই।

দেখলে, একে একে পালকির পর্দা সরিয়ে নামলো সকলে। আপাদমস্তক বোরখায় আবৃত করে।

সব শেষে থামলো আরেকটি পালকি। পালকিবাহীর দল যথারীতি দূরে সরে দাঁড়ালো।

হঠাৎ লাল মখমলের পর্দার ফাঁক থেকে একটি সুন্দর সুশুভ্র পা বেরিয়ে এসে মাটি স্পর্শ করলো।

চমকে উঠলো রঘুনাথ। গজদন্তের নিখুঁত কারুকার্যের মতো

সুগঠিত সুশুভ্র:পায়ের পাতায় একটি কালো বান্দাছাপ দেখে শিউরে উঠলো। এমন রূপময় পদপল্লবে কেউ জ্বলন্ত লৌহশলাকা স্পর্শ করিয়ে বান্দাছাপ দিতে পারে?

পরক্ষণেই একটি প্রায়-বিস্মৃত দৃশ্য মনের পটে উঁকি দিলো। মনে পড়লো সেই বিবিবাজারের কালো বোরখায় ঢাকা এক রূপময়ী রহস্যময়ী বাঁদীকে।

বিবিবাজারের লোকও হঠাৎ সেদিন এমনি চমকে উঠেছিলো সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে দেখে। প্রথমবার চমকে উঠেছিলো ঘোড়ার খুরের শব্দে, দ্বিতীয়বার সাদা ঘোড়ার সুদর্শন আরোহীর দিকে তাকিয়ে।

বিবিবাজার তখন জমজমাট।

সারা ভারতের চতুর্দিক থেকে লোক এসে জমেছে। কেউ এসেছে সওদা বেচতে, কেউ বা সওদা করতে। পশ্চিমের মতিঝিল অবধি সারি সারি তাঁবু, একদিকে দূর সিন্ধু উপত্যকার বালুচ সওদাগরের দল। উট আর হাতি, আরবী ঘোড়া, বার্তাবাহী পারাবত। গালিচা ঝুলিচা, মসলিন মসলন্দ, হীরে জহরত··· বাঈজী আর বারাঙ্গনা।

জানোয়ারবাগের পাশ দিয়ে রঘুনাথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নেমেছিলো জ্যোতিষাচার্যের চবুতরার সামনে।

সারি সারি মশালের আলো ক্রমে নিবে আসছে তখন। থেমে আসছে বিবিবাজারের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ।

জ্যোতিষাচার্যের সামনে আসন নিয়ে আলাপ শুরু করতে যাচ্ছিলো রঘুনাথ।

নারীকণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো। দেখলে, কালো বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটি মুসলমানী। বোরখা নয়, যেন রহস্যের মায়াজাল!

এগিয়ে এলো সেই রহস্যময়ী।—ফকির সাহেব!

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন জ্যোতিষাচার্য। প্রশ্ন করলেন, কি চাও মা?

উত্তর এলো, নসীব জানতে চাই ফকির সাহেব।

তারপর বোরখার ভেতর থেকে একটি সুডৌল সুন্দর হাত বেরিয়ে এলো, করকোষ্ঠী বিচার করতে শুরু করলেন জ্যোতিষাচার্য।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাথা তুললেন তিনি। বললেন, রঘুনাথ, এমন অদ্ভুত কররেখা আমি কখনো দেখিনি।

সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে রঘুনাথের। সেই কৃষ্ণাম্বরে আবৃত রোমাঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার সুশুভ্র ছন্দোময় দু'টি পায়ের দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠেছিলো রঘুনাথ। মনে পড়ে, দু'টি ছন্দোময় সুন্দর হাত ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে কালো বোরখার আবরণ তুলে ধরেছিলো জ্যোতিষাচার্যের অনুরোধে।

মুগ্ধ হয়েছিলো রঘুনাথ। এও কি সম্ভব! বোরখার আড়ালে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লুকিয়ে ছিলো, কল্পনা করতে পারেনি রঘুনাথ। এই নিখুঁত তিলোত্তমার রূপ—এ-ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

ভবিষ্যৎ জেনে বিদায় নিয়েছিলো সেই বাঁদী। পুনরায় বোরখায় মুখ ঢেকে চলে গিয়েছিলো বাঁদীতল্লাটের দিকে।

সুশুভ্র পদপল্লবে কালো বান্দাছাপের দিকে পুনরায় দৃষ্টি পড়তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো রঘুনাথ। এমন রূপময়ী কন্যার জন্ম কি শুধু আজীবন দাসীবৃত্তির জন্যে?

তীব্র এক কামনায় রঘুনাথ দগ্ধ হয়েছিলো সেদিন।

আজ আবার সেই বিস্মৃত দিনটির কথা মনে পড়লো রঘুনাথের।

পর্দায় ঢাকা পালকি এসে নামলো ঘাটের পাড়ে। পালকিবাহীর

দল দূরে সরে গেলো সসম্ভ্রমে। আর পালকির লাল মখমলের পর্দা কাঁপলো! পর্দার আড়াল থেকে একটি সুন্দর সুগৌর নর্তকীচরণ বেরিয়ে এসে মাটি স্পর্শ করলো।

রঘুনাথের চোখে পড়লো বান্দাছাপের কলঙ্করেখা।

ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে বেরিয়ে এলো লালবাঈ। দ্রুতপায়ে নির্দিষ্ট বজরায় গিয়ে উঠলো।

রহিম খাঁর পরাজয়ে এতটুকু দুঃখ নেই তার মনে। কামনার সিঁড়ি যেন ধাপে ধাপে অতিক্রম করে চলেছে সে। জ্যোতিষাচার্যের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই তার জীবনের প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেম নয়, একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় চায় লালী, রাজ্যপরিচালনা করতে চায়।

আপন কক্ষে বসেই লালী শুনতে পেয়েছিলো বিষ্ণুপুরের এক হিন্দু রাজা দুর্গ অবরোধ করে চন্দ্রপ্রভাকে জয় করে নিয়ে যেতে চান। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত কামনার শিখা জ্বলে উঠেছিলো। গানের সুর ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায়। গানের সুরে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলো রঘুনাথকে।

কিন্তু লালবাঈয়ের পরিচয় জানতে পারলো না রঘুনাথ। দেখতে পেলো না বোরখার আড়ালে কোন অপরূপ মুখসুষমা লুকিয়ে আছে। জানলো না, যৌবনের মোহমুগ্ধক্ষণে বিবিবাজারের মশালের আলোয় যে অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখে মন হারিয়েছিলো, সেই যবনকন্যাই লালবাঈ, সেই রহস্যময়ী রূপবতীকেই সে বন্দী করে নিয়ে চলেছে বিষ্ণুপুরে।

রঘুনাথের বজরার শ্রেণী এসে থামলো বিড়াই নদীর ঘাটে। ভারবাহী শ্রমিকের সারি চিতোয়া-বরদার লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে চললো রাজপ্রাসাদে।

উৎসবে উচ্ছল হয়ে উঠলো বিষ্ণুপুর। মল্লবংশের গৌরব রঘুনাথকে আহ্বান জানালো সভাসদরা। মঙ্গলশঙ্খ বাজলো, বাজলো যুদ্ধজয়ের রণদামামা। আর সানাই সুর ধরলো আনন্দলগ্নের।

হরিনামে অষ্টপ্রহর মুখরিত হলো। কীর্তনের আসর বসলো বৈষ্ণবদের আখড়ায়। বিষ্ণুপুররাজের যুদ্ধজয় যেন বৈষ্ণবধর্মের জয়। সারা বিষ্ণুপুরের জয়।

প্রজারা মেতে উঠলো উৎসবে অবগাহন করার জন্যে। স্বর্গতা রাজমাতার অভাব বোধ করে কেউ বা বিষণ্ন হলো।

এদিকে প্রদীপের মালায় সাজলো রাজপ্রাসাদ। সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী আর রাজহংস গা ভাসালো কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, গণ্টন-বাঁধের বুকে। পত্রে-পুষ্পে শিহরিত হলো প্রাসাদের প্রতিটি অলিন্দ, গবাক্ষ, প্রাঙ্গণ।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলো বিষ্ণুপুরের প্রজারা। খুশী হয়ে উঠলো তারা। এবার বুঝি রাজ্যের দুর্দিন ঘুচলো, লুণ্ঠিত ধন-ঐশ্বর্যে প্রজাদের মনে ভবিষ্যতের শুভদিনের আশ্বাস দেখা দিলো।

শতসহস্র নারী পুরুষ ভিড় করে দাঁড়ালো পথের দু'পাশে, রাজপত্নীর দর্শন পাবার আগ্রহে।

এদিকে রাজপ্রাসাদে তখন সভাপণ্ডিত আর জ্যোতিষাচার্য চিন্তান্বিত। সভাসদরা বিব্রত।

যুদ্ধজয় করে চিতোয়া-বরদার ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরকে করেছে ঐশ্বর্যশালী। মুখ্য অমাত্য, সভাপণ্ডিত এবং সভাসদরা তাই খুশী হয়েছে। কিন্তু…

জ্যোতিষাচার্য শঙ্কিতস্বরে বললেন, এই উৎসবের মধ্যেও আমি খুশী হতে পারছি না ভট্টাচার্য।

সভাপণ্ডিত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন দৈবজ্ঞ?

চিন্তার রেখা ফুটলো জ্যোতিষাচার্যের কপালে। বললেন, আমাদের সম্মতি গ্রহণ না করেই শোভা সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেছে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভাকে বিষ্ণুপুরের পাটরানীর সম্মান দিয়েছে।

সভাপণ্ডিতও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন সে-কারণে। তবু তা প্রকাশ করতে

চাইলেন না। বললেন, রাজাকে শুভ উপদেশ দেওয়াই আমাদের কাজ জ্যোতিষাচার্য, আর সে উপদেশের অপেক্ষা না রেখেই যখন বিবাহ করেছে রঘুনাথ, তখন কোনো দায়িত্বও আমাদের নেই।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন।—দায়িত্ব কি শুধু রাজার প্রতি? দেশের প্রতি, রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার জন্যেও কি দায়িত্ব নেই আমাদের? রঘুনাথ আমার পুত্রতুল্য, তার অপরাধ আমি ক্ষমা করতাম, ভাবতাম যৌবনের উচ্ছ্বাসবশত চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করেছে রঘুনাথ, মুগ্ধ হয়েছে তার রূপযৌবনে। কিন্তু…

—কিন্তু কি জ্যোতিষাচার্য? এতোখানি বিচলিত হওয়ার কি কারণ ঘটলো?

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন, বিষণ্ণ হাসি। বললেন, সামান্য এক ভৌমিক-কন্যা হবে বিষ্ণুপুরের পাটরানী; এ আমার কাছে অসহ্য, অসহ্য। আর তার চেয়েও বড়ো দুশ্চিন্তা এনেছে ঐ যবনী গায়িকা।

কিন্তু এ অসন্তোষের কোনো খবরই রাখলো না রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভাই তখন তার সারা মনপ্রাণ ঘিরে রেখেছে এক মুগ্ধ আবেশে।

পরক্ষণেই অনুজ গোপালের কথা মনে পড়লো। মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত দায়িত্ব রঘুনাথের হাতে অর্পণ করে গেছেন রাজমাতা।

কিশোর গোপালকে এনে চন্দ্রপ্রভার কোলে তুলে দিলো রঘুনাথ। বললে, মাতৃ-আদেশ পালন করার সমস্ত দায়িত্ব আজ থেকে তোমার হাতে তুলে দিলাম চন্দ্রপ্রভা।

স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চন্দ্রপ্রভার মুখ। মুগ্ধ কটাক্ষে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে গোপালকে কোলে তুলে নিলো চন্দ্রপ্রভা। ধীরস্থির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, আজ থেকে আমার স্বার্থের চেয়েও বড়ো হবে গোপালের স্বার্থ, তার মঙ্গল, তার ভবিষ্যৎ।

তেইশ

বিদ্রোহীদের পরাজিত করে আজিমুশ্বান তখন সুবে বাংলার নবাবের পদে অধিষ্ঠিত। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান সুবেদার নিযুক্ত হলো ইব্রাহিম খাঁর পরিবর্তে। দাক্ষিণাত্যে দরবার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো ইব্রাহিম খাঁ।

এ-সংবাদে সবচেয়ে বেশি আনন্দ প্রকাশ করলো ইংরেজ কোম্পানী। আতসবাজী পুড়লো, হাউই ছুটলো কোম্পানীর কুঠি থেকে। সারারাত গান আর বাজনা। আর এ-খবর নবাবের কাছে অতিরঞ্জিত করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেও ভুললো না কুঠিয়ালরা।

বিলাসী নবাব খুশী হয়ে উঠলো, অনুমতি দিলো কোম্পানীর গভর্নরকে দরবারে উপস্থিত হবার।

টুপি খুলে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো ইংরেজ গভর্নর চার্লস আয়ার। রাজসম্মানীর স্বর্ণথালে ষোলো হাজার রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিয়ে আবার কুর্নিশ করলে জব চার্নকের জামাতা।

আজিমুশ্বান বললে, বহুত খুশ। ইংরেজ আমার দোস্ত, তোমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা আমি অপূর্ণ রাখবো না।

চার্লস আয়ার বললে, হুজুর শান্তি এনেছেন সুবে বাংলায়, এবার বাণিজ্যের প্রসার করতে দিলে ঐশ্বর্যও বাড়বে আপনার সুবেদারীতে। বাণিজ্যের জন্যে তিনটি গ্রাম কিনতে চাই আমরা, অনুমতি দিন নবাব বাহাদুর।

মাত্র তিনটি গ্রাম! কিনতে চায়, উপহার নয়!

আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে মহামান্য আজিমুশ্বান বললে, তথাস্তু।

সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর!

নবাবকে ষোলো হাজার টাকা নজরানা দিয়ে জমিক্রয়ের অনুমতি লাভ করলো দূরদর্শী ইংরেজ কোম্পানী, আর মাত্র তেরোশো টাকার বিনিময়ে জমিদারের কাছ থেকে তিনটি গ্রামের স্বামিত্ব ক্রয় করলো তারা।

ইতিহাসের গতি ভিন্নপথ নিলো ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। স্থায়ী এবং সুদৃঢ় আসন গ্রহণ করলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

অভ্যুদয় ঘটলো একটি নূতন শক্তির। জন্ম নিলো একটি নূতন নগর। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে যে কলিকাতা ছিলো একটি তুচ্ছ জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম, সপ্তগ্রামের একটি অতি সাধারণ মহল—নবাবের অনুমতি আর ইংরেজদের রাজ্যলিপ্সা তাকেই করে তুললো পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের কেন্দ্রভূমি।

বার্ষিক তেরোশো টাকার নজরানার বিনিময়ে সুজার কাছ থেকে বাণিজ্যের অনুমতি পেয়েছিলো ইংরেজ কোম্পানী। কিন্তু মোগলের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেনি জব চার্নক। ১৬৮৬ সালে হুগলী লুট করেছিলো আক্রোশের বশে। সুতানুটিতে কুঠি গেড়েছিলো সর্বপ্রথম, হোগলার ছাউনিতে জমায়েত হয়েছিলো বিদেশী শক্তি।

তারপর ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বজাতির অধিবাসীদের আহ্বান জানালো চার্নক, সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতায় বাস করবার জন্যে। স্বপ্ন দেখলো ঐশ্বর্যময় একটি শহর গড়ে তোলার।

১৬৯২ সালে মৃত্যু হলো জব চার্নকের। তারপর গভর্নর এলিস, গভর্নর গোল্ডস্‌বরো, চার্নক-জামাতা চার্লস আয়ার। চার্লস আয়ার সর্বপ্রথম ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করলো বাংলার মাটিতে, শোভা সিংহের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে। ভারতবর্ষ থেকে যে-ইংরেজের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন আওরঙ্গজেব, সেই ইংরেজ শক্তিবৃদ্ধির, দুর্গনির্মাণের অনুমতি পেলো শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার নামে। দুর্গের আশেপাশে গড়ে উঠলো একটি নূতন নগর।

ডিহি কলিকাতা। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক জব চার্নক প্রথম সোপান প্রতিষ্ঠা করেছিলো, ইমারত গড়ে তুললো চার্লস আয়ার—চার্নকের জামাতা।

শুধুই কি একটি শহর গড়ে তুলতে শুরু: করলো ইংরেজ কোম্পানী? একটি নতুন শক্তি?

না। হাজার বছরের পঙ্কিল সমাজের অঙ্গে আঘাত হানলো ইংরেজ। অর্থহীন সামাজিক অনুশাসন আর ধর্মের হৃদয়হীন নীচতাকে যুগ যুগ ধরে পরম সত্য মনে করে আঁকড়ে ধরে ছিলো সারা বাংলা। সমাজসংস্কারের ব্যর্থতাকে ভেবেছে দৈবের বিধান। প্রতিবেশী মুসলমান সমাজেও নারীর স্বাতন্ত্র্য আর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে ভেবেছে—আজীবন কারাবাস, পতিসেবা, সতীদাহ নারীর প্রকৃতিদত্ত বিধিলিপি।

ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্নক সর্বপ্রথম নাড়া দিলো হিন্দুর সমাজ-দেহে। সমাজপতিরা দেখলো কোনো অঘটন ঘটলো না, কোনো অনুশোচনা দুঃখ শোক ভাগ্যবিপর্যয়:মসীলিপ্ত করলো না জব চার্নক আর লীলাবতীর জীবনকে!

এ-কাহিনী অবিদিত রইলো না সুদূর বিষ্ণুপুর রাজ্যেও।

জোতিষশাস্ত্রের প্রতি যুগযুগসঞ্চিত আস্থায় ভাঙন ধরতে শুরু করলো।

দৈবজ্ঞের দল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো, ব্রাহ্মণ-কন্যা লীলাবতী পুনরায় তার স্বামীকে হারাবে। বৈধব্যই নাকি তার অদৃষ্ট। ললাটলিপি খণ্ডন করার শক্তি নেই মানুষের।

লীলা চার্নক! যৌবন পূর্ণতা পেলো গ্রামবধূর দেহে মনে। কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণময় সংসারের স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে বৈধব্য নেমে এলো লীলাবতীর জীবনে।

ভাগীরথীর তীরে চিতা সজ্জিত হলো। রাত্রির শ্মশানভূমিতে জ্বলে উঠলো শত শত মশাল। শঙ্খধ্বনিকে চাপা দিয়ে বেজে উঠলো উচ্চ-নিনাদ কাড়া-নাকাড়া, ঢাক আর ঢোল।

স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন। আর পাষাণ-প্রতিমার মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন! লীলাবতী। অনিমেষ নয়নে মৃত স্বামীর আচ্ছাদিত শবদেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

চতুষ্পার্শের গ্রাম থেকে ভিড় ভেঙে পড়েছে শ্মশানঘাটে। সতী হবে যুবতীবধূ লীলাবতী। সতীদাহ দর্শনেও সতী হওয়ার সমান পুণ্য। সপ্ত সতীদাহ দর্শনে মোক্ষলাভ অনিবার্য।

পাটনা থেকে সুতানুটির কুঠিতে ফিরছে তখন জব চার্নক। ইংরেজ কোম্পানীর পণ্যে বোঝাই বজরা ভেসে চলেছে ভাগীরথীর স্রোত বেয়ে।

বজরা থেকেই শ্মশানভূমির দিকে চোখ পড়লো জব চার্নকের। ঢাকের বাদ্য, মশালের আলো আর ভিড় দেখেই ইংরেজ যুবক বুঝতে পারলো সতীদাহ হবে শ্মশানভূমিতে।

ঘাটে বজরা বাঁধলো চার্নক।

কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালো এক কোণে। মনে শুধুই ঔৎসুক্য, আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না চার্নকের মনে।

হঠাৎ লীলাবতীর দিকে চোখ গেলো। মুগ্ধ হলো চার্নক, মোহিত হয়ে গেলো লীলাবতীর রূপে! এমন এক পরমাসুন্দরী যুবতী বৃদ্ধস্বামীর সঙ্গে সহমরণে চলেছে কোন আত্মিক শক্তির বলে?

মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে গেলো চার্নক। বীরোচিত আবেগে হাঁটু গেড়ে বসলো লীলাবতীর সামনে। কি যেন বলতে চায় চার্নক, কি যেন ভিক্ষা।

কিন্তু সে-দিকে দৃষ্টি নেই লীলাবতীর। নির্নিমেষ স্থির অচঞ্চল দু'টি চোখের তারা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শুধু। পাষাণের মূর্তি যেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হঠাৎ লীলাবতীর পাদস্পর্শ করলো চার্নক।

মুহূর্তপূর্বে যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়েও যার মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেনি, চার্নকের স্পর্শে তারই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

নত দৃষ্টিতে চার্নকের মুখের দিকে তাকালো লীলাবতী। আর চার্নক আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বললে, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই বিদেশিনী।

আশ্চর্য মৃদু হাসি ফুটলো লীলাবতীর মুখে, যেন কি এক অসম্ভব অবাস্তব অর্থহীন অনুরোধ জানিয়েছে চার্নক।

মৃতের আত্মীয়-স্বজন হট্টগোল তুললো। জনতা ক্রুদ্ধ হলো। চিৎকার করে উঠলো তারা। সতীদেহ স্পর্শ করেছে ফিরিঙ্গী বণিক, শুচিতা নষ্ট করেছে। আর সদ্য বিধবাকে বিবাহ করতে চেয়ে হিন্দু-ধর্মকে অসম্মান করেছে।

লাঠি, বল্লম, সড়কি হাতে জনতা এগিয়ে এলো চার্নককে লক্ষ্য করে। শিউরে উঠলো লীলাবতী। ছুটে এলো চার্নকের দিকে। বুক পেতে দিলো নিরপরাধ বিদেশীকে বাঁচাবার জন্যে।

পরমুহূর্তেই চার্নক আর ইংরেজ রক্ষীর দল বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো। ছত্রভঙ্গ হলো জনতা, ভয়ে পালালো মৃতের আত্মীয়-স্বজন।

চার্নক আবার তাকালো লীলাবতীর মুখের দিকে।—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও লীলাবতী।

—চলো। রহস্যময় হাসি হেসে ভিক্ষা মঞ্জুর করলো ব্রাহ্মণকন্যা।

লীলাবতী নয়, ইংরেজবধূ লীলা চার্নক। নবজন্ম লাভ করলো লীলাবতী।

কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো পণ্ডিতকুল, উষ্মা প্রকাশ করলো সমাজ-পতির দল। বাংলার নবাবের কাছে আরজি পেশ করলো তারা, দরবার করলো আলমগীরের কাছে।

আওরঙ্গজেব হেসে বললেন, কাফেরের এ নৃশংস আচার যতো শীঘ্র

উচ্ছেদ হয় ততোই মঙ্গল। আর চার্নক মনুষ্যত্ব প্রকাশ করেছে, অন্যায় করেনি।

সতীদাহ নিরোধের জন্যে পুনরায় পরোয়ানা জারী করলেন আওরঙ্গজেব।

কিন্তু লুপ্ত হলো না সতীদাহ। গোপনে রাজকর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে বশীভূত করে হিন্দু সমাজে চলতে লাগলো এই নৃশংস আচার। কারণ, বিধিলিপি নাকি খণ্ডন করা যায় না। যে কন্যার অদৃষ্টে বৈধব্য আছে শতবার বিবাহ দিলেও বৈধব্য পাপ তার মুছে যাবে না।

দৈবজ্ঞ আর সমাজপতিরা ভবিষ্যদ্বাণী করলো, লীলাবতী পুনরায় তার স্বামীকে হারাবে। মৃত্যু হবে চার্নকের।

সব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সুখে সমৃদ্ধিতে জীবন অতিবাহিত হলো জব চার্নক আর লীলা চার্নকের। কন্যার বিবাহ দিলো চার্নক, কোম্পানীর বিচক্ষণ এক কর্মচারী চার্লস আয়ারের সঙ্গে।

ডিহি কলিকাতার বুকে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের প্রথম মিলনের স্মৃতিচিহ্ন দেখা দিলো চার্নক আর চার্নক-পত্নীর কবরস্থানে।

ধর্মে ধর্মে যে কোনো ভেদ নেই, প্রেম ভালোবাসাই যে সারবস্তু, প্রমাণ করে গেলো একজন ইংরেজ যুবক আর এক ভারতীয় যুবতী। জীবনের শেষ পর্যন্ত হিন্দুনারীর মতোই হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে গেছে লীলা, খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসরণ করেছে জব চার্নক। কিন্তু পরস্পরের ভালোবাসার মধ্যে কোনো ছন্দপতন ঘটেনি ধর্মকে কেন্দ্র করে। কারণ ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ছিলো না কারও মনে।

এই বিচিত্র মিলনকাহিনী চাঞ্চল্য এনেছিলো গ্রামে গ্রামে। সুদূর বিষ্ণুপুরেও পৌঁছেছিলো এ-খবর।

ইংরেজ বণিকের সঙ্গে হিন্দুকন্যার মিলন নয়, যেন জ্ঞানতরুণ পাশ্চাত্যের সঙ্গে হৃতসর্বস্ব প্রাচ্যের বৈধব্যের মিলন। একটি বিক্ষিপ্ত

ঘটনা নয়, যেন এক মহাসন্ধিক্ষণের রূপক। কে জানতো, এই বিচিত্র বিজাতীয় মহাসন্ধি ডিহি কলিকাতার বুকে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলো, রূপকের মূল সত্যকে অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে সেই ডিহি কলিকাতা কত সহস্র নব ভাবধারার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলবে সমগ্র ভারতবর্ষে।

সমাজপতিরা সেদিন আশঙ্কায় শিউরে উঠেছিলো শত শতাব্দীর আধিপত্যের আসন টলতে দেখে। বুদ্ধিজীবীরা দেখতে পেয়েছিলো শুধু নতুন আলো, দেখতে পায়নি অমঙ্গলের ছায়া। নবাব আজিমুশ্বান অর্থের লোভে দৃষ্টি হারিয়েছিলো, স্বপ্ন দেখেছিলো বাণিজ্যশুল্কে রাজকোষ ভরে উঠছে। বুঝতে পারেনি, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বাণিজ্যের আড়ালে যে শক্তির স্রোত বইতে শুরু হয়েছে তা একদিন প্লাবনের রূপ নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধুয়ে-মুছে নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলবে!

সুদূর বিষ্ণুপুরে রাজা রঘুনাথের মনেও হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিলো এ ঘটনা। তাই যে-জ্যোতিষশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে জানতো সমগ্র বিষ্ণুপুর, রঘুনাথ সেই শাস্ত্রকেও হেসে উড়িয়ে দিলো। জ্যোতিষাচার্যের প্রতিবাদকে বললে হাস্যকর।

জ্যোতিষাচার্য সাবধান করলেন।—আমাদের পরামর্শের অপেক্ষা না করে চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করেছো রঘুনাথ, তবু সে অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি, কিন্তু হিন্দুরাজ্যে ঐ কাঞ্চনীকে আশ্রয় দিয়ে একি অনাচার করতে চলেছো?

রঘুনাথ বললে, কাঞ্চনী হোক্, যবনী হোক্, সুরসাধিকা সে!

জ্যোতিষাচার্য বললেন, যৌবনের উত্তেজনায় সত্যকে মিথ্যা মনে হয় রঘুনাথ, মিথ্যাকেই মনে হয় সত্য। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অভ্রান্ত রঘুনাথ। তোমার মঙ্গলের জন্যে, বিষ্ণুপুরের মঙ্গলের জন্যে, লালবাঈকে ত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য।

রঘুনাথ হেসে বললে, অদৃষ্ট যদি সত্য হয় তা হলে মানুষ কি চেষ্টা

করে তাকে খণ্ডন করতে পারে? সত্যাশ্রয়ী আমি, সত্য পালন করাই আমার ধর্ম। সত্যের চেয়ে স্বার্থ বড়ো নয় গুরুদেব!

সভাপণ্ডিত আর জ্যোতিষাচার্য বুঝলেন অন্য পথ গ্রহণ করতে হবে। তাই চন্দ্রপ্রভার কাছে তাঁর আশঙ্কার কথা নিবেদন করলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, গণনা করে দেখেছি মা, কাঞ্চনী বিষ্ণুপুরের অলক্ষ্মী।

শুনে শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপালকে সন্তানস্নেহে জড়িয়ে ধরলো বুকে।

তবু স্বামীর প্রতি অবিচল আস্থায় বললে, অদৃষ্টের ওপর হাত নেই গুরুদেব, কিন্তু আমার দেহমনের চালক আমি নিজেই। মিথ্যা আশঙ্কা আপনার, কাঞ্চনীকে আশ্রয় দেবার জন্যে কোনোদিন যদি অমঙ্গলের ছায়া নামে এ রাজ্যে, তা হলে পতিঘাতিনী হয়েও রাজ্যকে রক্ষা করবো।

বলেই চমকে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। উচ্চারিত শব্দগুলি যেন বিভীষিকার মতো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। এ কি সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হলো সে?

দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। মদনমোহনের মন্দিরের দিকে ছুটে গেলো চন্দ্রপ্রভা। মন্দিরপ্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলো আর কাঁদলো।

চব্বিশ

লালবাঈয়ের মনে তখন দুর্জয় বাসনা জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে বাঁদীজীবনের ক্ষণিক রোমাঞ্চের অতৃপ্ত কামনা।

রহিম খাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হয়েছিলো লালবাঈয়ের। চিতোয়া-বরদার দুর্গে শোভা সিংহের রক্ষীদের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রপ্রভার আশ্রয়ে তাকে রেখে গিয়েছিলো রহিম খাঁ। তাই রহিম খাঁর মৃত্যুতে সে নিরাশ্রয় মনে করেছিলো নিজেকে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখলো রঘুনাথ দুর্গ অবরোধ করেছে। যুদ্ধ আর হানাহানির ভয়ে শিউরে উঠেছিলো লালবাঈ। বিধর্মী রাজার আক্রমণের খবর শুনে আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিলো। ভেবেছিলো প্রবল সংঘর্ষ হবে দু'পক্ষের সৈনিকদের মধ্যে!

কিন্তু, না, কোনো হানাহানি হলো না। শুনলো, চন্দ্রপ্রভার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্গরক্ষীরা। আর অত্মসমর্পণ করেছে চন্দ্রপ্রভা। তবু আশা ছিলো, বালাখানার মুসলমানীরা মুক্তি পাবে। কোনো অত্যাচার হবে না তাদের ওপর। নারীর প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা আর সম্মানের কথা অবিদিত ছিলো না তার। কিন্তু মুক্তি চায় না লালী, সে চায় হাতের মুঠোয় একটি রাজ্যকে নিয়ে আসতে। আর সে-কামনা সার্থক করতে হলে আকর্ষণ করতে হবে রাজা রঘুনাথকে। তাই মধ্যরাতে সুরের শৃঙ্খল ছুঁড়ে দিয়েছিলো লালী।

কিন্তু রঘুনাথ ছুটে এলো না সে আকর্ষণে। সে-শৃঙ্খল তার নিজেরই পায়ে জড়িয়ে গেলো।

বালাখানার মুসলমানীদের বন্দী করার আদেশ এসেছে শুনেই বিস্মিত হয়েছিলো লালবাঈ। সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকিয়েছিলো

হীরাবাঈয়ের দিকে। আর হীরাবাঈ মৃদু হেসে বলেছিলো, রাজা আর নবাবে তফাত নেই লালী। হীরে-জহরত আসবাবের মতোই জেনানাও তাদের চোখে লুটের সওদা। কিন্তু নবাবরা যার ইজ্জত নষ্ট করে তাকেই আবার বেগমের ইজ্জতও দিতে চায় লালী, আর হিন্দু রাজারা···

ঘৃণায় নাক বেঁকিয়েছিলো হীরাবাঈ, ঝলমল করে উঠেছিলো তার নাকছাবির বড় হীরেটা।

হীরাবাঈয়ের হিন্দুবিদ্বেষ দেখে কৌতুকে হেসেছিলো লালী, লালবাঈ। তারপর হঠাৎ একসময়ে মনে পড়েছিলো, প্রথম যৌবনের একটি রোমাঞ্চমধুর দৃশ্য।

নিজের ভবিষ্যৎ জানবার আকাঙ্ক্ষায় বাঁদীবাজার থেকে সেদিন লুকিয়ে এসেছিলো লালী, এসে দাঁড়িয়েছিলো ফকিরসাহেবের চবুতরার সামনে। আর চমকে উঠেছিলো হঠাৎ একসময়।

ফকিরসাহেবের অনুরোধে ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে তুলে ধরেছিলো কালো বোরখার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের জলুসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠেছিলো সেই সুপুরুষ রাজকুমার।

কতো দীর্ঘদিন সেই স্মৃতি মনের কোণে পুষে রেখেছিলো লালী। ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। কিন্তু জানতো না, বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথই তার জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ। জানতো না, চিতোয়া-বরদা আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে এনেছে সেই সুদর্শন অশ্বারোহী।

বিড়াই নদীর ঘাটে বজরা ভিড়লো। ধনসম্পদ বয়ে নিয়ে গেলো ভারবাহীর দল, রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভার সুসজ্জিত পালকি ঘুঙুরের ধ্বনি তুলে অদৃশ্য হলো প্রাসাদের অভ্যন্তরে। আর লালী হীরাবাঈ অযোধ্যাপ্রসাদের তাঞ্জাম প্রবেশ করলো সঙ্গীতভবনে।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স বিস্মিত হলো হীরাবাঈকে

দেখে, লালীর পরিচয় পেয়ে। বললে, রাজাবাহাদুর যুদ্ধে গিয়েও গান ভুলতে পারেননি বাঈসাহেবা। লুট করে এনেছেন সবচেয়ে সেরা জহরত, নয়া-বুলবুল।

হীরাবাঈ হেসে বললে, বেশক বুলবুল। নাচে তাউসের পেখম ওড়ায় লালবাঈ, গানে বুলবুলকেও হার মানায়।

সত্যিই সে বুলবুলকে হার মানাবে, ভেবেছিলো লালী।

ভেবেছিলো আসরে বিষ্ণুপুরের রাজাবাহাদুরকে দেখতে পাবে, মন ভোলাতে পারবে তার গানে। রহিম খাঁর মৃত্যু হয়েছে, রঘুনাথকে জয় করবে লালী। জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে রহিম খাঁর বেগম হতে চেয়েছিলো লালী, ভেবেছিলো সারা হিন্দুস্থান জয় করে বাদশাহ হবে রহিম খাঁ। সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে তার, কিন্তু মনের গোপনে তার বেগম হবার দুরাশা লুকিয়ে আছে। রূপ আর গানের মোহে বন্দী করবে সে রঘুনাথকে।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার মোহেই বুঝি গানের আসরকেও ভুলে গেলো রঘুনাথ।

প্রতিদিনের মতোই সঙ্গীতভবনে জলসার আসর বসে। গোলাপী পেঁচদার পাগড়িটা মাথায় ভালো করে বসিয়ে নিয়ে তানপুরা টেনে নেয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। দু'এক কলি তানের ঝলক ছেড়ে কৃষ্ণমোহনকে বলে, আমি তো এক পা কবরে রেখেছি, তোমার গলার কাজ দেখাও বেটা।

প্রবীণ গদাধরের দিকে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে তাকায় কৃষ্ণমোহন। অনুমতি প্রার্থনা করে।

হাসে গদাধর! বলে, আমার অনুমতি চেয়ে আমাকে লজ্জা দিও না কৃষ্ণমোহন। আমি তোমার গুরু নই, তুমিই আমার গুরু, সঙ্গীতগুরু তুমি।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৃদু স্বরে গান শুরু করে কৃষ্ণমোহন।

—আওঅন কহগয়ে অজ হুঁ নহী আয়ে···

মৌজের আনন্দে হঠাৎ দ্রুতলয়ে মৃদঙ্গের ধ্বনি তুলে হেসে ওঠে পীর বক্স। হীরাবাঈ তার রক্তিম গালে সুললিত মুদ্রাভঙ্গিমায় অনামিকা স্পর্শ করে তন্ময় হয়ে শোনে।

ভাবে বিভোর হয়ে যায় অযোধ্যাপ্রসাদ, তবলার তালে তালে নেচে ওঠে তার শরীরের ছন্দ।

কিন্তু লালবাঈয়ের যেন ভালো লাগে না সে-গান। মনের গোপনে তার অসহ্য এক প্রতীক্ষার জ্বালা। রঘুনাথের অপেক্ষায় যেন দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকে সে।

রঘুনাথ, রঘুনাথ! মনের মধ্যে গুনগুন করে একটি নাম।

কৃষ্ণমোহনের গান শেষ হতেই বাহবা দিয়ে ওঠে সকলে। মাথা নেড়ে সাবাস দেয় বাহাদুর খাঁ।

আর লালবাঈ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এমন গান, তবু মেজাজ নেই মাইফেলের। রাজাবাহাদুর না থাকলে কি...

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সকলে। বলে, সত্যি, রাজাবাহাদুর না থাকলে জলসার মেজাজ আসে না। মনে হয় আসল সমঝদারই নেই।

সকলের মনই উড়ু উড়ু করে রঘুনাথের অভাবে।

বাহাদুর খাঁ হেসে বলে, ঠিক কথা। রানীজীর সুরত দেখে ভুলে গেছেন রাজাবাহাদুর, গানকে বোধ হয় তালাক দিয়ে দেবেন।

অন্দর-মহলের খবর অজানা নয় কারও। দাসীদের কাছে, জরিয়াদের কৌতুকে সকলেই জানতে পেরেছে রঘুনাথের কথা। একদিন যেমন গানের নেশায় সব ভুলে থাকতো রঘুনাথ, বধূর রূপময় মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি সব ভুলে আছে বিষ্ণুপুররাজ।

রঘুনাথের আনন্দ কেড়ে নিতে চায় না কেউ। কিন্তু রাজাবাহাদুরের অনুপস্থিতিতে কেমন যেন জলসা জমে না, মৌজ আসে না মুজরার।

কৃষ্ণমোহন বলে, চলুন গুরুজী, প্রাসাদে গিয়ে তাঁর স্বপ্ন ভাঙিয়ে নিয়ে আসি আসরে।

গদাধর মৃদু হেসে নিষেধ করে। বলে, না না, জীবনের যৌবনের গানে মেতে আছেন তিনি, সে মেজাজ নষ্ট করে তাঁকে গলার গান শোনাতে আনবে ?

বাহাদুর খাঁ মাথা নেড়ে পাগড়ি ঠিক করতে করতে সায় দেয়। বলে, ঠিক বলেছো বেটা, জিন্দিগির গীত গলার গানের চেয়ে বড়ো।

রাজপ্রাসাদের অন্দর-মহলেই এদিকে দিনের পর দিন কেটে যায় রঘুনাথের। জীবনের গানেই মেতে থাকে বিষ্ণুপুররাজ।

সেদিনও এমনি প্রমোদরঙ্গে মেতে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে প্রমারা খেলছিলো রঘুনাথ। সুরঞ্জাক্ষী এবং অন্যান্য সখিবৃন্দ রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার চারপাশে ঘন হয়ে বসে দেখছিলো রাজা ও রাজপত্নীর খেলা। কৌতুকে রসিকতায় কখনো বা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিলো।

প্রমারায় তাস বিলি করে চন্দ্রপ্রভা বললে, এবার আমার জিত হবে সুরঞ্জাক্ষী।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, তোমাকেই যিনি জয় করে এনেছেন তাঁর কাছে তোমার জিত হলেও তা হার।

চন্দ্রপ্রভা সলজ্জ হাসি হেসে তাস টিপে রাখলো, উলটে দেখতে সাহস হলো না। পাছে 'ফিগরু' সরে থাকে। বার বার রঘুনাথের কাছে হার হয়েছে তার, এবার জিভতে না পারলে লজ্জা লুকোবার ঠাঁই হবে না। মনে মনে প্রার্থনা করলে, যেন তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরে থাকে।

চন্দ্রপ্রভা তাস তুললে। রঘুনাথও তাস তুলে দেখলো। রঘুনাথের হাতে কাতুর, চন্দ্রপ্রভার হাতে মাছ।

কেউ বুঝলো না কেন হঠাৎ গান থেমে গেলো লালীর, কেনই বা এমন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রঘুনাথ।

হীরাবাঈ শুধু বললে, রাজাবাহাদুরকে তস্‌লিম দাও লালী।

লালীর কানে গেলো না সে-কথা। অকস্মাৎ যেন একরাশ লজ্জা এসে জমা হলো তার সুন্দর মুখে। শরমে রক্তিম হয়ে উঠলো তার সারা মুখ।

তস্‌লিম দিতে পারলো না লালী। লজ্জায় শুধু মাথা নুয়ে পড়লো তার।

প্রমারার নেশা নয়। নববধূর স্বপ্নরঙিন চোখের উদ্দামতায় সব ভুলে গিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে উচ্ছল আনন্দে ডুবে গিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা। হাসি আর কৌতুকে, সঙ্গসুখের মুগ্ধপ্রেমে যেন অবগাহন করছিলো। ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিলো রঘুনাথের বলিষ্ঠ মুখকান্তি।

একসময় অকারণেই মনের পটে চকিতে খেলে গেলো জ্যোতিষাচার্যের সাবধানবাণী।—বড়ো ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট মা তোমার ললাটে। রাজরানী হয়ে এসেছো তুমি সঙ্গে এক বিষধর নাগিনীকে নিয়ে। এক বিধর্মী পাপিষ্ঠা সুরের জাল ফেলে বসে আছে সঙ্গীত-উন্মাদ রঘুনাথের জন্যে।

কথাটা মনে পড়তেই সারা শরীর যেন কেঁপে উঠলো চন্দ্রপ্রভার, শিউরে উঠলো তার অসহায় বুক, মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সব কৌতুক আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে নিবে গেলো, শঙ্কিত আর্তনাদ গুমরে মরলো তার মনের গোপনে। প্রমারার উচ্ছলতায় আর কোনো আনন্দ খুঁজে পেলো না চন্দ্রপ্রভা, বিচলিত মনের একাগ্রতা ফিরিয়ে আনতে পারলো না প্রমারার তাসে।

রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাতেও যেন ভয় পেলো চন্দ্রপ্রভা, দু'চোখের আড়ালে থমকে রইলো অসহায় কান্না, বিমূঢ় ব্যথা।

বার বার অনুরোধ জানালো রঘুনাথ। চোখের কোণে কপট হাসি টেনে বার বার অসম্মতি জানালো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর রাজকার্যের অজুহাতে রঘুনাথ বিদায় নিয়ে গেলো। অলিন্দে অপেক্ষা করে ছিলো চন্দ্রপ্রভা। হঠাৎ দেখলে রাজপ্রতীক-চিহ্নিত পতাকা তুলে প্রাসাদের পালকি গিয়ে থামলো সঙ্গীতভবনের সামনে। বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভা। গুমরে গুমরে কাঁদলো ক্ষোভে আর দুঃখে।

আর কিশোর গোপাল কখন অলক্ষ্যে এসে ধীরে ধীরে একটি হাত রাখলো চন্দ্রপ্রভার পিঠে। ফিরে তাকালো চন্দ্রপ্রভা। আর তার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সুরঙ্গাক্ষী। বললে, কি হলো চন্দ্রপ্রভা? বিষ্ণুপুরের বৌরানীর চোখে জল শোভা পায় না সই, ওঠো।

সজল চোখ মেলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা। গোপালকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অশ্রুসিক্ত মুখে হাসির প্রলেপ দেবার চেষ্টা করে চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিলো, বড়ো দুঃখময় অদৃষ্ট আমার সুরঙ্গাক্ষী, বৌরানী নই আমি, আমি...

সপ্রশ্ন চোখে তাকালো সুরঙ্গাক্ষী।

ধীরে ধীরে মাথা নুয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভার।

বললে, আমার জীবনের চেয়েও প্রিয় আমার স্বামী, তাকেই গ্রাস করবার জন্যে উন্মত্তা হয়েছে যবনী গায়িকা।

শুনলো সুরঙ্গাক্ষী। চুপ করে রইলো। কথা খুঁজে পেলো না, সান্ত্বনা খুঁজে পেলো না। কি সান্ত্বনা দেবে সে নবপরিণীতা রাজপত্নীকে!

সজল চোখে সুরঙ্গাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা, উত্তরের অপেক্ষায়, সান্ত্বনা পাবার আকাঙ্ক্ষায়। তারপর ধীরে ধীরে

হাসতে হাসতে লক্ষ টাকার মোহর তুলে নিয়ে ঋণ শোধ করে দিলো চন্দ্রপ্রভা।

সুরঞ্জাক্ষী সহাস্যে বললে, চন্দ্রপ্রভা বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মী মহারাজ, ফিগরু ধরলে ফুরুস হয় ও হাতে, ফুরুস পাচার করলে কোরেন্তা।

রঘুনাথ হেসে আবার তাস বিলি করতে যাচ্ছিলো, চন্দ্রপ্রভা বললে, না, আর নয়।

—কেন? মৃদু হেসে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে।

চন্দ্রপ্রভা সলজ্জ উত্তর দিলে, বহু কষ্টে ঋণ শোধ করেছি, আর ঋণ করতে চাই না!

রঘুনাথ কৌতুকে হেসে উঠলো। তারপর আবার অনুরোধ করলে। চন্দ্রপ্রভা তবু রাজী হলো না। দুশ্চিন্তায় সারা মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, হঠাৎ মনে পড়লো সুরঞ্জাক্ষীর গোপন সাবধানবাণী। রূপের আকর্ষণকে ভুলতে পারেন রঘুনাথ, কিন্তু সুরের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সঙ্গীতভবনের রূপসী যে গায়িকাকে বন্দী করে এনেছে রঘুনাথ তাকে ভয় পায় চন্দ্রপ্রভা। জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, সারা বিষ্ণুপুর সেই রূপসী কাঞ্চনীকে ভয় পায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা। কথা থমকে রইলো তার চোখের আড়ালে। ধীরে ধীরে প্রাসাদের অলিন্দে এসে তাকালো সে যমুনাবাঁধের দিকে। মৃদু হেসে চন্দ্রপ্রভার পাশে এসে দাঁড়ালো রঘুনাথ।

সঙ্গীতভবনের গবাক্ষের দিকে চোখ গেলো রঘুনাথের। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী।

এই অতুলনীয়া রূপসীকেই কি বন্দী করে এনেছে সে? কাছে যাবার আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো রঘুনাথ। গোপনে

দ্বারীকে বললে, সঙ্গীতভবনে খবর পাঠাও, গানের আসর বসবে আজ।

বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ আসবেন! খবর শুনেই উল্লসিত হয়ে উঠলো বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স। হীরাবাঈকে বললে, গান শুরু করো হীরা, এমন গান—যা শুনে মহলে ফিরতে চাইবে না রাজাবাহাদুর।

হীরাবাঈ হেসে বললে, আমি নই ওস্তাদজী, লালবাঈ শোনাবে সে গান।

পীর বক্স বললে, হ্যাঁ, বুলবুলের গান হবে আজ।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো লালী। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও বিষ্ণুপুররাজের দর্শন পায়নি সে, জানতে পারেনি কে সেই বীরশ্রেষ্ঠ যিনি বন্দী করে এনেছেন তাকে।

গানের সুরে যেন প্রাণ ঢেলে দিলো লালী। তন্ময় হয়ে গেলো কৌশিকীর মূর্ছনায়।—সগুন শোহাওঅন আজু লায়ে সুখ; নয়নন চয়নন সো ভাওএ। পিয়া অবহঁী আওএজে বহোত চিহ্ন, প্রগট ভয় নিতহ উনকী…

হঠাৎ একসময় গান থেমে গেলো লালীর।

রঘুনাথ প্রবেশ করলো আসরে। না, কোনো রাজসিক বেশ নয়। গায়ে গরদের উড়নি, পরিধানে গরদের ধুতি। সৌম্য শান্ত সাধকের চেহারা।

তন্ময় হয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ রঘুনাথের দিকে চোখ গেলো লালীর, আর সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেলো তার।

বিস্ময়ে আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেলো লালবাঈ।

ইনিই বিষ্ণুপুররাজ? এ যে বিবিবাজারের সেই সুপুরুষ অশ্বারোহী! যৌবনের সন্ধিক্ষণে লালী যে এরই পায়ে সমস্ত দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে!

উঠে দাঁড়ালো। নববধূর বেশ, বধূরানীর ঐশ্বর্য-উজ্জ্বল সাজপোশাক ফেলে দিয়ে চন্দ্রপ্রভা শরীরে জড়ালো বৃন্দাবনী শাড়ি। মণিমুক্তার স্বর্ণালঙ্কার খুলে ফেললো। চন্দনের তিলক আঁকলে কপালে।

বৈষ্ণবীর বেশে সাজিয়ে দিলো সুরঞ্জাক্ষী। ফুলমালায় জড়িয়ে দিলো কালো কেশের বামঠাম কবরীর চূড়া। আঁকলে রসকলির রূপময় রেখা। আর গোপালকে সাজিয়ে দিলো কিশোর গোপালের বেশে।

যৌবনদেহে নূপুরের ছন্দ বাজিয়ে শান্ত পায়ে মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা। সঙ্গে গোপাল।

সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শান্তি বাসনা করলে, জ্বালা জুড়োতে চাইলে বুকের।

তারপর ধীরে ধীরে গুনগুন করলো স্নিগ্ধমধুর পদলহরী।

গান থামলো। গানের রেশ মিলিয়ে গেলো বাতাসে।

সুরঞ্জাক্ষী দেখলে চন্দ্রপ্রভার দু'টি কপোল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে, চোখে তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সুরঞ্জাক্ষী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। চোখ ভিজে এলো সুরঞ্জাক্ষীর।

সূর্য নিবে গেলো, সন্ধ্যা নেমে এলো ক্রমশ।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, চলো চন্দ্রপ্রভা, বিষ্ণুপুররাজ হয়তো প্রাসাদে ফিরে এসেছেন।

উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা। তারপর হঠাৎ সুরঞ্জাক্ষীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।—না, না সুরঞ্জাক্ষী, আমি পারবো না, আমার প্রিয়কে এ ভাবে হারাতে আমি পারবো না।

সুরঞ্জাক্ষী কোনো উত্তর দিলো না, সান্ত্বনার দৃঢ় আলিঙ্গনে আরো কাছে জড়িয়ে ধরলো চন্দ্রপ্রভাকে। বললে, মিথ্যা আশঙ্কা তোমার, বিষ্ণুপুররাজ সঙ্গীতের পূজারী, যবনীর রূপের পূজারী ন'ন তিনি।

চন্দ্রপ্রভা প্রাসাদে ফিরে এলো ধীর পায়ে। শয্যাকক্ষে।

সুরঙ্গাক্ষীর কথায় বুঝি সান্ত্বনা পেলো চন্দ্রপ্রভা।

কিন্তু কই, রঘুনাথ তো ফিরে আসেননি এখনও।

ঝরোকায় দাঁড়িয়ে শ্যামবাঁধের দিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা, উদাস দৃষ্টি মেলে।

রাত ঘন হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। দীপমালা ফুটে উঠেছে প্রাসাদ ঘিরে, নগরের প্রতিটি সৌধে। আলোয় আলোকিত সারা নগরী। নিদ্রাচ্ছন্ন গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে যায়।

তবু দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে অপেক্ষা করে চন্দ্রপ্রভা। অভিসারিণীর ভীত বিস্মিত প্রতীক্ষায়।

দূর থেকে ধীরে ধীরে গানের সুর ভেসে আসে।

চকিত চোখে সঙ্গীতভবনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় চন্দ্রপ্রভা। ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় সঙ্গীতভবনের রহস্যে-ঘেরা পৃথিবীটাকে স্বচক্ষে দেখে আসতে।

কি আছে ওই সঙ্গীতের সুরে, কি আছে সঙ্গীতভবনের স্বপ্নময় বাতাসে? কিসের নেশায় ছুটে গেছেন রঘুনাথ?

অপেক্ষা, অপেক্ষা।

পতিপ্রতীক্ষিতা এক যৌবনবতী নারীর অধীর বক্ষস্পন্দন যেন নিজেই শুনতে পায় চন্দ্রপ্রভা। অনিমেষ চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর একসময় সঙ্গীতভবনের আলো নিবে যায় একটির পর একটি। আঠারো দাঁড়ের জলধ্বনি কানে আসে। চন্দ্রপ্রভা দেখতে পায়, রঘুনাথের ফেনশুভ্র বজরা এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভার মুখ।

গবাক্ষ থেকে সরে এসে শয্যার ওপর বসে চন্দ্রপ্রভা, আবার ছুটে যায় গবাক্ষে। সময়কে মনে হয় দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ। অধৈর্য হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভা।

বজরা এসে থামে প্রাসাদলগ্ন শ্বেতমর্মরের ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হয় চন্দ্রপ্রভার মুখে, রক্তিম হয়ে ওঠে তার কর্ণমূল।

ছুটে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কপট নিদ্রায় অভিভূত হয়ে যায়। হু'টি চোখ বুজে শুয়ে থাকে চন্দ্রপ্রভা, কানে আসে রঘুনাথের পদধ্বনি। সজাগ কান পেতে সে শব্দ শোনে চন্দ্রপ্রভা।

কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসে পরিচিত পায়ের শব্দ।

নিঃশ্বাস রোধ করে যেন নির্জীব পড়ে থাকে চন্দ্রপ্রভা। অগুরু কস্তুরীর স্নিগ্ধ সুবাস ভেসে আসে। কল্পনার চোখে অনুভব করে চন্দ্রপ্রভা, রঘুনাথ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। হয়তো···

হ্যাঁ, একদৃষ্টে মোহময় চোখে চন্দ্রপ্রভার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথ। অনুসন্ধিৎসুর মতো চন্দ্রপ্রভার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে কি যেন খোঁজে রঘুনাথ, কি যেন দেখতে চায়। আপন গলার ফুলমালা খুলে কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠে পরিয়ে দেয় রঘুনাথ। নিজের মনেই হাসে।

তারপর দ্বারপ্রান্তের দীপ নিবিয়ে দেয়।

একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ে শয্যার ওপর।

নিঃশব্দে চন্দ্রপ্রভার পাশে শুয়ে পড়ে রঘুনাথ। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসে তার। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়ে।

চন্দ্রপ্রভা চোখ খোলে। লজ্জিত, উৎকণ্ঠিত চোখে ফিরে তাকায় রঘুনাথের মুখের দিকে। দেখে, জ্যোৎস্নার রুপালী আলো এসে পড়েছে রঘুনাথের মুখে। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের কণ্ঠে ফুলমালা দেখতে পায়।

আনন্দের, কৌতুকের মৃদু হাসি খেলে যায় তার অধরের ওষ্ঠে। সোহাগভরে ফুলের মালাটি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রপ্রভা, আঘ্রাণ নেয়, মুখের ওপর তার স্পর্শ নিয়ে যেন বিচিত্র এক পুলক অনুভব করে।

অকস্মাৎ নিজের কণ্ঠ থেকে ফুলমালা খুলে নিয়ে নিদ্রিত রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দেয়।

কিন্তু সঙ্গীতভবনের আকর্ষণকে তুচ্ছ করতে পারে না রঘুনাথ। সন্ধ্যার বাতাস যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। অন্ধকার নিশীথের নিঃশব্দতায় কি যেন এক নেশা।

ছুটে যাবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার শান্ত প্রেমের ধূপ-সুগন্ধে আনন্দ আছে, উদ্দামতা নেই। ফুর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দিতে চায় রঘুনাথ, ক্লান্ত বোধ করে চন্দ্রপ্রভার সংযত প্রেমালাপে।

ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতভবনই তার মনকে অধিকার করে বসে!

গানের পর গান গেয়ে চলে লালবাঈ। দিনের পর দিন ভেসে চলে নাচের তরঙ্গে। রাজকার্য ভুলে যায় রঘুনাথ। প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়।

শয্যাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হঠাৎ তাই পথরোধ করে দাঁড়ায় চন্দ্রপ্রভা। বলে, কিসের নেশায় এভাবে প্রতিদিন তুমি ছুটে যাও?

মৃদু হাসে রঘুনাথ।—ভয় নেই চন্দ্রপ্রভা, এ শুধুই গানের নেশা। ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি। সব সুখদুঃখ স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলিয়ে মানুষকে মহৎ করে তোলে এই গান, মর্তের মানুষকে স্বর্গের স্বাদ এনে দেয়।

চন্দ্রপ্রভা বলে, স্বর্গের স্বাদ কি নারীর কাছে নিষিদ্ধ, প্রিয়? কি এমন দুঃখ তোমার মনে লুকিয়ে আছে যে গানের নেশায় তাকে ভুলতে হয়! সে-দুঃখ কি আমি দূর করতে পারি না?

কৌতুকের হাসি হাসে রঘুনাথ। মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে দু'টি সবল বাহুর আলিঙ্গনে তাকে বুকের নিবিড়ে টেনে নিয়ে বলে, কোনো দুঃখ নেই চন্দ্রপ্রভা, কোনো দুঃখ নেই।

কিন্তু সঙ্গীত আমার সাধনা। তোমার মদনমোহনকে তুমি ছাড়তে পারো চন্দ্রা? ছাড়তে পারো তোমার পূজা অর্চনা?

চুপ করে থাকে চন্দ্রপ্রভা, উত্তর দিতে পারে না। কুণ্ঠিত স্বরে শুধু বলে, কিন্তু তোমার সাধনা কি প্রাসাদে হতে পারে না প্রিয়? আমিও কি পেতে পারি না তার প্রসাদ?

কৌতুকে হেসে ওঠে রঘুনাথ। বলে, মদনমোহনকে ডাকতে হলে দেবদেউলে ছুটে যাও কেন চন্দ্রপ্রভা, তোমার এই শয্যাকক্ষে কি মদনমোহন সাড়া দিতে পারে না!

চন্দ্রপ্রভার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনে বলে, ভয় নেই চন্দ্রা, ভয় নেই। সঙ্গীতভবন আমার সঙ্গীত-সরস্বতীর দেবমন্দির।

ধীরে ধীরে আলিঙ্গন শিথিল করে বিদায় নেয় রঘুনাথ। এসে উপস্থিত হয় সঙ্গীতভবনে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। জলসা জমে ওঠে।

ওলন্দাজ বণিকদের কাছে কেনা দুর্মূল্য ঝাড়লণ্ঠনের সারি শত শিখায় জ্বলে ওঠে, পারস্যের বহুবর্ণ গালিচায় ঝুমঝুম ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে চলে। কখনো বা নিঃসঙ্গবাদ্য সুকণ্ঠ-সঙ্গীত।

সুরার পাত্র শেষ হয়, আবার ভরে ওঠে বিদেশী মদ্যের স্নিগ্ধ-সৌরভে। সুগন্ধ কুসুমের মালা, চন্দনের রাজটীকা। 'জরিয়া' দাসীদের পরিচর্যায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় রঘুনাথ।

রাত ঘন হয়ে আসে। নিদ্রাক্লান্ত কণ্ঠে একে একে সঙ্গীদের বিদায় নিতে বলে রঘুনাথ। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, পীর বক্স, হীরাবাঈ, লালবাঈ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে আপন আপন কক্ষে ফিরে আসে তারা।

দাসীরা প্রশ্ন করে, প্রাসাদে ফিরবেন না মহারাজ?

তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠের উত্তর আসে, না।

একে একে ঝাড়লণ্ঠনের শিখা নিবিয়ে দিয়ে যায় বাতিদার। ক্লান্ত হাতে দাসীর দল আভের পাখা নাড়ে।

লালবাঈ হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে তার আপন কক্ষে। পৃথিবী নিঃঝুম, নিশ্চুপ।

মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ একসময় নিদ্রা ভেঙে যায় লালবাঈয়ের। নিঃশব্দতার মাঝে অন্ধকারে দু'টি জাগর-চোখ মেলে পড়ে থাকে। মনের কোণে প্রশ্ন জাগে, রঘুনাথ কি এখনো জলসামহলে নিদ্রিত? প্রাসাদে ফিরে যাননি বিষ্ণুপুররাজ?

ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ায় লালবাঈ। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দ, অন্ধকার। শুধু যমুনাবাঁধের কালো জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব কাঁপে। চোখের দৃষ্টি তার ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ঘুরে এসে থমকে দাঁড়ায় রাজপ্রাসাদের একটি গবাক্ষে।

একটি কক্ষে এমন গভীর রাত্রিতেও উজ্জ্বল আলো দেখতে পায় লালবাঈ। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পায়, রাজপত্নী চন্দ্রপ্রভা গবাক্ষে দাঁড়িয়ে আছে উদাস দৃষ্টি মেলে। যেন কার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে লালবাঈয়ের কপালে। তবে কি প্রাসাদে ফেরেননি রঘুনাথ?

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জলসামহলে নেমে আসে লালবাঈ। ধীর পদক্ষেপে জলসামহলে প্রবেশ করে। দ্বারপ্রান্তের দীপশিখা থেকে জ্বালিয়ে তোলে কক্ষের একটি প্রদীপ। ক্ষীণ আলোকে দেখতে পায়, গালিচার ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ। অদূরে দাসী দু'জনও নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

অনিমেষ নয়নে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো লালবাঈ।

একটি উপাধান এনে রাখলে রঘুনাথের শিয়রে, নিজের শরীরে জড়ানো কোমল কাশ্মীরী শালখানিতে সাবধানে ঢেকে দিলো রঘুনাথের নিদ্রিত দেহ।

এ এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। আপন দেহের শীতবস্ত্র রঘুনাথের

শরীরের স্পর্শ পেলো, আর লালবাঈয়ের মনে হলো যেন রঘুনাথের আলিঙ্গনস্পর্শে শিহরিত হলো তার দেহমন। বহুক্ষণ একদৃষ্টে রঘুনাথের নিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো লালবাঈ।

গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক নিঙড়ে।

তারপর দাসীদের ডেকে তুললো ধীর স্বরে। চমকে জেগে উঠলো তারা, শঙ্কিত হলো।

লালবাঈ মৃদু হেসে বললে, মহলে ফিরে যাও তোমরা। বৌরানী অপেক্ষা করে আছেন, তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। বলবে, লালবাঈ থাকতে তাঁর স্বামীর কোনো অযত্ন হবে না।

রঘুনাথের আশায় বিনিদ্র রজনী অপেক্ষায় কেটে গেলো চন্দ্রপ্রভার। তারপর একসময় জরিয়ার মুখে খবর শুনলো। শুনলো লালবাঈয়ের সান্ত্বনাবাণী। সান্ত্বনা নয়, ঈর্ষার তীর বিঁধলো যেন বুকে। সন্দেহ দেখা দিলো।

সঙ্গীতসাধনার নামে লালবাঈয়ের প্রমোদকক্ষেই কি নিশি যাপন করছেন রঘুনাথ?

তুচ্ছ এক যবনী কিনা নিশ্চিন্ত হতে বলেছে বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মীকে। বলেছে, লালবাঈ থাকতে তাঁর স্বামীর কোনো অযত্ন হবে না।

সান্ত্বনা নয়, লালবাঈয়ের কথায় যেন বিদ্রূপের বিষ দেখতে পেলো চন্দ্রপ্রভা। সান্ত্বনা নয়, যেন গর্বিতা এক নারী অহঙ্কারের কণ্ঠে বলছে, সে তার রূপের আকর্ষণে বিষ্ণুপুররাজকে চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

তা হোক, কোনো আপত্তি করবে না চন্দ্রপ্রভা, কোনো প্রশ্ন করবে না। নিজের অদৃষ্ট মেনে নিয়ে নিঃশব্দে সহ্য করে যাবে সব দুঃখ, সব বঞ্চনা।

জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়লো।—বড়ো ভয়াবহ অদৃষ্ট তোমার বৌরানী!

সেদিন শিউরে উঠেছিলো চন্দ্রপ্রভা। আজ আবার নতুন করে শিউরে উঠলো মনের মধ্যে লালকাঈয়ের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখা দিতেই।

পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলো, সব মিথ্যা, মিথ্যা সন্দেহ। হিন্দুধর্মের, বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুর। সমগ্র ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছে, শিক্ষা সংস্কৃতি দর্শন, হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর দেবদেবী বিনষ্ট হয়েছে বিধর্মীর অত্যাচারে, তবু বিষ্ণুপুর কোনোদিন মোগলের পদানত হয়নি, হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই বিষ্ণুপুরের ভূস্বামী কখনো কাঞ্চনীর প্রণয়ে লুব্ধ হয়ে পাপের পথে নেমে যেতে পারে!

না, চন্দ্রপ্রভার সব সন্দেহ বুঝি মিথ্যা।

সঙ্গীত, সঙ্গীতের আকর্ষণই রঘুনাথকে টেনে নিয়ে যায়। রূপযৌবন নয়, শরীরের আসক্তি নয়।

সখীকে প্রশ্ন করে চন্দ্রপ্রভা, সঙ্গীতভবনের সব সঙ্গীতজ্ঞই কি বিধর্মী? হিন্দুর কণ্ঠে কি সুর নেই?

সুরঞ্জাক্ষী মৃদু হেসে বলে, আছে। একজনের কণ্ঠে সব রাগরাগিণী বন্দী হয়েছে, কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠে।

—কৃষ্ণমোহন? চন্দ্রপ্রভা বলে, গোপনে তাকে আমার কক্ষে আমন্ত্রণ জানাতে পারো?

বিস্মিত হয় সুরঞ্জাক্ষী। চন্দ্রপ্রভার চোখের তারায় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, কেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা কোনো উত্তর দেয় না।

সুরঞ্জাক্ষী বিচলিত বোধ করে। বলে, কৃষ্ণমোহন কি আমার আমন্ত্রণে এই নির্দিষ্ট কক্ষে দেখা দিতে সম্মত হবেন চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা কলমদান নিয়ে এসে ধীরে ধীরে একটি আমন্ত্রণ-লিপি লিখে বলে, এই চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছে দিলেই তিনি আসবেন। কিন্তু এ-চিঠির কথা গোপন রাখতে বলবে তাঁকে, বলবে তাঁর

ওপর শুধু বৌরানীর ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র বিষ্ণুপুরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে নেয় চন্দ্রপ্রভা। মনকে প্রবোধ দিয়ে অন্ধ হয়ে থাকতে চায় না, পরীক্ষা করে দেখতে চায় কিসের আকর্ষণে ছুটে যায় রঘুনাথ।

বৌরানীকে নিশ্চিন্ত হতে বলে এক তুচ্ছ সুরসাধিকা? 'লালবাঈ থাকতে বিষ্ণুপুররাজের কোনো অযত্ন হবে না', সান্ত্বনা দিয়েছে কাঞ্চনী।

অহঙ্কারের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছে চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈয়ের এই প্রবোধ বাক্যে। সন্দেহ উঁকি দিয়েছে তার মনে। হয়তো বা ঈর্ষাও।

কখনো কোনো নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে হঠাৎ অনুশোচনার শিখা জ্বলে ওঠে চন্দ্রপ্রভার বুকে। মনের কোণে শৈশবের রঙিন মধুর স্মৃতিকে পুষে রেখেছিলো চন্দ্রপ্রভা, যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাই চোখের সামনে হঠাৎ ঝলসে উঠেছিলো হার্মাদ দস্যুর আক্রমণ আর রঘুনাথের দুঃসাহসিক প্রতিরক্ষার দৃশ্য।

উজ্জ্বল লাল রঙের শিরস্ত্রাণ, গাঢ় সবুজের আংরাখা। শত শত অশ্বারোহী হার্মাদ দস্যু সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তীর্থযাত্রীদের ওপর। কিশোরী চন্দ্রপ্রভা সেদিন হয়তো প্রাণ হারাতো পর্তুগীজ নৃশংসতার সম্মুখে, হয়তো বা বন্দী হতো। অসীম শৌর্যের প্রতীক হয়েই যেন রঘুনাথ সেদিন প্রতিরোধ করেছিলো দস্যুর আক্রমণ, রক্ষা করেছিলো চন্দ্রপ্রভাকে। অপরিচিতা এক তীর্থকন্যার মনে বীজ বুনে দিয়েছিলো গোপন প্রেমের।

তারপর সেই মধুস্নিগ্ধ অভিসার-লগ্ন। খড়্গেশ্বরী বিগ্রহের সামনে আত্মদানের শপথ গ্রহণ করেছিলো চন্দ্রপ্রভা। পূজারীর দক্ষিণার রৌপ্যপাত্রে একটি স্বর্ণবিল্বপত্র প্রণামী দিয়েই চমকে উঠেছিলো চন্দ্রপ্রভা, আরেকটি স্বর্ণপত্রের শব্দে। বিস্ময়ে চোখ

ফিরিয়ে খুঁজেছিলো, কে এই রাজসিক প্রণামী নিবেদন করেছে। তারুণ্যের মৃদুহাস্যে উজ্জ্বল দু'টি চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো চন্দ্রপ্রভার উৎসুক দু'টি নীলের সমুদ্রছায়া।

প্রাসাদের গোপন অভিসারকক্ষে রঘুনাথের কণ্ঠে শত বিনিদ্র রজনীর সুপ্তস্বপ্নে গাঁথা প্রণয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা। আর রঘুনাথ বিষ্ণুচক্র অঙ্কিত অঙ্গুরীয় খুলে পরিয়ে দিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভার অনামিকায়, শপথ গ্রহণ করেছিলো, জীবনে কোনো দুর্বল মুহূর্তেও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না।

সে-প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিলো চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথের ওপর এই অবিচল আস্থার ফলেই আহ্বান জানিয়েছিলো আশঙ্কার মুহূর্তে, আত্মসমর্পণ করেছিলো স্বেচ্ছায়, বিনাযুদ্ধে।

সব শপথ বুঝি ভুলে গেছে রঘুনাথ!

লালবাঈ!

রূপলাবণ্যময়ী এক যৌবনজীবিনীর আকর্ষণে বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ নাকি আত্মহারা। সঙ্গীত-সাধক রঘুনাথ তার সুকণ্ঠ সঙ্গীতের প্লাবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার ছন্দোময় শরীরনৃত্যের ঘূর্ণিতে সব প্রতিজ্ঞা বুঝি হারিয়ে গেছে।

পঁচিশ

বাঁদীবাজারের সামান্যা এক নারী ঐশ্বর্যের মোহে অতীতকে ভুলে গেছে। দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে তার জীবন থেকে।

ফকিরসাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়লেই চঞ্চল হয়ে ওঠে লালী, লালবাঈ।—একটি রাজ্যপরিচালনার শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়।

রাজ্য নয়, বিষ্ণুপুররাজকে হাতের মুঠোয় আনতে চায় লালী। তার যৌবনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চায় রঘুনাথকে।

কিন্তু নারীর প্রতি যেন কোনো আকর্ষণ নেই রঘুনাথের। কাঞ্চনীর রূপযৌবন নয়, কণ্ঠস্বরকেই ভালোবেসেছে রঘুনাথ। সঙ্গীতের নেশাতেই ছুটে আসে, সঙ্গ পাবার নেশায় নয়।

নানান কৌশলের সাহায্য নেয় লালী, মসলিনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে হাতছানি দেয় দেহের যৌবনছন্দ, সুর্মাটানা চোখের কোণে ইঙ্গিতের বহ্নিশিখা—সব ব্যর্থ হয়।

গান, শুধু গান। গানের নেশাতেই তন্ময় হয়ে থাকে রঘুনাথ। নতুন নতুন তানের পরীক্ষা চলে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সামনে।

কৃষ্ণমোহনকে বলে, কি নতুন গীত রচনা করেছো শোনাও কবিবন্ধু।

শোনায় কৃষ্ণমোহন। ধ্রুপদ-গাম্ভীর্যে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সাবাস দিয়ে ওঠে রঘুনাথ। সাবাস দেয় পীর বক্স। বাহবার ধ্বনি অনুরণিত হয় সকলের কণ্ঠে। কিন্তু লালবাঈকে বড়ো ম্লান দেখায়।

গোপন মনে যেন ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে লালবাঈ। তার কণ্ঠ শুধু সুরকে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিত্য নতুন গান রচনা করার প্রতিভায় তার কণ্ঠকেও যেন অপমান করে কৃষ্ণমোহন।

যেদিনই কৃষ্ণমোহন নতুন কোনো গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এসে উপস্থিত হয়, সেদিন রঘুনাথের কোনো ভ্রূক্ষেপই থাকে না লালবাঈয়ের দিকে।

তন্ময় হয়ে গেয়ে চলে কৃষ্ণমোহন!

গান থেমে যায়। অপূর্ব এক স্তব্ধ মূর্ছনায় সে-গানের রেশ থেকে যায় সঙ্গীতভবনের অগুরু-সুগন্ধ বাতাসে।

রঘুনাথ আনন্দে অধীর হয়ে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণমোহনকে। বলে, সার্থক তোমার সাধনা কৃষ্ণমোহন, সার্থক এই বনবিষ্ণুপুর। তুমি একাধারে কবি, গীতিকার, সঙ্গীতগুরু। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেও তুমি বঙ্গভাষার বন্ধনে বন্দী করেছো, ভবিষ্যতের বঙ্গবাসীকে তুমি এক সম্পদ দিয়ে গেলে কৃষ্ণমোহন।

লজ্জায় মাথা নত করে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহন। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে।

ওস্তাদ পীর বক্স মৃদু মৃদু হাসে তার অস্বস্তি দেখে। রঘুনাথের কথার প্রতিধ্বনি তোলে বাহাদুর খাঁ।

গদাধর বলে, আমি জানতাম কৃষ্ণমোহন, যেদিন অভিভূতের মতো প্রথম তানপুরা তুলে নিয়েছিলে সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম সঙ্গীতকে তুমি ফিরিয়ে আনবে, বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার স্রষ্টা হবে তুমি, সৃষ্টি করবে বাংলার নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

ঘরোয়ানার স্রষ্টা? মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে লালবাঈ। তার কণ্ঠের মাধুর্যকে বুলবুলের শিস্ বলেছে সকলে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো প্রতিভা কৃষ্ণমোহন?

গান দিয়েই রঘুনাথের মন ভোলাতে চেয়েছিলো লালবাঈ। কিন্তু তার কণ্ঠ যেন পরাজিত হয়েছে কৃষ্ণমোহনের কাছে।

যৌবনজ্বালায় উন্মাদ হয়ে ওঠে লালবাঈ। সঙ্গীত নয়, রঘুনাথকে আপন আয়ত্তে আনার জন্যে কাঞ্চনীর সব ছলাকলা প্রয়োগ করবে সে। প্রেম দিয়ে প্রতিভাকে জয় করবে।

ক্রমে সঙ্গীতভবন থেকে একে একে বিদায় নেয় সকলে। একটি একটি করে জলসামহলের আলো নিবে যায়।

সকলকে বিদায় দিয়ে সঙ্গীতভবনের অলিন্দে এসে দাঁড়ায় রঘুনাথ। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধোয়া শ্যামবাঁধের নিথর জলের দিকে তাকিয়ে।

দূর থেকে লক্ষ্য করে লালবাঈ।

ধীরে ধীরে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়ায়।

লালবাঈয়ের দিকে চমকে ফিরে তাকিয়েই আবার উদাস দৃষ্টি মেলে দেয় রঘুনাথ।

প্রশ্ন করে।—কি দেখছো বুলবুল! কি ভাবছো?

লালবাঈ মৃদু হেসে বলে, দেখছি ঐ শ্যামবাঁধ আর আপনার এই বহুমূল্য বজরা। এমন চাঁদনী রাতে ঐ বজরায় নৌকাবিহারে যেতে ইচ্ছে হয় রাজাবাহাদুর।

বিস্মিত চোখে লালবাঈয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে রঘুনাথ।

কাঞ্চনীর সামান্য বাসনা শুনে কৌতুক বোধ করে। বলে, চলো বুলবুল, তোমার এই তুচ্ছ কামনা অপূর্ণ রাখতে চাই না।

জ্যোৎস্নাধৌত চন্দ্রাতপে নৌকাবিহারে বের হয় রঘুনাথ আর লালবাঈ। শ্যামবাঁধের জলে ভেসে চলে বারো দাঁড়ের বজরা।

ভাসমান বজরার মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বুলবুলের গান শোনে রঘুনাথ। ধীরে ধীরে স্বর ফুটে ওঠে লালবাঈয়ের কণ্ঠে। বিমুগ্ধ তন্ময়তায় গান শুনতে শুনতে উচ্ছ্বসিত আবেগে রঘুনাথ বলে ওঠে, সাবাস বুলবুল, তোমার এ অপূর্ব সঙ্গীত কোনোদিন ভুলবো না

আমি। একটি নির্জন রাত্রির এই অমূল্য উপহারের বিনিময়ে কি উপহার চাও তুমি, বলো কাঞ্চনী।

নতমস্তকে কপট লজ্জায় লালবাঈ অস্ফুটে উচ্চারণ করে, আপনার প্রেম মেহেরবান!

শিহরিত হয়ে ওঠে সারা শরীর। রঘুনাথ বিচলিত কণ্ঠে বলে, না না, একি অদ্ভুত কামনা তোমার?

সশব্দে হেসে ওঠে লালবাঈ। বলে, জানি রাজাবাহাদুর! মুসলমানী আপনার অস্পৃশ্য, মুসলমানীর প্রেম গ্রহণ করতেও আপনি নারাজ।

রঘুনাথ প্রতিবাদ করে।—না কাঞ্চনী, আমার কাছে হিন্দু আর মুসলমানে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু প্রেমকে ভয় পাই আমি।

মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে লালবাঈ। সব ছলাকলা, কাঞ্চনীর সব কৌশল সে প্রয়োগ করবে আজ। রঘুনাথকে জয় করবে।

লীলায়িত ভঙ্গিমায় আপন দেহকে রঘুনাথের কাছে টেনে এনে অপূর্ব ভ্রূবিলাসের মোহ সৃজন করে লালবাঈ প্রশ্ন করে, তবে কেন আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে এভাবে ভেঙে দিতে চান রাজাবাহাদুর?

শুধু প্রেম, সেটুকু উপহার দিতেও কেন এমন কৃপণতা রঘুনাথের। শুধু প্রেমের কাঙাল কাঞ্চনী, তার রূপযৌবন, তার কণ্ঠের সুর উপঢৌকন দিতে এসে এভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে?

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রম দেখা দিলো রঘুনাথের মনে। অকস্মাৎ তার শরীরের শিরা উপশিরায় যেন এক অনাস্বাদিত উন্মাদনা জেগে উঠলো। ইচ্ছে হলো দু'টি বাহুর প্রবল আকর্ষণে লালবাঈকে বুকের নিবিড়ে টেনে নিতে। কিন্তু না। নিজেকে সংযত করলে রঘুনাথ। শুধু অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো রূপময়ী যবনকন্যার লাস্যময় দু'টি চোখের ঘন নীল তারার দিকে।

লালবাঈ রঘুনাথের সুপ্তকামনার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলো। তাকে জয় করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠলো লালবাঈ।

এদিকে প্রাসাদ-গবাক্ষে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে গুনে নিশীথ কেটে যায় চন্দ্রপ্রভার। দুশ্চিন্তার রেখা ফোটে কপালে।

ক্রমশ রঘুনাথের ব্যবহারেও যেন পরিবর্তন দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভা।

স্বপ্নময় দু'টি চোখে আগামী দিনের রোমাঞ্চ বোনে, উদাস দৃষ্টি মেলে শ্যামবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন নিজের মনেই স্নিগ্ধ হাসি হাসে চন্দ্রপ্রভা। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার চোখ।

যেন ছোট্টো একটি শিশুর পদধ্বনি শুনতে পাবার আশায় কান পেতে থাকে। পরক্ষণেই সচকিত হয়ে ওঠে, তন্ময়তা ভেঙে যায়। দু'চোখে অশ্রু নামে তার। সন্তানকামনার ব্যর্থতায় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের গভীর থেকে।

নির্জনে একাকিনী বসে বসে স্বপ্ন দেখে চন্দ্রপ্রভা, যেন তার কোলে এসেছে একটি স্বরূপ শিশু। স্বপ্নশিশুর মুখের দিকে তাকিয়েই সব বেদনা ভুলতে চায় সে, ভুলতে চায় রঘুনাথের তাচ্ছিল্য অপমান আঘাত। কিন্তু মদনমোহনের আশীর্বাদ কি পাবে না সে? রাজরানীর কোল আলো করে আসবে না কেউ?

নিঃসন্তান চন্দ্রপ্রভার বেদনা ভোলাবার জন্যে রাজপুরোহিত বলেন, প্রজাই তোমার সন্তান মা, এত সন্তান তোমার, তুমি দুঃখ পাও কেন সন্তানের জন্যে?

রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপাল ক্রীড়াসঙ্গীদের ছেড়ে হঠাৎ চন্দ্রপ্রভার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্তানস্বপ্ন ভুলে পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রপ্রভা। আর জ্যোতিষাচার্য বলেন, সন্তানস্নেহে পালন করো মা গোপালকে, বিষ্ণুপুরের ভবিষ্যৎ বংশধরকে।

সস্নেহে তাকে বুকের নিবিড়ে টেনে নেয় চন্দ্রপ্রভা।

না, শান্তি পেয়েছে চন্দ্রপ্রভা। কাঞ্চনী লালবাঈয়ের মোহে ডুবে থাক রঘুনাথ, ভুলে যাক রাজকার্য, সমাজসংসার, ভুলে যাক চন্দ্রপ্রভাকে। মদনমোহনের চরণে নিজেকে নিবেদন করেছে চন্দ্রপ্রভা, তাই হয়তো কিশোর গোপালের রূপ নিয়েই মদনমোহন এসে ধরা দিয়েছেন চন্দ্রপ্রভার কোলে।

সন্তানের স্বপ্ন ঘিরে একদিন কতো বিনিদ্র আনন্দমুখর রাত কেটে গেছে রঘুনাথ আর চন্দ্রপ্রভার। পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রণয়-কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে কতো মধুর কল্পনার রাজ্য গড়েছে ভবিষ্যতের স্নেহলালিত সন্তানকে ঘিরে।

কিন্তু তারপরই এক সময় মিলনানন্দে যতি পড়েছে, আশঙ্কায় থমথম করে উঠেছে চন্দ্রপ্রভার বুক। মনে হয়েছে, বুঝি তার সন্তান-কামনা সার্থক হবে না কোনোদিন।

আহত অভিমানে দূরে সরে গেছে চন্দ্রপ্রভা, মদনমোহনের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে, নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মাচরণের গভীরে, ভুলে থাকতে চেয়েছে, ভুলে থেকেছে রঘুনাথকেও।

এতোদিন সঙ্গীতের মধ্যেই ডুবে ছিলো রঘুনাথ, নারীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসার স্পর্শে কি রোমাঞ্চ, জানতো না। প্রণয়ের প্রদীপ-শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে কোন অশুভ লগ্নে দূরে সরে গেছে চন্দ্রপ্রভা।

আর চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে লালবাঈ এসে জ্বালা ধরিয়েছে রঘুনাথের বুকে।

তবু সত্যাশ্রয়ী রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা ভুলতে চায়নি! লালবাঈয়ের সব ছলাকলা, যৌবনের সব লোভানি উপেক্ষা করে চলেছিলো সে। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার আচরণ দুর্বোধ্য মনে হলো তার। সন্দেহ উঁকি দিলো গোপন মনে।

তবে কি চন্দ্রপ্রভার হৃদয়ের গভীরে কোনো ছায়া ফেলেনি রঘুনাথের প্রেম?

কে জানে! রঘুনাথ আহত অভিমানে ভাবলে, হয়তো

আকস্মিক অবিবেচনার ফলেই তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলো চন্দ্রপ্রভা। হয়তো সে-ঘোর কেটে গেছে তার, তাই রঘুনাথের বাহুবন্ধনকে অসহ্য মনে হয়।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কিন্তু ক্রমশ যেন মদনমোহনের পায়েই আশ্রয় নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে চন্দ্রপ্রভা।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত মন বিষিয়ে ওঠে রঘুনাথের। চন্দ্রপ্রভাকে আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তোলবার জন্যে মন স্থির করে রঘুনাথ।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার বুঝি ঘুম ভাঙে না। বুঝতে পারে না কিসের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে রঘুনাথ।

সেদিনও এমনি পদাবলীর কলি **গুনগুন** করে প্রাসাদে ফিরে এলো চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ গবাক্ষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো চন্দ্রপ্রভার জন্যে। সহাস্য মুখে এগিয়ে এলো রঘুনাথ।

মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে বৈষ্ণববেশে সজ্জিতা চন্দ্রপ্রভার শান্ত মধুর রূপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে আহ্বান জানালো রঘুনাথ। অধৈর্য আবেগে ছুটে গেলো তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্যে।

পরক্ষণেই রোষকষায়িত দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে গেলো চন্দ্রপ্রভা।

বিমূঢ় বিরক্তিতে, বিস্ময়ের চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো রঘুনাথ। তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো।

না, এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় রঘুনাথ। সত্যাশ্রয় নয়, শান্তি পেতে চায়।

সঙ্গীতভবনে লালবাঈয়ের কক্ষদ্বারে এসে দাঁড়ালো রঘুনাথ।

চমকে ফিরে চাইলো লালবাঈ। বিস্ময়ের আভাস মুছে যেতে না যেতেই মুখে তার ফুটে উঠলো আনন্দের ছায়া।

রঘুনাথ এসেছেন। বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ আপনা থেকেই এসে দাঁড়িয়েছেন তার বাসনার দ্বারে।

শত শত অভিনয়-কৌশলে যাকে আকর্ষণ করতে পারেনি লালবাঈ, জয় করতে পারেনি যে কামনার পাত্রকে, আজ নিজেই এসে ধরা দিয়েছে সেই অমূল্যনিধি।

ছুটে এসে মৃদু হেসে তসলিম্ করার জন্যে মাথা নীচু করলে লালবাঈ। কিন্তু তার পূর্বেই রঘুনাথের দু'টি সবল বাহু তাকে টেনে নিলো বুকের নিবিড়ে।

বললে, লালী, লালবাঈ, শান্তি পেতে চাই আমি, শুধুমাত্র শান্তি চাই তোমার কাছে।

রঘুনাথের দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়লো। লালবাঈয়ের চোখেও দেখা দিলো আনন্দের অশ্রু।

বললে, আমার এই কক্ষ থেকেও শান্তি উধাও হয়েছিলো রাজাবাহাদুর। শান্তি পেতে চাই, আমিও শান্তি চাই আপনার কাছে।

রঘুনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে লালবাঈ ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে।

তারপর দিনে দিনে চন্দ্রপ্রভাকে ভুলে গেলো রঘুনাথ। ডুবে গেলো লালবাঈয়ের অবৈধ প্রণয়ে।

প্রণয়? না। উচ্চাশার কামনাবহ্নিতে জ্বলে উঠলো লালবাঈ। রাজাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে, রাজ্যকেও হাতের মুঠোয় আনতে চায়। শান্তি নয়, বিলাসের স্রোতে সুখ আহরণ করতে চায়।

অসন্তোষের গুঞ্জন ওঠে সঙ্গীতভবনে। গানের মেজাজ ফিরে পায় না কেউ।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর মনে ক্রোধ গুমরে মরে লালবাঈয়ের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনীর প্রেমকে অবহেলা করে না বাহাদুর খাঁ, কিন্তু এ কি দুর্বার বাসনা তার? এ কি ভয়ঙ্কর উচ্চাশা?

চোখের সামনে গদাধরও দেখতে পায়, লালবাঈয়ের বিলাসব্যসন চরিতার্থ করার জন্যে ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী হয়ে উঠছে রঘুনাথ।

প্রজার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শত শত দরিদ্রের রক্তে বুঝি লালবাঈয়ের গাল রক্তিম হয়ে উঠেছে।

অসন্তোষ আর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে প্রজাকুল। অর্থাভাবে সঙ্গীতভবনের আয়ুও বুঝি ক্ষীণ হয়ে আসে।

গদাধর বলে, ওস্তাদজী, এভাবে মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতে দেবেন না রাজাবাহাদুরকে।

বাহাদুর খাঁর চোখেও বিষণ্ণতা নামে। বলে, এ বড়ো দুর্জয় আকর্ষণ চক্রবর্তী। এ মৃত্যু থেকে রাজাবাহাদুরকে বাঁচাতে পারে একমাত্র লালবাঈ, তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তোলে হীরাবাঈ। বলে, লালীকে একদিন একশো মোহর দিয়ে কিনে এনেছিলাম বাঁদীবাজার থেকে। মুক্তি দিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। আজ সকলের স্বার্থ ভেবে তার কাছে বাঁদীর মতোই অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে হবে ওস্তাদজী

মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ছলছল চোখে সৌকত খাঁ বলে, তাই হোক বেটি, ভিখ্ চেয়ে নে রাজাবাহাদুরকে। লালীকে সন্তানের ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিস বেটি, তোর ভিক্ষাই মঞ্জুরী পাবে তার কাছে…

বিষ্ণুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে, সঙ্গীতভবনের ভবিষ্যৎ ভেবে লালবাঈয়ের সামনে গিয়ে হাজির হলো হীরাবাঈ।

বললে, তোমার কুহকের ছায়া থেকে রঘুনাথকে মুক্তি দাও লালী, রাজ্যকে মুক্তি দাও।

অট্টহাসে হেসে উঠলো লালী। বিদ্রূপের স্বরে বললে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও হীরাবাঈ, নিজের সুরতের দিকে তাকিয়ে দেখো।

চমকে উঠলো হীরাবাঈ। এ কী অপমান ছিটিয়ে দিলো লালী!

আবার সশব্দে হেসে উঠলো লালবাঈ। বললে, কবরের ওপর পা রাখতে চলেছো হীরাবাঈ, এখনো যৌবনের জ্বালা ঘুচলো না?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে লালীর দিকে তাকিয়ে রইলো হীরাবাঈ। দু'চোখ ভরে জল জমে উঠলো। আশ্চর্য! মানুষ বদলে গেছে লালী, মনুষ্যত্ব বুঝি হারিয়ে গেছে।

ব্যর্থ ব্যথায় হীরাবাঈ ছুটে পালিয়ে এলো লালীর কাছ থেকে। কন্যার মতো যাকে মানুষ করে তুলেছে তার কাছেই এমন ভাবে ইজ্জত হারাতে হবে, ভাবেনি সে।

বিদায় নিয়ে পালিয়ে এলো হীরাবাঈ। কিন্তু লালী জ্বলে উঠলো অন্ধ আক্রোশে।

রঘুনাথকে বললে, আমার কাছ থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিতে চায় হীরাবাঈ, আমাকে দূরে সরিয়ে আপনাকে গ্রাস করতে চায়, রাজাবাহাদুর।

সুরাপাত্র নামিয়ে রেখে রঘুনাথ হাসলো, বিকৃত হাসি।

লালবাঈ বললে, আমাকে ঘিরেই যখন এতো ষড়যন্ত্র, তখন আমাকেই বিদায় দিন রাজাবাহাদুর, যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাই আমি।

বিব্রত রঘুনাথ দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো লালবাঈকে, সুরাসক্ত কণ্ঠে বললে, না না, লালী, তোমাকে ছাড়তে পারবো না আমি, ছেড়ে থাকতে পারবো না। কি চাও তুমি বলো?

লালবাঈ মৃদু হেসে বললে, গানের জলসায় হীরাবাঈকে অপমান করে এ অন্যায় বাসনার জবাব দিতে হবে রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ বললে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা লালী!

সত্যই বুঝি তাই। লালবাঈয়ের কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখতে চায় না রঘুনাথ।

রাজকোষের অবস্থা জানতে চায়নি রঘুনাথ, প্রজার দারিদ্র্যের খবর রাখতে চায়নি।

লালবাঈ বলেছে, সঙ্গীতভবনের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে রাজাবাহাদুর, আমাদের পৃথক আনন্দভবন নির্মাণের আদেশ দিন।

রঘুনাথ সায় দিয়ে আদেশ দিয়েছে খাজাঞ্চীকে।

লালবাঈ বলেছে, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধের পাশে আমাদের পৃথক একটি বাঁধ নির্মাণ করবার আদেশ দিন রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ আদেশ দিয়েছে। বলেছে, তোমাকেও চিরস্মরণীয় করে রাখবো লালী, এ-বাঁধের নাম হবে লালবাঁধ।

খুশী হয়ে উঠেছে লালবাঈ।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার মনের গোপন ব্যথা জানতে চায়নি রঘুনাথ। জানতে চায়নি তারই মঙ্গলের জন্যে কি এক অসহ্য বেদনা লুকিয়ে রেখেছে চন্দ্রপ্রভা।

মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে গুনগুন স্বরে গান গায় চন্দ্রপ্রভা, পদাবলীর রসমাধুর্যে তন্ময় হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে শুধু সুরঞ্জাক্ষী এসে বাধা দেয়। আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে চন্দ্রপ্রভাকে। বলে, পাটরানীর সম্মান ফিরিয়ে আনতে হবে, যবনযুবতীর লালসার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে রঘুনাথকে।

তবু মন যেন বিশ্বাস করতে রাজী নয়।—না সুরঞ্জাক্ষী, সব সন্দেহ হয়তো বা মিথ্যা। সঙ্গীতের আকর্ষণই হয়তো বিষ্ণুপুররাজকে সঙ্গীত-ভবনে টেনে নিয়ে যায়, নারীর সৌন্দর্য নয়। সুরঞ্জাক্ষীর প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রপ্রভা নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দেয়।

সুরঞ্জাক্ষী বলে, না চন্দ্রপ্রভা, সত্যিই লালবাঈয়ের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন বিষ্ণুপুররাজ। তার প্রমাণ—

গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সুরঞ্জাক্ষী। তারপর ইশারায় ডাক দেয় চন্দ্রপ্রভাকে। বলে, ঐ দেখো চন্দ্রপ্রভা!

চন্দ্রপ্রভা দেখতে পায় শত শত শ্রমিক দল বেঁধে চলেছে। একটি সুদীর্ঘ দীঘি খনন করা হবে।

সুরঞ্জাক্ষী বলে, লালবাঈয়ের অনুরোধ রক্ষা করছেন মহারাজ, ঐ দীঘির নামকরণ হবে লালবাঁধ। যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ,

গণ্টনবাঁধের পাশে এই লালবাঁধ সৃষ্টি হচ্ছে লালবাঈকে বিষ্ণুপুরের বুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে। আর—

—আর? আর কি সুরঞ্জাক্ষী?

মৃদু হেসে সুরঞ্জাক্ষী উত্তর দেয়, ঐ দেখো চন্দ্রপ্রভা, রাজমিস্ত্রীর দল চলেছে। গড়ে তুলবে ওরা একটি নতুন ইমারত। লালবাঈয়ের আনন্দমহল, প্রজাদের মুখে 'নূতন মহল'।

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে চন্দ্রপ্রভার বুক নিঙড়ে। ব্যর্থ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সুরঞ্জাক্ষীর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রপ্রভা প্রশ্ন করে, কিন্তু এর কি কোনো প্রতিকার নেই সুরঞ্জাক্ষী?

দুঃখের হাসি হেসে সুরঞ্জাক্ষী উত্তর দেয়, আছে! কিন্তু সে বড়ো দুরূহ প্রতিকার।

ছাব্বিশ

আরেকজনের মনেও বিদ্বেষ জ্বালিয়ে তুলেছে লালবাঈ।

হীরাবাঈয়ের মনে।

দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা নামলো। এভাবে লালীর কাছে সে অপমানিত হবে কোনোদিন কল্পনাও করেনি!

মর্মর জাফরির পাশে দাঁড়িয়ে দূরের লালবাঁধের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো হীরাবাঈ!

এ যেন আপন সন্তানের কাছে অপমানিত হওয়া।

উদাস দৃষ্টিতে ঝরোকার পাশে দাঁড়িয়ে হীরাবাঈ দেখছিলো ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠেছে লালবাঁধ।

ঐশ্বর্য, আনন্দের মোহে লালী আজ ভুলে গেছে হীরাবাঈকে। ভুলে গেছে তিল তিল করে যত্ন আর সাধনা দিয়ে এক মূল্যহীন বাঁদীকে বাঈসাহেবায় রূপান্তরিত করেছে হীরাবাঈ। আর আজ সেই লালবাঈয়ের মনে এতোটুকু কৃতজ্ঞতা নেই।

দুঃখে অনুশোচনায় লালবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার উদাস দৃষ্টির সামনে অকস্মাৎ ঝলসে উঠলো অতীতের এক-টুকরো স্মৃতি। মনে হলো অযোধ্যাপ্রসাদের ওপর যে অবিচার করে এসেছে সে, এতোদিনে তারই যেন প্রতিদান পেলো লালীর কাছে।

অযোধ্যাপ্রসাদ!

মনে পড়লো সেই গ্রাম্য নদীর ঘাট। সিন্ধুকীর নির্দেশে নবাবের গুপ্তফৌজ একদিন অযোধ্যাপ্রসাদের নববধূকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো নদীর ঘাট থেকে।

তারপর গ্রাম্যবধূদের কাছে সে সংবাদ শুনে দুঃখে হতাশায় বুঝি

ছুটে এসেছিলো অযোধ্যাপ্রসাদ। অশ্রুঝরা দু'চোখ মেলে ব্যর্থ দৃষ্টিতে নবাবের বজরা খুঁজেছিলো। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাটের সিঁড়ি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলো কয়েকটুকরো ভাঙা শাঁখা ; আর শূন্য কলস। মনের গোপনে নববধূর প্রেম লুকিয়ে রেখে দিন কেটেছিলো তার। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হয়নি অযোধ্যাপ্রসাদের।

কলঙ্কের চিহ্ন নিয়ে একদিন ফিরে এলো সেই গ্রাম্যবধূ। কিন্তু দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানাতে পারলো না।

সেইদিন থেকে শুরু হলো হীরাবাঈয়ের নিরুদ্দেশ যাত্রা। স্বামীর প্রতি আক্রোশে তার দু'চোখ জ্বলে উঠলো পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করবার আগ্রহে।

কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের চেয়েও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা বড়ো হয়ে দেখা দিলো অযোধ্যাপ্রসাদের মনে। পেয়ে-হারানো প্রেমের অগ্নিদাহে অশান্ত বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে বছরের পর বছর হীরাবাঈকে খুঁজে বেড়ালো অযোধ্যাপ্রসাদ। শেষে দেখা পেলো।

সন্ন্যাসী অযোধ্যাপ্রসাদ বারাণসীর ঘাট থেকে উঠে আসছিলো গঙ্গাস্নান করে। হঠাৎ চোখোচোখি হলো। দ্রুত পায়ে সরে যেতে গিয়েও মন থমকে দাঁড়ালো হীরাবাঈয়ের।

অপমানে জর্জরিত করে সেদিন অযোধ্যাপ্রসাদকে লাঞ্ছিত করেছিলো হীরাবাঈ।

আর অযোধ্যাপ্রসাদ বলেছিলো, তোমাকে ফিরে চাই না হীরা, তোমাকে ফিরে পাবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু তোমার দেখা পেতে চাই, শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন তোমাকে কাছে পাই, এইটুকুই আমার অশান্ত হৃদয়ের কামনা।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলো হীরাবাঈ এ ভিক্ষার কথা শুনে। হয়তো বা মায়া। বেতনভুক সারেঙ্গীওয়ালাদের দলে নিয়োগ করেছিলো সে অযোধ্যাপ্রসাদকে।

বলেছিলো, কিন্তু অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে আমাদের সেদিনের সম্পর্ক। আর পৃথিবীর কোনো তৃতীয় প্রাণী যেন না জানতে পারে যে অযোধ্যাপ্রসাদ আর হীরাবাঈয়ের মধ্যে কোনোদিন কোনো নিকট-সম্পর্ক ছিলো।

ভিক্ষা মঞ্জুর হয়েছিলো অযোধ্যাপ্রসাদের, আর এইটুকু ভিক্ষা পেয়েই খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো তার ব্যথা-কাতর ছ'টি চোখ।

অপেক্ষার অত্যাচারে যে-মানুষটির সমস্ত জীবন বিনষ্ট করেছে হীরাবাঈ, আজ মনে হলো সে-ই যেন তার প্রধান সম্বল। সব আশা ভরসা অবলম্বন শেষ হয়ে গেছে, মাটিতে মিশে গেছে সব সম্মান।

জল-থৈ-থৈ লালবাঁধ আর যমুনাবাঁধের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হীরাবাঈয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠলো অযোধ্যাপ্রসাদের ছ'টি সজল চোখের দৃষ্টি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়ালো হীরাবাঈ, কিন্তু লজ্জায় অপমানে যেন ওস্তাদ সৌকত খাঁর দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারলো না।

বুড়ো সৌকত খাঁর চোখও ভিজে এলো। মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, আফসোস করে লাভ নেই হীরা। জিন্দিগির মতোই গলার কদরও চিরদিন থাকে না।

হীরাবাঈ সশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে, সব বরবাদ হয়ে গেলো ওস্তাদজী, সব বরবাদ হয়ে গেলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সৌকত খাঁ। কোনো কথা বললে না। কি বলবে সে! এ দুঃখ চাপা দেওয়া যায় না, লুকোনো যায় না এ অপমান। তা জানে ওস্তাদ সৌকত খাঁ।

বাঁদীবাজার থেকে একশো মোহর দিয়ে লালীকে কিনে এনেছিলো হীরাবাঈ। নিজের স্বার্থ ভুলে দিনের পর দিন শ্রান্তদেহে মহরা দিয়েছে নাচ আর গানের, লালীকে করে তুলেছে হিন্দুস্থানের সেরা বুলবুল। আপন সন্তানের জন্যেও কেউ বুঝি এমন

ভাবে নিজেকে দান করে না। বাঈসাহেবাদের আদব শিখিয়েছে সযত্নে, তাকে মাইফেলে হাজির করেছে নিজের ইজ্জত নিচে নামিয়ে। সেই লালীর গান আজ তাকে এভাবে অপমানিত করবে, কে জানতো।

প্রতিদিনের মতোই সঙ্গীতভবনের আসরে গান শুরু করেছিলো হীরাবাঈ। তন্ময় হয়ে শুনছিলো বিষ্ণুপুরের সমঝদারের দল। সাবাস দিচ্ছিলো ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ আর পীর বক্স।

এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো রঘুনাথ। সুরাসক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, কোয়েল নয়, কউয়া। গান বন্ধ করো হীরাবাঈ, এ গান শুনলে লালবাঈ বেবাক তান ভুলে যাবে।

বলেই লালীকে ইশারা করলো রঘুনাথ।

সুরার নেশা মনে করে রঘুনাথকে হয়তো ক্ষমা করতো হীরাবাঈ। কিন্তু লালী?

রঘুনাথের ইশারা পেয়েই কৌতুকের হাসি হেসে তানপুরা তুলে নিলো লালী, গান শুরু করলো।

সেই একই গানের পদ গুনগুন করে গুঞ্জন তুললো জলসাঘরে। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলো হীরাবাঈ। বাঈজীর কানুন ভুলে গেলো নাকি লালী? রঘুনাথের কথার জবাবে হীরাবাঈয়ের তারিফ ফুটলো না কেন লালীর মুখে! আর যে গান হীরাবাঈয়ের আপন ঘরোয়ানা, সেই গানই কিনা লালবাঈ গাইতে শুরু করলো হীরাবাঈয়ের সামনে বসে!

বাঈজীর জীবনে এর চেয়ে বড়ো অপমান নেই, জানে সৌকত খাঁ। তাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো না।

শুধু মেহেদি-রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, জিন্দিগির মতো গলার কদরও চিরদিন থাকে না হীরা।

হীরাবাঈ সশব্দে কেঁদে উঠলো। বললে, সব বরবাদ হয়ে গেছে ওস্তাদজী, সব বরবাদ হয়ে গেলো।

সৌকত খাঁ চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর একসময় উঠে গেলো ধীরে ধীরে।

রাত নেমে এলো ক্রমে ক্রমে।

উদাস দৃষ্টিতে লালবাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় তন্ময়তা ভাঙলো হীরাবাঈয়ের। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ওস্তাদজী চলে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে তানপুরাটার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইলো হীরাবাঈ। ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে তার ক্রোধ ফুটে উঠলো। দু'চোখে চমক দিলো নৃশংস দৃষ্টি।

তানপুরাটার কাছে এগিয়ে এলো হীরাবাঈ।

তারপর হঠাৎ একটার পর একটা তার ছিঁড়ে ফেললে। কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো যেন সারা ঘর। ছিন্নতন্ত্রীর স্বরধ্বনি নয়, যেন এক ব্যর্থ জীবনের আশাভঙ্গের কান্না।

একটির পর একটি তার ছিঁড়ে ফেললো হীরাবাঈ, রক্তের রেখা ফুটে উঠলো তার আঙুলে।

সব তার ছিঁড়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে সব সুর।

অপরিসীম ক্রোধে তানপুরাটা সজোরে ছুঁড়ে ফেললো হীরাবাঈ। সশব্দে ভেঙে পড়লো সেটা।

উন্মাদের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো হীরাবাঈ। নিশঃব্দ পায়ে এসে ঢুকলো অযোধ্যাপ্রসাদের ঘরে।

ক্ষীণ আলোয় দেখলে তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে শুয়ে আছে অযোধ্যাপ্রসাদ।

কাছে এগিয়ে এলো হীরাবাঈ। তবু চোখ খুললো না অযোধ্যাপ্রসাদের।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো হীরাবাঈ।

একটি কোমল হাত এসে স্পর্শ করলো অযোধ্যাপ্রসাদের কপাল।

চমকে উঠে বসলো অযোধ্যাপ্রসাদ।

মৃদু হাসি খেলে গেলো হীরাবাঈয়ের চোখে। বললে, ওঠো। চলো।

—কোথায় ?

—যে-দিকে তোমার ইচ্ছে হবে।

উঠে দাঁড়ালো অযোধ্যাপ্রসাদ। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না হীরাবাঈয়ের কথা। বললে, কী বলছো হীরা ?

—চলো। ধীর স্বরে হীরাবাঈ বললে, সমস্ত জীবন অপেক্ষা করেছো তুমি, আর অপেক্ষা নয়। চলো।

বিস্ময় কাটলো না তবু।

অযোধ্যাপ্রসাদ বললে, তুমি বোধহয় প্রকৃতিস্থ নও হীরা ; যাও, বিশ্রাম করতে যাও।

—না। মনস্থির করেছি আমি, চলো যেদিকে খুশি, যেখানে গেলে শান্তি পাবে তুমি, সেখানেই যেতে চাই।

হঠাৎ সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অযোধ্যাপ্রসাদের।

বললে, ক্ষমা করেছো হীরা, ভুলতে পেরেছো ?

মৃদু হাসি খেলে গেলো হীরাবাঈয়ের অধরে ওষ্ঠে।

বললে, তুমি আমার স্বামী। তোমাকে ক্ষমা করবো আমি ? তোমার ধর্ম সমাজ কুসংস্কারের জন্যেই একদিন আমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলে তুমি, তা জানি। কিন্তু ভালোবাসার টানেই তুমি সব ছেড়ে চলে এসেছো, অপেক্ষা করেছো এই দীর্ঘদিন। আর নয়

—এ-ভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করবো না আমি, না, না···

সশব্দে কেঁদে উঠে দু'হাতে অযোধ্যাপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরলো হীরাবাঈ।

কাঁদলো দু'জনেই। দু'জনে দু'জনের কাঁধে মুখ রেখে কান্না, কান্না।

তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের পথ ধরে দু'টি ছায়াশরীর মিলিয়ে গেলো পথের সীমান্তে।

বুড়ো সৌকত খাঁ দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে। ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো তার চোখ বেয়ে।

সুবে বাংলায় শান্তি নয়, যেন আতঙ্কের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে।

ডিহি কলিকাতায় ভাগীরথীর তীরে সন্তর্পণে যে গোপন দুর্গ গড়ে তুলেছিলো ইংরেজ বণিকের দল, এবার প্রকাশ্য ভাবেই তার নামকরণ হলো ফোর্ট উইলিয়ম। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামে ইংরেজের কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হলো।

দক্ষিণে ফরাসী পল্টন, উত্তরে ইংরেজ! শুধু বিদেশী সৈন্যের ভয়ই নয়, বন-বিষ্ণুপুরের বাণিজ্যও ক্রমশ কুক্ষিগত হতে চলেছে তাদের। বাট্টাদার মহাজনদের গঞ্জে পাঠান আর পর্ত্ আসরফি, মোগল মোহর, মারাঠা রুপা আর বাংলার টঙ্ক মুদ্রার সঙ্গে বিদেশী স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় বৃদ্ধি পেলো ক্রমে ক্রমে।

বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের দিকে প্রসারিত হলো দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্বের বাহু।

নাম-মাত্র রাজস্বের বিনিময়ে যে বন্ধুত্বের পাশে বিষ্ণুপুরকে আবদ্ধ রেখেছিলো মোগল বাদশাহেরা, মুর্শিদকুলি খাঁ সেই বন্ধুর রাজভাণ্ডারেও লোভের হাত বাড়ালো।

আওরঙ্গজেব বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার সুলতান আজিমুশ্বানের দেওয়ান নিযুক্ত করলেন মুর্শিদকুলি খাঁকে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর আওরঙ্গজেবের সুনজরে পড়ে হায়দ্রাবাদ থেকে বাংলার দেওয়ান পদ নিয়ে ফিরে এলো মুর্শিদকুলি। বাংলার জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে আলমগীরের প্রিয় হয়ে উঠলো।

জমিদারের রাজস্বের ভার এসে পড়লো প্রজাদের ওপর। যে বিষ্ণুপুর শুধুমাত্র সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা উপভোগ

করতো, তাকেও করদ রাজ্যে পরিণত করতে চাইলো মুর্শিদকুলি। রাজস্বের হাত বাড়ালো সেদিকেও, বিক্ষোভ দেখা দিলো বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের মনে!

মোগল বাদশাহদের অপেক্ষা ধর্মান্তরিত শাসকদের অত্যাচারই চিরকাল ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে হিন্দুর চোখে। মুশিদকুলি খাঁর অত্যাচার তাই বিষ্ণুপুরের আশঙ্কা শতগুণ বাড়িয়ে তুললো। গোপনে রঘুনাথের নামকরণ হলো দ্বিতীয় কালাপাহাড়।

বাঈজীর পায়ে সব ধর্ম-কর্ম ন্যায়-অন্যায় বিলিয়ে দিয়ে শুধু মাত্র ঈন্দ্রিয়সুখে ডুবে আছে রঘুনাথ। লালবাঈয়ের প্রতিটি ইচ্ছাপূরণের জন্যেই যেন সমগ্র বিষ্ণুপুর অপেক্ষা করে আছে। রাজকোষ নিঃশেষ হতে চলেছে লালবাঈয়ের বিলাস চরিতার্থ করে।

এদিকে মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠলো রাজ অন্তঃপুরে। কিশোর গোপালকে রাজবিদ্যায় দীক্ষিত করলেন প্রধান পুরোহিত। চন্দ্রপ্রভা নিঃসন্তান, সুতরাং উত্তরাধিকারের প্রশ্নের মীমাংসা করে রাখা প্রয়োজন বিষ্ণুপুরের স্বার্থে। কিন্তু রঘুনাথের কানে গেলো না সে-শঙ্খধ্বনি। প্রজারা আনন্দে জয়ধ্বনি করলো, জ্যোতিষাচার্য ভবিষ্যৎ গণনা করে আনন্দ প্রকাশ করলেন; সভাপণ্ডিত স্তোত্র উচ্চারণ করলেন রাজ্যের এবং গোপালের শুভায়ু প্রার্থনা করে।

প্রাসাদ ঘিরে দর্শন-ঝরোকার নীচে এসে জমায়েত হলো প্রজারা। আন্তরিক উল্লাসে রঘুনাথের দর্শন কামনা করলো। যুগ যুগ ধরে চিরন্তন রীতিতে এই দর্শন-ঝরোকার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে তারা প্রতি সূর্যোদয়ে। রাজদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করেছে রাজা হাম্বীর এবং রানী সুদক্ষিণাকে প্রণাম জানিয়ে, রাজা দুর্জন সিংহ এবং তাঁর পত্নীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, রাজা রঘুনাথ এবং রানী চন্দ্রপ্রভার যৌবনদিনের যুগলমূর্তিকে দেখে তুলনা করেছে মদনমোহন আর শ্রীরাধিকার যুগলমূর্তির সঙ্গে।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনুপস্থিতি ঘটেছে রঘুনাথের, লজ্জায়

অসন্তোষে চন্দ্রপ্রভাও কুণ্ঠিত হয়েছে একাকিনী গবাক্ষে দাঁড়িয়ে প্রজাদের দর্শন দিতে।

তাই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। লালবাঈয়ের আলিঙ্গনে রঘুনাথ নাকি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, ভুলে গেছে প্রজাদের স্নেহ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর ঐকান্তিক কামনা।

দিনের পর দিন কেটে গেছে চন্দ্রপ্রভার, ব্যথা আর বিষাদ ম্লান করে দিয়ে গেছে রূপোজ্জ্বল বধূরানীর মুখ। প্রজারা ব্যর্থ ব্যথাহত চোখের বিফল দৃষ্টি ফেলেছে রাজসমীপে, অনুশোচনার গুঞ্জন তুলে ফিরে গেছে তারা।

সব আঘাত সব অপমান সহ্য করেছে চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথ-অনুজ কিশোর গোপালের দিকে ম্লান বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সব নিরানন্দ মুছে ফেলতে চেয়েছে হৃদয়ের গভীর থেকে। সন্তানের অভাব দূর করেছে কিশোর গোপাল। রঘুনাথকে ভুলতে চেয়েছে তার মুখ চেয়ে।

কিন্তু লালবাঈ যেন রঘুনাথকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তৃপ্ত নয়। রাজ-সিংহাসনের দিকেও বুঝি লোভের হাত বাড়াতে চায় কাঞ্চনী।

গোপালের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন সভাপণ্ডিত। নিঃসন্তান রঘুনাথের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে গোপাল, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিত হলো বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রতিটি প্রজা।

ভোজনতলার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ সজ্জিত হলো মূল্যবান রঙ-ঝলমল চাঁদোয়ায়, আলোর মালা ফুটলো লতাপুষ্পে সাজানো আম্রকুঞ্জে।

সুর ধরলো রোশনচৌকির সানাই-বাদকের দল। সানাইয়ের সুর আনন্দে লহরা তুললো সিংহদ্বারের নহবতখানায়।

চন্দ্রপ্রভার সন্তানস্নেহ যে কিশোর দেবরকে কেন্দ্র করে, সেই গোপালের জন্মদিনে এই আনন্দের উল্লাসধ্বনি যেন অসহ্য মনে হলো

লালবাঈয়ের। কাম-মদির চোখের দৃষ্টিতে রঘুনাথকে অভিভূত করে কাঞ্চনীর অনুরোধ ফুটলো।—আমাকে বিদায় দিন রাজাবাহাদুর, বিষ্ণুপুররাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি।

আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তুলে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, কেন কাঞ্চনী, আমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে কেন চলে যেতে চাও তুমি? না না, লালবাঈয়ের রূপের সূর্য বিষ্ণুপুর থেকে অস্ত গেলে সমস্ত রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে।

কুটিল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো কাঞ্চনীর মুখ। বললে, শুধু মোহব্বতের জিঞ্জিরেই আশিককে বেঁধে রাখতে চান রাজাবাহাদুর!

—না লালী, শৃঙ্খলে নয়, আমার বাহুবন্ধনেই তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই। কি চাও তুমি বলো, কি পেলে তুমি খুশী হও?

মৃদু হেসে লালী উত্তর দেয়, লক্ষমুদ্রার একটি ময়ূরপঙ্খী চাই রাজাবাহাদুর, সে ময়ূরপঙ্খীতে শুধু তুমি আর আমি নৌকাবিহার করে বেড়াবো লালবাঁধের স্রোতে।

রঘুনাথ সম্মতি জানিয়ে বলে, কিন্তু রাজকোষ হয়তো এ অর্থ দিতে পারবে না লালী।

লালবাঈ অট্টহাসে হেসে ওঠে উন্মাদের মতো।

বলে, প্রজার অর্থই রাজার রাজকোষ। আদেশ দিন রাজাবাহাদুর, আপনার অনুজ গোপালের জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে আসার সময় রাজভাণ্ডারে যেন লক্ষমুদ্রার নজরানা জমা দিয়ে যায় প্রজার দল।

উদাস দৃষ্টি মেলে লালবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ নির্জীব ক্রীড়নকের মতো বলে, তাই হবে লালী, তাই হবে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো। দুঃস্থ দরিদ্র প্রজার দল শুনলো, শিশু-কুমারের উদ্দেশ্যে অর্পিত উপহার ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যয়িত হবে লালবাঈয়ের বিলাস-সামগ্রীর জন্যে।

নিরর্থক আক্রোশে জ্বলে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। উষ্মা প্রকাশ করলেন জ্যোতিষাচার্য আর সভাপণ্ডিত। দেওয়ানজী আর খাজাঞ্চী

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকোষের সংগৃহীত অর্থ তুলে দিতে বাধ্য হলেন রঘুনাথের হাতে।

গজদন্তের কারুকার্যে শোভিত ময়ূরপঙ্খী লালবাঁধের জলে ভেসে উঠলো। প্রজার রক্তমূল্যে কেনা দুর্মূল্য ময়ূরপঙ্খীতে গজল গানের রেশ ফুটে উঠলো দূরের ভোজনতলার সানাইবাদ্যকে উপহাস করে।

সুরার পাত্র তুলে নিয়ে তন্দ্রাঘোরে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে, আমাকে ছেড়ে যেও না লালী, ছেড়ে যেও না। যা কামনা তোমার—সব, সব কিছু তোমার পায়ে তুলে দেবো আমি।

কৌতুকের হাসি হেসে লালবাঈ প্রশ্ন করলো, সম্মান?

—হ্যাঁ, তাও পাবে কাঞ্চনী।

লালবাঈ বললে, অর্থ চাই না আমি রাজাবাহাদুর, ঐশ্বর্য চাই না। যে সম্মান আপনার পাটরানী চন্দ্রপ্রভার সেই ইজ্জত পেতে চাই আমি।

—পাবে লালবাঈ, পাবে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে রঘুনাথ।

লালবাঈ প্রশ্ন করে, আপনার ভাই গোপাল সিংহের জন্মদিনে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছে, আপনার সন্তানের জন্যে কি সে আয়োজন হবে রাজাবাহাদুর?

রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্তের মতো লালবাঈয়ের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বললো, হবে। নিশ্চয় হবে লালী।

ক্রমশই সন্দেহ ঘনীভূত হলো প্রজাদের। আশঙ্কা দেখা দিলো, রঘুনাথও হয়তো ইসলামধর্ম গ্রহণ করবে লালবাঈকে খুশী করবার জন্যে, হয়তো বা লালবাঈকে বিবাহ করে তাকেই বিষ্ণুপুরের পাট-রানীর মর্যাদা দিতে চাইবে। তারপর কালাপাহাড়ের রূপ নিয়েই শুরু হবে রঘুনাথের অত্যাচার। হয়তো বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমিকে যবনরাজ্যে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে রঘুনাথ।

কালাপাহাড় !

মুর্শিদকুলি খাঁর মতোই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়েছিলো কালাচাঁদ রায়ের। একটাকিয়ার জমিদার বংশে। মাতৃকুল ছিলো পরম বৈষ্ণব।

সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, অস্ত্রবিত্থায় বীরোচিত গুণের অধিকারী।

গৌড় বাদশাহের দরবারে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলো কালাচাঁদ। আর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাসভবন থেকে প্রতিদিন মহানন্দায় স্নান করতে যাবার সময় নবাবকন্যা তুলারী অপেক্ষা করতো সুদর্শন সুপুরুষ ব্রাহ্মণ যুবকের দর্শন পাবার আশায় !

বলিষ্ঠ রূপবান চেহারা, গলায় উপবীত, হাতে স্বর্ণময় কোষা, সুকণ্ঠে সঙ্গীত স্তোত্র। পিছনে চলতো ছাতাবরদার।

বাদশাহ এবং বেগম বুঝলেন, এই রূপবান হিন্দুযুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। একমাত্র কন্যাকে অসুখী করতে চাননি তাঁরা। তাই কালাচাঁদ রায়কে বললেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তুলারীর পাণিগ্রহণ করো।

কালাচাঁদ অসম্মত হলো।

বাদশাহ ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

জল্লাদ এগিয়ে এলো কর্তব্যপালনের জন্যে।

আর সেই মুহূর্তে সপ্তদশী নবাবকন্যা মর্মর জাফরির আড়াল থেকে ছুটে এসে বললে, আগে আমায় হত্যা করো, তারপর আমার স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করবে।

মুগ্ধ হলো কালাচাঁদ। বিস্মিত হলো রূপবতী যবনীর তুঃসাহস দেখে।

তুলারীকে বিবাহ করতে সম্মত হলো। কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে নয়। মুসলমানীকে বিবাহ করলেই বিধর্মী হতে হবে কেন, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলো না কালাচাঁদ। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে ধরনা দিলো, দেবতার প্রত্যাদেশ জানবার জন্যে। শ্রীমন্দিরের পুরোহিতকুল, কালাচাঁদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই অপমানিত করলো

তাকে। সমাজপতিরা বললে, মুসলমানীকে বিবাহ করে ধর্মত্যাগী হয়েছে কালাচাঁদ।

সামাজিক অনুশাসনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কালাচাঁদ নিজেই অত্যাচারী হয়ে উঠলো। প্রতিজ্ঞা করলো, ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ সাধন করবে।

স্বেচ্ছায় এবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো সে, নামকরণ হলো মহম্মদ ফরমুলি। হিন্দু-ভারত কেঁপে উঠলো কালাপাহাড়ের নামে।

জগন্নাথের প্রত্যাদেশ জানবার জন্যে একদিন পুরীধামে ধরনা দিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলো কালাচাঁদ। তাই শাহী ফৌজের অধিনায়ক হয়ে প্রথমেই উৎকল ধ্বংস করতে এগিয়ে গেলো কালাপাহাড়। দেবমূর্তি অপবিত্র করলো, বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলো হিন্দু প্রজাদের। হিন্দুনারীর সতীত্ব আর কৌমার্যের অহঙ্কার টলে পড়লো লালসামত্ত শাহী ফৌজের আক্রমণে।

বনাগ্নির মতোই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তাদের অত্যাচার। অভিযানের পর অভিযান। মুসলমান সমাজও শঙ্কিত হলো, ব্যথায় কাতর হলো হিন্দুর প্রতি কালাপাহাড়ের অত্যাচার দেখে।

কালাপাহাড়ের শাহী সৈন্য শুধু দেবমূর্তিই নয়, নারীলাঞ্ছনাতেও তৎপর হয়ে উঠলো। হিন্দুনারীর ধর্ম বিনষ্ট করার উৎসাহে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো শাহী ফৌজ।

মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস করে অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়ে বারাণসীতে এসে পৌঁছলো কালাপাহাড়। একটির পর একটি প্রাচীন দেবমন্দির ধ্বংস করে শেষে বারাণসীর কেদারেশ্বর-লিঙ্গ অপবিত্র করার নির্দেশ দিলো।

বিধর্মীর চিৎকার তুলে ছুটে গেলো সৈন্যরা।

এমন সময় রোরুদ্যমানা বৈধব্যের রূপ নিয়ে কালাপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো এক শুভ্রবাস বিধবা রমণী! কালাচাঁদ রায়ের মাতুলানী।

শ্বেতবসনা কাশীবাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো দেবদ্রোহী কালাচাঁদ। মনে পড়লো, এই মাতুলানীর স্নেহ আর মমতায় শৈশব কাটিয়েছে সে, মাতৃত্বে লালন করেছে তাকে এই বিধবার শুচিতা।

শুনলো কালাচাঁদ। তারই লালসামত্ত সৈন্যের দল বিধবার ধর্ম বিনষ্ট করেছে।

অবলা এক নারীর উন্মাদ হতাশার দৃষ্টিতে বিবেক ফিরে পেলো কালাপাহাড়। তার চোখের সামনে বিষপান করে অভিশাপ দিতে দিতে মৃত্যু বরণ করলো বিধবা।

অনুশোচনা দেখা দিলো তার মনে। অত্যাচার বন্ধ করার নির্দেশ দিলো কালাপাহাড়। রক্ষা পেলো কেদারেশ্বর-লিঙ্গ, রক্ষা পেলো হিন্দুধর্ম। আর কালাপাহাড়?

পরদিন প্রত্যূষে শাহীরক্ষীর দল খুঁজে পেলো না কালাপাহাড়কে। তন্ন তন্ন করে চতুর্দিকে তল্লাসী পাঠিয়েও হদিস মিললো না।

হয়তো সন্ন্যাসী হয়েই হিমালয়ের কোনো অজ্ঞাত গুহায় প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টায় লোকচক্ষুর আড়ালেই মৃত্যু হলো তার। হয়তো বা গঙ্গাগর্ভে আত্মহত্যা করলো অনুশোচনায়।

এ-কাহিনী বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথের অজানা নয়। আর গোপনে প্রজারা তার কালাপাহাড় নামকরণ করেছে, জানতো রঘুনাথ।

কিন্তু রঘুনাথের মন বলতো, কালাপাহাড়ের একাদশ বর্ষের হিন্দুধর্মনাশের ব্রত হিন্দুরই সৃষ্টি। প্রেমের কাছে ধর্ম বড়ো নয়। মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো নয় সমাজ। প্রজাদের আক্রোশ নিরর্থক মনে হলো রঘুনাথের কাছে।

সভাপণ্ডিতের সাবধানী শুনে হাসলো রঘুনাথ। বললে, বৈষ্ণব-রাজ্য বিষ্ণুপুরে কোনোদিন ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ছিলো না। শ্রীচৈতন্য

মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখিয়েছেন ; শৈশব থেকে শুনে এসেছি, সবার উপরে মানুষ সত্য। প্রেমই যদি সারবস্তু তবে ধর্মের প্রাচীর কেন তুলতে চান মানুষে মানুষে ?

—প্রেম আর ইন্দ্রিয়সুখ এক নয় রঘুনাথ।

কিন্তু রঘুনাথের মনে হয়েছে ইন্দ্রিয়সুখই প্রেম। লালবাঈয়ের লালসার আকর্ষণকে মনে হয়েছে অন্তরের আহ্বান। মনের দুর্বলতাকে মনে হয়েছে ন্যায়।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই লালবাঈ নির্দেশের পর নির্দেশ দিয়েছে, ক্রীড়নকের মতো লালবাঈয়ের ইঙ্গিতে রাজাদেশ উচ্চারণ করেছে রঘুনাথ। রাজকর্মচারীদের নামকরণ হয়েছে বাদশাহী নিয়মে, প্রাসাদের আদবকায়দা বদলেছে। সংস্কৃতশাস্ত্রের পণ্ডিতকুল নিষ্কর ভূসম্পত্তি হারিয়েছে অকারণে, পরিবর্তে রঘুনাথ ভূমিদান করেছে মুসলমান মৌলবীদের। ফারসীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে রাজকোষের অর্থে, কিন্তু দেবভাষা শিক্ষাদানের জন্য বরাদ্দ সাহায্য বন্ধ হয়েছে।

রাস উৎসবের সময় রাজদরবারে সংকীর্তন হওয়ার ঐতিহ্য ছিলো বিষ্ণুপুরের। সিংহাসন থেকে রাজা ও রানী নেমে আসতেন সভামধ্যে, কীর্তনে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে সদলে এগিয়ে যেতেন মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে। বীর হাম্বীর আর রানী সুদক্ষিণা এই প্রাচীন রীতি রক্ষা করে এসেছেন, দুর্জন সিংহ আর তাঁর পত্নী দরবারের আসন ত্যাগ করে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছেন কীর্তনের দলে।

কিন্তু এমন হঠকারিতা কেউই বুঝি আশা করেনি রঘুনাথের কাছে। কেউই ভাবতে পারেনি, বৌরানী চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে রঘুনাথের পার্শ্বাসনে লালবাঈকে দেখতে পাবে।

রাস উৎসব উপলক্ষে দরবারে সমবেত প্রজারা ধিক্কার দিয়ে উঠলো। ক্রোধে অপমানে অভিশাপ দিতে দিতে রঘুনাথ আর লালবাঈয়ের সামনেই সভা ত্যাগ করলো তারা।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো লালবাঈ।

জানতো না, রাজাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না রাজ্যকে। প্রজাদের, বিশেষ করে রাজকর্মচারীদের এ দুঃসাহস কল্পনাও করেনি সে।

শূন্য-দরবারের মধ্যে হঠাৎ কুটিলহাস্যে হেসে উঠলো লালবাঈ।

মনে মনে বললে, কাঞ্চনীর প্রতি প্রজাদের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ! বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাতে হবে এই অপমানিতা কাঞ্চনীরই পুত্রকে।

রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুর যে রীতি রক্ষা করে এসেছে যুগ যুগ ধরে, সেই রীতি লঙ্ঘন করলো রঘুনাথ। অসম্মান দেখালো রানী চন্দ্রপ্রভাকে, অপবিত্র করলো রাজসিংহাসন। তাই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে শঙ্কিত হয়ে উঠলো প্রজাকুল। নিঃসন্তান রঘুনাথের সিংহাসনে একদিন হয়তো তাঁর অবৈধ সন্তান এসে বসতে চাইবে। হয়তো রঘুনাথ নিজেই অনুজকে সরিয়ে সিংহাসনে বসাতে চাইবেন লালবাঈয়ের সন্তানকে।

প্রতি বছরের মতোই উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করে বসে ছিলো চন্দ্রপ্রভা। গোপালকে সাজিয়েছিলো মদনমোহনের বেশে। কিশোর গোপালের মাথায় ময়ূরপেখমের চূড়া, কপালে কপোলে চন্দনের টীকা, অঙ্গে পীতবাস।

দাসদাসী পরিবৃত হয়ে গোপালকে কাছে নিয়ে রঘুনাথের অপেক্ষায় বসে ছিলো চন্দ্রপ্রভা। মুগ্ধদৃষ্টি তার গোপালের মুখের দিকে।

'সর্বত্র তাঁহার রূপ করে ঝলমল, সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল'। মৃদঙ্গ আর খোল করতালের মৃদু মৃদু ধ্বনি আর গৌরচন্দ্রিকার নিঃসঙ্গ সঙ্গত ভেসে আসে মদনমোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে।

গোপালের মধুর মুখচন্দ্রের দিকে স্মিতহাসে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কল্পনার চোখে যেন আরাধ্যের কিশোররূপ দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভা। কৃষ্ণকেলী অঙ্গবাসে সুসজ্জিত দেহরূপ, চন্দন অগুরু কস্তুরীর সুবাস, কণ্ঠে সুবর্ণ মাদুলী, বাহুবন্ধে মুক্তালহরী, ফুলমালায় জড়ানো কুঞ্চিতকেশ।

মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে সুকণ্ঠী বৈষ্ণবীদের পদলহরীর সুরমাধুর্য ভেসে আসে। 'পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ, ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত। ছলছল নয়নে কমল সুবিলাস, নব নব ভাব করত প্রকাশ। পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ, রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥'

এই রূপ দেখেই বুঝি শ্লথবসনা শচীদেবীর চক্ষে নেমেছিলো অবিরল অশ্রুধারা, আলুলায়িত কেশে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে একবার ঘর আর একবার বাহিরে ছোটাছুটি করেছিলেন তিনি, জীবনমরণ জীবের অনন্যশরণ দেবতার পথ চেয়ে।

চন্দ্রপ্রভাও যেন তেমনই অপেক্ষা করে বসে আছে রঘুনাথের পথ চেয়ে। 'বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা। সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা॥'

নিজের মনকে মান অপমানের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু গোপালের ভবিষ্যৎ ভুলবে কি করে!

বিষ্ণুপুররাজের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে মোহনবেশে সজ্জিত করে এই উৎসব-দিনে রাজদরবারের সিংহাসনে বিষ্ণুপুরপতির পাশে বসে প্রজাদের দর্শন দেওয়া প্রাচীন রীতি।

কে জানতো সে-রীতি লঙ্ঘন করবে রঘুনাথ!

দাসীরা ছুটে এলো আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে। শুনলো চন্দ্রপ্রভা।

শুনলো, রাজদরবারে লালবাঈকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেছে রঘুনাথ; সিংহাসনে বসেছে বিষ্ণুপুরের পাটরানী চন্দ্রপ্রভা নয়, সুরসাধিকা লালবাঈ।

সন্তানতুল্য গোপালের স্বার্থ ভেবে বিচলিত হয়ে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামলো।

ধীরে ধীরে উঠে এলো চন্দ্রপ্রভা। দাসীদের দৃষ্টিও যেন অসহ্য মনে হলো তার।

প্রসাধনকক্ষে দ্বার বন্ধ করে কাঁদলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর বহুমূল্য বেশভূষা ত্যাগ করে শরীরে জড়ালো বৃন্দাবনী দেহবাস, কৃষ্ণচূড়া কবরী বাঁধলে সযত্নে। গঙ্গা-মৃত্তিকার রসকলি আঁকলে রসপূর্ণ চাঁদ-ঢলঢল মুখে।

সুরঙ্গাক্ষীকে বললে, চলো, কীর্তনের আসরে চলো।

দাসী পরিবৃতা হয়ে রাসমঞ্চে উপস্থিত হলো চন্দ্রপ্রভা।

রানী চন্দ্রপ্রভার জয়ধ্বনি তুললো বিক্ষুব্ধ জনতা।

তারপর পুনরায় কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বিভোর আনন্দে কীর্তনদলের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দিলো চন্দ্রপ্রভা। নারী-পুরুষের মিছিলে মিশে গেলো।

সংকীর্তনের দলে রানী চন্দ্রপ্রভাকে দেখে খুশী হয়ে উঠলো প্রজারা।

হিন্দুরাজ্যে কোনোদিনই নারীকে অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করতে হয়নি। রাজসভায় সকলের সম্মুখে সিংহাসনে আসীন হয়েছে হিন্দু সম্রাজ্ঞী, সমান প্রভাব বিস্তার করেছে রাজকার্যে। ইন্দ্রিয়াসক্ত নবাব বাদশাহ আর দস্যু ভুঁইয়াদের ভয়ে, মোগল সমাজের বোরখা প্রথা আর মোগল হারেমের অনুকরণেই নারীকে অন্দর-মহলের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলো হিন্দুসমাজ। অবগুণ্ঠন টেনে অসূর্যম্পশ্যা করে রেখেছিলো তাকে। শাসকবর্গের আচার-বিচার অনুকরণ করা সাধারণের ধর্ম, তাই মোগলযুগে হিন্দুসমাজ তার নিজস্ব ঐতিহ্য ভুলে অনুসরণ করেছে মোগল আচার, নবাবী অনাচার।

মোগলের অন্নপুষ্ট হিন্দু কর্মচারী আর ভূস্বামীরা উৎসাহ দিয়েছে এই অনুকরণে। অনুদার সমাজপতির দল আতঙ্কে শিউরে উঠে সমাজকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে, অন্যায়ের প্লাবনকে রোধ করতে চেয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর গেঁথে।

ফলে, শক্তি আর আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে হিন্দুধর্ম। অনুশাসনের অত্যাচারে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে হিন্দু প্রজারা।

শ্রীচৈতন্যের উদারতা, তাঁর ভেদাভেদ বিলোপের বাণী উদ্বুদ্ধ করেছিলো সমগ্র মানুষের চিন্তাধারাকে, মুক্তির আলোক দেখিয়েছিলো হিন্দুসমাজকে। বর্ণাশ্রমের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'আমার গোরা জাতের বিচার মানে না রে—দেখবি যদি আয় সকলে।'

বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুর সেই বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলো। মোগল-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের মতো নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করেনি। তাই নারী-পুরুষের মিছিলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চন্দ্রপ্রভার সংকীর্তন গান অস্বাভাবিক মনে হয়নি সেদিন।

বিস্মিত নয়, মুগ্ধ হয়েছিলো জনতা।

মুগ্ধ হয়েছিলো কৃষ্ণমোহন।

ধূলি-ধূসরিত দেহ চন্দ্রপ্রভার। কণ্ঠে সুমধুর কীর্তন। সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশবাসে সজ্জিতা চন্দ্রপ্রভার দিকে আপনা থেকেই যেন আকৃষ্ট হলো কৃষ্ণমোহন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সে।

চন্দ্রপ্রভা তখনও ভাবে বিভোর। চোখের দৃষ্টি তার মোহাবিষ্ট। মুখে অস্ফুট পদগুঞ্জন।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলো কৃষ্ণমোহন।

একে একে কীর্তনের ঐকতান থেমে গেলো। নিস্তব্ধ হলো মন্দির-প্রাঙ্গণ। কিন্তু তন্ময়তা ভাঙলো না চন্দ্রপ্রভার।

কৃষ্ণমোহন একাগ্র মনে কান পেতে রইলো চন্দ্রপ্রভার সুমধুর ধীরস্বরের পদলহরীর দিকে।

শান্তস্বরে ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে গেয়ে চলে চন্দ্রপ্রভা : 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়। রাই এমন কেন বা হৈল?'

মৃদু গুঞ্জন থেমে এলো ক্রমশ। তন্ময়তা কাটলো চন্দ্রপ্রভার। যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে ফিরে ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালো।

এলো জাগ্রত পৃথিবীতে। আর চোখ তুলে তাকাতেই দেখলে সুদর্শন এক যুবক অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে।

অস্ফুটে চন্দ্রপ্রভা বললে, কে তুমি ?

—আমি কৃষ্ণমোহন।

মৃদু তৃপ্তির হাসি খেলে গেলো চন্দ্রপ্রভার চোখে।

বললে, এসো। আমার সঙ্গে চলো কৃষ্ণমোহন, আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছো এতোদিন, আজ তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

চন্দ্রপ্রভাকে অনুসরণ করে প্রাসাদকক্ষে এসে পৌঁছলো কৃষ্ণমোহন। মনে উৎকণ্ঠা। পদক্ষেপ শঙ্কিত।

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বললে, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে কৃষ্ণমোহন। বলো, সে ভিক্ষা তুমি মঞ্জুর করবে। এতোদিন ভুল পথে চলেছিলাম, ভুল করে সব হারিয়ে ফেলেছি কৃষ্ণমোহন! তাই একটি ভিক্ষা চাই তোমার কাছে।

কৃষ্ণমোহন বললে, বিষ্ণুপুরের বধূরানী আপনি, দরিদ্র কৃষ্ণমোহন কি আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে ?

—পারে কৃষ্ণমোহন। চন্দ্রপ্রভা উত্তর দিলো। বললে, সব ঐশ্বর্য থেকেও আমার একটি ঐশ্বর্য নেই, কণ্ঠে সঙ্গীত নেই আমার। আমাকে গান শেখাতে পারো কৃষ্ণমোহন ?

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বললে, আপনি আমার সব অহঙ্কার ভেঙে দিয়েছেন আজ, আপনার কণ্ঠে পদাবলীর সুরমাধুর্য শুনে সব ভুল ভেঙে গেছে।

সত্যই বুঝি ভুল ভেঙে গেছে কৃষ্ণমোহনের। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেই এতোদিন মর্যাদা দিয়ে এসেছে সে। আর সারা বাংলায় সেই সঙ্গীতের প্লাবন আনবার জন্যেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো। দুরূহ রাগরাগিণীকে আয়ত্তে এনেছে, বিজাতীয় ভাষার বন্ধন থেকে সুরকে

মুক্তি দিয়ে নিজেই রচনা করেছে বাংলার গান, বাংলা ভাষাতেও যে সুর-মাধুর্য ধরা দেয় তা প্রমাণ করেছে। কিন্তু যে ভাবলোকে পৌঁছানোর জন্যে এই সঙ্গীতসাধনা তা এতো সহজভাবে এমন মধুর রূপ নিয়ে কখনও কানে বাজেনি।

চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠের সুরগুঞ্জন বুঝি সেই ভাবলোকে পৌঁছে দিলো কৃষ্ণমোহনকে।

চন্দ্রপ্রভা বললে, আমাকে গান শেখাতে হবে কৃষ্ণমোহন, যে গান শুনে বিষ্ণুপুররাজ তন্ময় হয়ে থাকেন, লালবাঈয়ের কণ্ঠে যে গান শোনবার জন্যে ছুটে যান তিনি, সেই গান আমাকে শেখাতে হবে।

ব্যথায় ছলছল করে উঠলো কৃষ্ণমোহনের দু'টি চক্ষু! বুঝলো কৃষ্ণমোহন, কোন ব্যর্থতাকে জয় করবার জন্য চন্দ্রপ্রভার এই দুর্জয় সাধনা।

সম্মতি জানালো কৃষ্ণমোহন। কিন্তু…

—কিন্তু?

—আপনার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধুর সঙ্গীত আমাকে শেখাবেন আপনি। সব রাগরাগিণীকে আয়ত্তে এনেও অনুরাগকে আয়ত্তে আনতে পারিনি, আজ প্রথম বুঝতে পেরেছি বৌরানী।

কৌতুকের হাসি হাসলো চন্দ্রপ্রভা। তারপর মৃদঙ্গে মৃদুমধুর ধ্বনি তুলে ধীর-স্বরে গাইতে শুরু করলো। গাইলেঃ 'পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে, মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে, বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে, আলিপন দেওব মোতিম হার, মঙ্গলকলস করব কুচভার॥'

তন্ময় হয়ে গেলো কৃষ্ণমোহন এই অনাস্বাদিত গানের মূর্ছনায়। এ যেন এক ভিন্ন জগতের পরিচয় পেয়েছে সে, স্পর্শ পেয়েছে ভিন্ন সুরলোকের।

ভাবাবেশে গেয়ে চলে চন্দ্রপ্রভা। মুখে মৃদু তৃপ্তির হাসি।

নিমীলিত আঁখির তন্ময় বিহ্বলতায় ডুবে থাকে কৃষ্ণমোহন।

কেউ লক্ষ্য করে না, একটি দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে কক্ষে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চন্দ্রপ্রভা আর কৃষ্ণমোহনের দিকে তাকিয়ে থাকে রঘুনাথ। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনই নিঃশব্দে ফিরে যায়।

ফিরে এলো রঘুনাথ।

যেমন নিঃশব্দ পায়ে চন্দ্রপ্রভার কক্ষদ্বার থেকে ফিরে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করলে লালবাঈয়ের প্রমোদভবনে।

গাঢ় লাল পারস্য গালিচার ওপর উজ্জ্বল আলোর ঝলমলানি। ঝরোকার তারা-ঝিকমিক আকাশের দিকে তাকিয়ে রুপালী জরির ঝিলমিলে সাজানো বহুমূল্য পালঙ্কে শরীর এলিয়ে শুয়ে ছিলো লালী।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে রঘুনাথ।

আনারের দানার মতো সুন্দর একটি মুখ, সুশুভ্র মসলিনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠেছে গোলাপের পাপড়ির মতো কমনীয় দেহবর্ণ। শরীরে যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গ। সুপুষ্ট বেণীর গা বেয়ে যেন অবহেলায় বুকের ওপর নেমে এসেছে চম্পাবরণ ওড়নার প্রান্ত। উজ্জ্বল আলোয় চমক দিচ্ছে ওড়নার সলমা আর চুমকির সারি। মরালগ্রীবায় মুক্তার লহরী, মণিবন্ধে হীরে আর চুনী বসানো কঙ্কণ। ক্ষীণকটি ঘিরে বিচিত্র চন্দ্রহার। পায়ে কল্কাকৃতি মঞ্জরীবন্ধন।

মনে মনে যেন লালবাঈকে চন্দ্রপ্রভার রূপের সঙ্গে তুলনা করলে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার রূপ শান্ত স্নিগ্ধ। লালবাঈয়ের এই উদ্দাম যৌবনের বহ্নিশিখা নেই চন্দ্রপ্রভার দেহে। নেই কোনো কামনালুব্ধ আকর্ষণ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রঘুনাথ। বললে, আসমানের গায়ে কাকে খুঁজছো লালী ?

চমকে ফিরে তাকালো লালী। মৃদু হাসি খেলে গেলো তার চোখের নীল তারায়।

কৌতুকে হেসে উঠলো লালী। বললে, দেখছি আসমানের চাঁদ আমাকে দেখে শরমে মরে কিনা।

রঘুনাথ মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে কাছে এগিয়ে গেলো, লালীর পায়ের কাছে বসলো বিনীত ভৃত্যের মতো।

—কি ভাবছো লালী ? মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে রঘুনাথ।

মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলো লালী।

বললে, আমাকে চলে যেতে হবে, আমাকে মুক্তি দাও রাজাবাহাদুর।

—না, না। বিচলিত হয়ে উঠলো রঘুনাথ। বললে, তুমি চলে গেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন, কেন চলে যেতে চাও তুমি ?

মনের গোপনে হাসলো লালী। তার রূপের আকর্ষণে, তার কামনার আগুনে রঘুনাথকে দগ্ধ করতে চায় লালী। চলে যেতে চায় না, মুক্তি দিতে চায় না সে রঘুনাথকে।

তবু মাঝে মাঝে অনুরোধ করে, আমাকে চলে যেতে দাও, মুক্তি দাও রাজাবাহাদুর।

লালী জানে তার এই অভিনয়কে সত্য মনে করে শিউরে ওঠে রঘুনাথ। চঞ্চল হয়ে ওঠে লালীকে হারাবার ভয়ে।

বলে, তোমার কোনো ইচ্ছাই তো আমি অপূর্ণ রাখিনি, তবু কেন আমার জীবনকে অন্ধকার করে দিয়ে চলে যেতে চাও ? না, না, যেতে পাবে না তুমি।

মুখে বিপদের ছায়া টেনে আনে লালী। বলে, না রাজাবাহাদুর। আমার অনুরোধ রক্ষা করে রাজসিংহাসনেও আসন দিয়েছো, হোক

একদিনের জন্যে, তবু সেই গর্বেই আমি সুখী। কিন্তু তোমার প্রজারা অপমান করেছে আমাকে, সভা ত্যাগ করেছে তোমার সামনেই। ম্লেচ্ছ বলে, কাঞ্চনী বলে উপহাস করেছে তারা আমাকে।

রঘুনাথ উত্তর দেয়, কিন্তু রাজদরবারের বাইরে তো তোমার কোনো অসম্মান হতে দিইনি প্রিয়া।

মৃদু হাসে লালী। বলে, আমি নিজের সম্মান চাই না—চাই···

—কি চাও, বলো? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে রঘুনাথ।

উত্তর আসে, আমি···আমি···

হঠাৎ লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে লালীর। কি যেন বলতে চায় সে, বলতে পারে না।

লালীর কোমল শরীরকে মৃদু আলিঙ্গনে কাছে টেনে নেয় রঘুনাথ। বলে, কি চাও লালী? বলো, বলো তুমি···

ধীর লজ্জিতস্বরে লালী উত্তর দেয় চোখ না তুলেই। বলে, তোমার সন্তানের অপমান আমি সইতে পারবো না, তোমার···

বিস্ময়ে লালীর মুখের দিকে তাকায় রঘুনাথ। বলে, না না, তার অসম্মান আমি হতে দেবো না লালী, হতে দেবো না।

—কিন্তু সামান্যা এক বাঈজীর সন্তানকে কে সম্মান দেবে রাজাবাহাদুর? কোন্ ইজ্জত নিয়ে মুখ তুলে তাকাবে সে মানুষের দিকে? তার চোখের সামনে গোপাল পাবে কুর্নিশের পর কুর্নিশ, আর সে পাবে শুধু উপহাস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঘুনাথ। বিষাদকরুণ কণ্ঠে বলে, কিন্তু কি উপায় আছে লালী? কি করতে পারি আমি? বিষ্ণুপুরের প্রজারা রাজপত্নী বলে স্বীকার করবে না কাঞ্চনী নারীকে। তার চেয়ে, চলো লালী, রাজ্যের লোভ নেই আমার, চলো বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যাই। কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না, কেউ···

অট্টহাসে হেসে উঠলো লালী। বললে, এতো দুর্বল তুমি? এতো ভয় তোমার প্রজাদের? তা হলে আমিই চলে যাই রাজাবাহাদুর,

নিষ্কণ্টক হবে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রপ্রভা শান্তি পাবে, তুমি শান্তি পাবে।

অনুরোধের উষ্ণস্পর্শে লালীর দু'টি কোমল হাত চেপে ধরলো রঘুনাথ। বললে, না, না লালী। তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করবো, কি চাও তুমি বলো লালী, বলো।

পালঙ্ক থেকে ঘুমন্ত সন্তানকে তুলে এনে রঘুনাথের সামনে দাঁড়ালো লালী। বললে, আমাদের সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে বসাতে চাই রাজাবাহাদুর। দৃঢ়কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো লালী। যেন অনুরোধ নয়, আদেশ।

উনত্রিশ

সুবে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলো মুর্শিদাবাদে। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর নাম থেকে পত্তন হলো নতুন রাজধানীর।

হায়দ্রাবাদ থেকে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলায় এসেছিলো মুর্শিদকুলি। এসে দেখলে, সম্রাটের স্নেহভাজন বলেই তার ওপর সম্রাটপৌত্র নবাব আজিমুশ্বান বিরূপ ভাব পোষণ করে আছে।

নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এই ভয়ে পদে পদে মুর্শিদকুলির কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলে আজিমুশ্বান।

দিল্লীশ্বরের চরিত্র অজ্ঞাত ছিলো না মুর্শিকুলির, জানতো পিতা পুত্র আত্মীয় বান্ধবের সম্পর্ক বড়ো নয় তাঁর কাছে। বিধর্মীর প্রতি অত্যাচার আর রাজকোষের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই তাঁর কাছে জীবনের মূলমন্ত্র। তাই দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রাজস্ববৃদ্ধির জন্যে নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করলো মুর্শিদকুলি, আর হিন্দু ভূস্বামীদের উত্ত্যক্ত করে তুললো দিনের পর দিন।

শান্তিপ্রিয় আজিমুশ্বান বাধা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠালো দেওয়ান মুর্শিদকুলি। আওরঙ্গজেব বুঝলেন, অপদার্থ আজিমুশ্বান বাধার সৃষ্টি করছে শাসনকার্যে। আদেশ দিলেন নবাবকে, বাংলা ছেড়ে বিহারে বাস করার। নিষ্কণ্টক হলো মুর্শিদকুলি, পত্তন হলো নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদ।

আজিমুশ্বান পাটনায় সরে গেলো আলমগীরের আদেশে। হাবশী সুলেমান তখন সুবে বাংলার দো-হাজারী মনসবদার। রহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে আজিমুশ্বানের জীবন এবং সম্মান বাঁচানোর পুরস্কার হিসেবে নবাবের কাছ থেকে খেলাত পেয়েছিলো হাবশী সুলেমান, মনসবদার নিযুক্ত হয়েছিলো।

ক্রমশ মুর্শিদকুলিরও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো সুলেমান। মুর্শিদকুলি বুঝলো, এমন ভয়ঙ্কর নৃশংসতা আর আজ্ঞাবহের বিশ্বস্ততা অন্য মনসবদারদের মধ্যে অনুপস্থিত।

তাই বিষ্ণুপুররাজের নামে রাজস্বের পরোয়ানা দিয়ে মুর্শিদকুলি বললে, এই পরোয়ানা নিয়ে বিষ্ণুপুরে যাও সুলেমান, আর সঙ্গে নিয়ে যাও পাঁচশো রিসাল্‌হা সৈন্য। প্রাচীন সন্ধিশর্ত অনুযায়ী বহুকাল থেকে সন্ধিমূল্য এসে জমা হয়নি রাজভাণ্ডারে, তাই সে শর্ত তামাদি হয়ে গেছে, বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে হবে বিষ্ণুপুরকেও।

পরোয়ানা নিয়ে বিষ্ণুপুর যাত্রা করলো সুলেমান। পাঁচশো অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরের পথ ধরলো। ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ধুলোর ঘূর্ণি উঠলো রাঢ়ভূমির মাটিতে। বাংলার প্রজা এবং জমিদারের দল বিস্ময়ে আতঙ্কে চেয়ে রইলো সেদিকে।

আর সুলেমানের মনে গুনগুন ধ্বনি তুললো এক নতুন আশা।

লালবাঈ! লালবাঈ!

বর্ধমানের যুদ্ধপ্রান্তে রহিম খাঁর মৃত্যু হওয়ার পর চিতোয়া-বরদা অভিমুখে যাত্রা করেছিলো সুলেমান। বিবিবাজারের সেই রূপসী বাঁদীকে বন্দী করে নিয়ে আসবে এই ছিল তার স্বপ্ন।

কিন্তু হতাশ হয়েছিলো সুলেমান। বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ দুর্গ আক্রমণ করে শোভা সিংহের কন্যার সঙ্গে লালবাঈকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে, এ খবর শুনে নিরাশ মনে ফিরে এসেছিলো। আলমগীরের সঙ্গে সন্ধিশর্তে আবদ্ধ বন-বিষ্ণুপুর, জানতো সুলেমান। তাই বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে আক্রোশ পুষে রেখে ফিরে আসতে হয়েছিলো সেদিন।

মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা পেয়ে সেই বিস্মৃত কামনা আবার নতুন করে জেগে উঠলো মনে।

আর মুর্শিদকুলি উল্লসিত হলো সুলেমানের আগ্রহ দেখে।

একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর সন্ধিশর্তে নামেমাত্র করদ

রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো! কিন্তু কোনোদিনই সম্রাটের প্রাপ্য কর পাঠায়নি বিষ্ণুপুর। এবার দেওয়ানের পরোয়ানা কিন্তু তাকে সাধারণ ভূস্বামীতে পরিণত করতে চায়। একে একে সমগ্র বাংলার হিন্দু ভূম্যধিকারীদের শক্তি খর্ব করতে চায় মুর্শিদকুলি, খর্ব করতে চায় তাদের ধনবল ও বাহুবল।

কিন্তু মোগলরাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজার আক্রোশ শোভা সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়নি, মুর্শিদকুলি জানতো। তাই দু'জন ব্রাহ্মণ যুবককে সহকারী নিযুক্ত করলো বাংলার দেওয়ান। ভূপতি রায় ও কেশরী রায়।

হিন্দুর শক্তি অপহরণের জন্যে হিন্দুকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করলো মুর্শিদকুলি। দেওয়ান থেকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজস্ব বৃদ্ধি করেই তৃপ্ত রইলো না। হিন্দু ভূমিপতিদের প্রায় সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, জমির মালিকানা এলো নবাবের হাতে, সরাসরি প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হলো। উপস্বত্ব ভোগের অধিকার রইলো না রাজা ও জমিদারের।

বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলো কোনো কোনো জমিদার। সৈন্য পাঠিয়ে তাদের বন্দী করে আনলো নাজির আহমদ আর রেজা খাঁ—মুর্শিদকুলির বিশ্বস্ত কর্মচারী।

প্রকাশ্যে পথের ধারে গাছের শাখায় পা বেঁধে বাদুড়ের মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হলো জমিদারদের। হিন্দুধর্মকে উপহাস করার জন্যেই পুরীষকুণ্ডের নামকরণ হলো 'বৈকুণ্ঠ'। কখনও বা এই ব্যঙ্গ-বৈকুণ্ঠে ফেলে দেওয়া হলো তাদের।

দেবমন্দির ভেঙে গড়ে উঠলো অসংখ্য মসজিদ।

অত্যাচার থেকেই জন্ম হয়েছিলো শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্যের—রাঢ়বাসীরা স্বপ্ন দেখেছিলো হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার। মুর্শিদকুলি খাঁর অত্যাচারও তেমনি এক নতুন বিদ্রোহে প্রাণসঞ্চার করলো।

অভ্যুদয় ঘটলো সীতারাম রায়ের।

দস্যুপতি সীতারাম রায় বাংলার অধিবাসীদের মনে আশার সঞ্চার করলো, যে আশার আলো দেখতে পেয়েছিলো তারা শোভা সিংহের বিদ্রোহে। অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের পার্থক্য, রাজার সঙ্গে প্রজার যে বিভেদ তা স্পষ্ট চোখে দেখতে পায়নি সেদিনের অধিবাসীরা। আপন দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী করেনি সামন্ততন্ত্রকে। ভেবেছে, সব দুঃখ-দুর্দশার মূলে আছে ধর্মের ওপর বিধর্মীর জেহাদ। রাজশক্তির নামকরণ করেছে, মুসলমান শক্তি। নবাব বাদশাহরাও সেই একই ভুল করেছে। প্রজার কাতরোক্তিকে ভেবেছে ইসলামের প্রতি কাফেরের অভিশাপ।

স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভুঁইয়ারা একে একে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে, বিদ্রোহ দমন করেছেন আলমগীর। কিন্তু প্রজাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করতে পারেননি তিনি। দস্যুপতি, চরিত্রহীন, স্বার্থপর ভুঁইয়ারাও গৌরবের সম্মান পেয়েছে প্রজাদের কাছে—কারণ রাজাকে কোনোদিনই তারা ঋষিরূপে কল্পনা করেনি। রাজাকে দেখেছে দারিদ্র্যের একমাত্র উপাস্য দেবতা হিসেবে, দেখেছে ধর্মরক্ষকের ভূমিকায়! ধার্মিক হওয়া নয়, ধর্ম রক্ষা করাই ছিলো রাজার কর্তব্য।

তাই সীতারাম রায়ের অভ্যুত্থানে গৌরব বোধ করেছে বিষ্ণুপুরের প্রজারাও। কিন্তু হতাশ হতে হলো তাদের, হতাশ হতে হলো রঘুনাথের আচরণে।

বিদ্রোহ নয়, রঘুনাথ নিজেই তখন বিধর্মী আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। লালবাঈয়ের নির্দেশে ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের রাজকার্যে তখন নিযুক্ত হচ্ছে বিদেশী মুসলমান কর্মচারী, সৈন্যবিভাগে প্রবেশাধিকার ঘটছে তাদের।

তবু সহ্য করে চলেছিলো বিষ্ণুপুরের প্রজারা। সহ্য করেছিলো প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করে যেদিন লালবাঈকে দরবারে সম্মানের

আসন দিয়েছিলো রঘুনাথ। কিন্তু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো তারা একটি মাত্র সংবাদে। বিচলিত বোধ করলো সমগ্র বিষ্ণুপুর।

লালবাঈয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ গোপন রেখেছিলো রঘুনাথ, গোপনে দিনের পর দিন তাকে সন্তানস্নেহে লালন করে চলেছিলো। কিন্তু যথাসময়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো সে খবর! তবু এতোখানি আতঙ্কিত বোধ করেনি প্রজারা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজারা শুনলো, এই সন্তানকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে রঘুনাথ। আর শুনলো মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা নিয়ে পাঁচশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক হয়ে এসেছে হাবশী সুলেমান। সুলেমানের আগমনকে তাই চক্রান্ত মনে করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সকলে।

এদিকে রঘুনাথ সসম্মানে অভিনন্দন জানালো সুলেমানকে। পরোয়ানা গ্রহণ করে দেওয়ানজীকে আদেশ দিলো, নবাব-প্রতিনিধি সুলেমান খাঁর আতিথ্যে যেন ত্রুটি না ঘটে!

সুলেমানকে বললে, আমার রাজ্য থেকে যেন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ফিরে যাবেন না সুলেমান খাঁ। বিষ্ণুপুর কোনোদিন আতিথ্যের ত্রুটি দেখায়নি।

হাবশী সুলেমান সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসলো।

বললে, কিন্তু আমার বাসনা হয়তো অতৃপ্তই থাকবে রাজাবাহাদুর।

বিস্ময়ের চোখে তাকালো রঘুনাথ। প্রশ্ন করলে, কি আপনার বাসনা সুলেমান খাঁ? ধন ঐশ্বর্য বা বাহুবলে যদি তা সম্ভব হয় তা হলে বিষ্ণুপুর আপনার ইচ্ছাপূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

সুলেমান সহাস্যে বললে, লালবাঈয়ের গান আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাজাবাহাদুর।

চমকে উঠলো রঘুনাথ। মুহূর্তের জন্য অপমানিত বোধ করলে। কিন্তু মুর্শিদকুলির প্রতিভূকে অসন্তুষ্ট করার সাহস হলো না। প্রজার আস্থা হারিয়ে নিজেকে বড়ো দুর্বল বোধ করে রঘুনাথ।

তাই ধীরে ধীরে বললে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিষ্ণুপুরে এসেছেন, আপনার ক্লান্তি দূর করতে পারে একমাত্র লালবাঈয়ের গান। দুঃখের কারণ নেই সুলেমান খাঁ, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রেখে ফিরে যেতে হবে না আপনাকে।

লালবাঈয়ের কাছে এসে অনুনয়ে ভেঙে পড়লো রঘুনাথ।—মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা এনেছে সুলেমান, আমার রাজ্যের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে লালবাঈ। তোমার গান শুধু বাঁচাতে পারে আমার সম্মান।

হাসলো লালবাঈ।—বিষ্ণুপুর রাজ্যের কিস্মৎ শুধু একটা গান?

ফরাসদের হুকুম দিলো লালবাঈ।

ওলন্দাজ ঝাড়লণ্ঠনের সারি পুনরায় শতশিখায় জ্বলে উঠলো জলসামহলে। রঙ-ঝলমল কাশ্মীরী গালিচায় আর মখমলের পর্দায় ঠিকরে পড়লো সে আলো। সারেঙ্গীবাদকের দল ভিড় করে এলো। এলো রূপসী জরিয়া দাসীর দল। সোনালী তবকে মোড়া কস্তুরী-পান আর সুগন্ধ সিদ্ধির সরবত। অগুরু আতরের ধারাবর্ষণ।

গির্দায় হেলান দিয়ে বসলো হাবশী সুলেমান। মসিকৃষ্ণ দৈত্যের মতো চেহারা, মুখে বীভৎস হাসি।

রহিম খাঁর রঙমহলে একদিন রহিম খাঁকে যেভাবে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতে দেখেছিলো—বিবিবাজারের বাঁদীকে যার সামনে নাচের ঘূর্ণিতে ওড়না ওড়াতে দেখেছিলো একদিন—ঠিক সেই বাদশাহী ভঙ্গিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে অপেক্ষা করলো সুলেমান।

আজ আবার লালবাঈকে দেখতে পাবে সে, শুনতে পাবে তার গান। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কামনা তার মনে।

সুলেমান দেখতে চায়, আজ এই সম্মানের আসনে তাকে দেখে সেই তুচ্ছ কাঞ্চনীর চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে কিনা।

কিংখাবের পর্দায় জরির নকশা চিকচিক করে উঠলো, বাজলো মৃদু ঘুঙুরের বোল। গুঞ্জন উঠলো জলসামহলে।

পর্দা সরিয়ে আসরে প্রবেশ করলো লালবাঈ। নাচের ভঙ্গিতে তসলিম জানিয়ে তানপুরার কাছে এসে বসলো।

রঘুনাথ পরিচয় দিলো হাবশী সুলেমানের।

তসলিমের ভঙ্গিতে পুনরায় হাতের মুদ্রা সৃষ্টি করে চোখ তুললে লালবাঈ। আর সেই মুহূর্তে চোখোচোখি হলো সুলেমানের সঙ্গে। স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর বিস্ময় চাপা দিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি টানলো লালবাঈ। যেন কতোদিনের পরিচয়। চোখের ইশারায় ছুঁড়ে দিলো মনমাতানো ভঙ্গিমা। কণ্ঠের সুরে দিল্‌-জখম-করা গজল গানের ছুটতান।

গানের সুরে বিভোর হয়ে গেলো সুলেমান, বিভোর হয়ে গেলো রঘুনাথ।

এদিকে ক্রমশই অস্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণমোহন। জলসামহলে বসে সুলেমানের প্রতি রঘুনাথের ব্যবহার দেখে ক্ষুণ্ণ হলো কৃষ্ণমোহন। আতিথেয়তা নয়, যেন বিনীত ভৃত্যের মতো তোষামোদের ভঙ্গি রঘুনাথের। বুঝি চরিত্র হারিয়েছে বিষ্ণুপুররাজ।

অভিশাপের কালো ছায়া যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে বিষ্ণুপুরকে, দেখতে পায় কৃষ্ণমোহন। জলসামহল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে।

চন্দ্রপ্রভার চোখে, জ্যোতিষাচার্য আর অমাত্যদের চক্রান্তে, রঘুনাথের হঠকারিতায় দুর্দিনের আভাস দেখতে পায়।

লালবাঈকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের গুঞ্জন কৃষ্ণমোহনের কানেও এসে পৌঁছেছে। তাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহন, দ্বন্দ্ব দ্বেষ হানাহানি থেকে দূরে সরে যেতে চায়। আরেক উচ্চাশা তার। বিষ্ণুপুর তাকে যেটুকু সঙ্গীতের শিক্ষা দিয়েছে তাই সব নয়। উত্তরভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ গায়কের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধনায় সিদ্ধি পেতে চায়

কৃষ্ণমোহন। তার জন্য পদব্রজেও উত্তরভারত ভ্রমণ করতে ভয় পায় না। কিন্তু তখনই কল্পনার চোখে দেখতে পায় চন্দ্রপ্রভার করুণ বিষণ্ণ মুখচ্ছবি। রাধামাধবের পায়ে জীবন উৎসর্গ করে জাগতিক সব সুখ দুঃখ ভুলতে চায় চন্দ্রপ্রভা। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় চোখ বুজে থাকতে চায় গোপালের স্বার্থের দিকে।

লালবাঈয়ের পুত্রকে রঘুনাথ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে চান, এ গুজব চন্দ্রপ্রভারও অজানা নয়। তবু পথ খুঁজে পায় না সে। শুধু প্রার্থনা জানায় রাধামাধবের কাছে।

দিনের পর দিন কৃষ্ণমোহনের কাছে গানের তালিম নিয়েছে চন্দ্রপ্রভা, ভেবেছে সঙ্গীতের মোহেই রঘুনাথ পথ হারিয়েছে, সঙ্গীতের আকর্ষণেই চন্দ্রপ্রভার কাছে আবার ফিরে আসবে রঘুনাথ।

পথভ্রষ্ট রঘুনাথ যে সঙ্গীতকেও এভাবে অপমান করবে, চন্দ্রপ্রভাকে অপমানিত করবে, কে জানতো!

পতির কাছে হয়তো এভাবে অপমানিত হয়নি কোনো পত্নী।

সে-দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা।

সুরার নেশায় টলতে টলতে সেদিন প্রাসাদে ফিরে এসেছিলো রঘুনাথ, জরিয়া দাসীদের কাঁধে ভর দিয়ে।

দ্রুত ছুটে এসে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিলো চন্দ্রপ্রভা। সযত্ন সেবার কোমল হাতে রঘুনাথের চুলে বিলি দিতে দিতে বললে, কেন নিজেকে সুরার নেশায় ভুলিয়ে রাখতে চাও তুমি, কেন ছুটে যাও লালবাঈয়ের কাছে?

বেহুঁশ রঘুনাথ কোনো উত্তর দিলো না এ প্রশ্নের। হয়তো বা শুনতে পেলো না।

গান। গানের নেশাতেই ছুটে যায় রঘুনাথ, চন্দ্রপ্রভার মন বললে। গান গেয়েই রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনবে সে অন্যায়ের পথ থেকে, পাপের পথ থেকে।

ধীরে ধীরে তানপুরা নিয়ে এসে রঘুনাথের পদপ্রান্তে বসলো চন্দ্রপ্রভা।

শান্ত সুরের রেশ তুললো তানপুরায়। লালবাঈয়ের কণ্ঠে যে গান শুনে মুগ্ধ হন রঘুনাথ, সেই দুরূহ রাগরাগিণীকে গোপন প্রচেষ্টায় আপন কণ্ঠে বন্দী করেছে চন্দ্রপ্রভা। কৃষ্ণমোহনের শিষ্যাও আজ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে সঙ্গীতে।

ধীরে ধীরে বেহাগের রেশ বেজে ওঠে চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠে।

রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন রঘুনাথের শরীরে।

নেশার-চোখ মেলে অস্ফুট স্বরে বলে, সাবাস লালবাঈ, সাবাস।

কৌতুকের হাসি হেসে চন্দ্রপ্রভা বলে, আমি লালবাঈ নই প্রিয়, আমি চন্দ্রপ্রভা।

চমকে ওঠে রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারে না।

প্রশ্ন করে, কে? কে তুমি?

—আমি চন্দ্রপ্রভা।

ধীরে ধীরে উঠে বসে রঘুনাথ। যেন বিশ্বাস হয় না তার।

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হেসে বলে, তোমাকে খুশী করার জন্যেই এতোদিন গোপনে সঙ্গীত সাধনা করেছি! কবি কৃষ্ণমোহনের শিষ্যা আজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে প্রিয়, বিষ্ণুপুররাজকে মুগ্ধ করেছে তার গানে।

মুহূর্তমাত্র বিস্ময়ের চোখে চন্দ্রপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চন্দ্রপ্রভার হাতের তানপুরায় পদাঘাত করে রঘুনাথ। চিৎকার করে ওঠে।—না না, গান বন্ধ করো, বন্ধ করো এ সুরের কলঙ্ক।

সশব্দ অট্টহাসে হেসে ওঠে রঘুনাথ। টলতে টলতে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ায়। বলে, কলঙ্কিত করো না তানপুরা, কলঙ্ক, কলঙ্ক…

দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রপ্রভার। কলঙ্ক? চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠ সুরকে কলঙ্কিত করে? না রঘুনাথের সন্দেহাতুর মন চন্দ্রপ্রভাকেই কলঙ্কিনী ভেবেছে?

সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙে গেলো চন্দ্রপ্রভার।

টলতে টলতে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে যায় রঘুনাথ।

—খাজাঞ্চী! চিৎকার করে ডাক দেয় রঘুনাথ।

উন্মত্ত রঘুনাথের চিৎকার শুনতে পায় চন্দ্রপ্রভা।

আর পরক্ষণেই একরাশ মোহর ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

ছুটে এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা, দেখলে খাজাঞ্চীর হাত থেকে মোহরের থলিটা নিয়ে উন্মাদের মতো দু'হাতে মোহর ছড়াতে ছড়াতে চলেছে রঘুনাথ, নেশার ঝোঁকে। আর সেদিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে খাজাঞ্চী।

অনেকক্ষন, অনেকক্ষণ নিশ্চুপ নিথর দাঁড়িয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা, বুক নিঙড়ে বের হলো ব্যথার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।

তারপর ধীরে ধীরে রাধামাধব-মন্দিরের পথ ধরলো সে।

আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করলো সুরঞ্জাক্ষী। চন্দ্রপ্রভাকে রাধামাধব-মন্দিরের দিকে যেতে দেখেই ছুটে গেলো জ্যোতিষাচার্যের কাছে! আর চন্দ্রপ্রভা হতাশায় লুটিয়ে পড়লো রাধামাধব বিগ্রহের সামনে।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে রাধামাধবের বিগ্রহের সামনে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভা। নির্জন নিঃশব্দ মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে অশ্রুসজল চোখে সান্ত্বনা খুঁজলো।

কান্নার বাষ্পে চন্দ্রপ্রভার আর্তস্বর কেঁপে উঠলো।

—উপায় বলে দাও রাধামাধব, বলে দাও কি আমার কর্তব্য! কেঁদে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভা।

আর সেই মুহূর্তে উদাত্ত কণ্ঠে দৈববাণী হলো, ধর্ম-রক্ষাই প্রধান কর্তব্য রাজমহিষী, বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্য স্বামী-হত্যাও পাপ নয়।

শিহরণ খেলে গেলো চন্দ্রপ্রভার সারা শরীরে। চমকে চিৎকার করে উঠলো, না না, একি আদেশ দিলে রাধামাধব! স্বামী-হত্যা?

না না, পত্নীর কাছে পতিই একমাত্র জাগ্রত দেবতা। প্রত্যাদেশ ফিরিয়ে নাও রাধামাধব। প্রত্যাদেশ ফিরিয়ে নাও।

রাধামাধবের বিগ্রহের কাছে ছুটে গেলো চন্দ্রপ্রভা, পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলো বিগ্রহের পদপ্রান্তে।

দেখতে পেলো না, কখন দেববিগ্রহের পিছন থেকে জ্যোতিষাচার্য গোপনে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন জ্যোতিষাচার্য, এ প্রবঞ্চনা ছাড়া রক্ষা পাবার উপায় নেই বিষ্ণুপুরের। না না, প্রবঞ্চনা নয়। সত্যের চেয়ে কর্তব্য বড়ো তাঁর কাছে। একটি জীবনের চেয়ে একটি রাজ্য অনেক বড়ো। রাজার প্রাণ হরণ করে রাজ্যের আয়ু বর্ধিত করা অকল্যাণ নয়। রাজধর্ম, প্রজাধর্মের জন্যে চন্দ্রপ্রভা যদি স্বামীকে হত্যা করে, তা পাপ নয়। মঙ্গল, পরম মঙ্গল।

এদিকে চেতনা ফিরে এলো চন্দ্রপ্রভার। বিস্ময়ে ভাবাবিষ্টের মতো নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলো সে রাধামাধবের বিগ্রহের দিকে, তারপর প্রাসাদকক্ষে ফিরে এলো চিন্তার জাল নিয়ে।

ধর্মের জন্য স্বামী-হত্যা পাপ নয়?

কৃষ্ণমোহনের কাছে সঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছে চন্দ্রপ্রভা, স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে! কিন্তু সে-সঙ্গীত তাকে ক্রমশই দূরে ছিনিয়ে এনেছে রঘুনাথের কাছ থেকে।

রঘুনাথ নয়, অনুরাগের দৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রভা বারংবার দেখতে পেয়েছে রাধামাধবের মূর্তি।

তবে কি জীবন-মরণের পতি রাধামাধব? রঘুনাথ নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না চন্দ্রপ্রভা।

সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে প্রতিদিনের মতোই অপেক্ষা করে চন্দ্রপ্রভা। চম্পা চামেলী রজনীগন্ধার পুষ্পালঙ্কারে সাজিয়ে দেয় সুরঞ্জাক্ষী,

উদ্যানের পোষা হরিণী আর ময়ুর ঘুরে বেড়ায় চন্দ্রপ্রভার কাছে কাছে, কিন্তু অন্যদিনের মতো তাদের নিয়ে কৌতুকে হাসতে পারে না চন্দ্রপ্রভা। তীর-ধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে জরিয়া দাসী ও শবরী নারীরক্ষীর দল। কিন্তু অন্যদিনের মতো চন্দ্রপ্রভা যোগ দিতে পারে না লক্ষ্যভেদের খেলায়।

অপেক্ষা, অপেক্ষা।

একসময় সন্ন্যাসীর বেশে কৃষ্ণমোহন এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তবু অন্যদিনের মতো উল্লসিত হয়ে উঠতে পারে না চন্দ্রপ্রভা। কথা খুঁজে পায় না। কি করে সে প্রকাশ করবে আপন গ্লানির কথা! রঘুনাথ অনাচারী হলেও তার স্বামী। স্বামীর কলঙ্ক কি করে প্রকাশ করবে সে! কি করে জানাবে কৃষ্ণমোহনের শিক্ষাকে অসম্মান দেখিয়েছে রঘুনাথ!

কৃষ্ণমোহন হঠাৎ বলে, বিদায় নিতে এসেছি বৌরানী!

—কেন কৃষ্ণমোহন? উৎকণ্ঠার প্রশ্ন ফোটে চন্দ্রপ্রভার মুখে।

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বলে, সব রাগরাগিণী আয়ত্তে এনেও বুঝেছি অনুরাগকে অনুভব করতে পারিনি। তাই আমার সঙ্গীত আজও অসম্পূর্ণ বৌরানী, তাকে পূর্ণ করার ব্রত নিয়ে পরিব্রাজকের পথ বেছে নিতে চলেছি। দিল্লীর পথে চলেছি আমি। সঙ্গীত-সাধনার শেষ সোপানে যদি কোনোদিন পৌঁছতে পারি তবেই ফিরে আসবো।

চন্দ্রপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে, যাও কৃষ্ণমোহন। যে-সাধনার পিছনে ছুটতে গিয়ে বিষ্ণুপুররাজ পথ হারিয়েছেন, সে-সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ করো, রাধামাধবের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

বিদায় নিয়ে চলে যায় কৃষ্ণমোহন। মনের মধ্যে তার গুঞ্জন তোলে শতসহস্র প্রশ্ন। জগৎ মনে হয় শুধুই মায়াময়। চন্দ্রপ্রভার গোপন মনের ব্যথা, বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্বার্থ, লালবাঈয়ের যৌবনোচ্ছল নৃত্যভঙ্গিমার লুব্ধতা, সব তুচ্ছ হয়ে যায় কৃষ্ণমোহনের চোখে।

মায়ার স্পর্শে রস হয় বিকৃত। প্রীতিই একমাত্র আদর্শ। সেখানে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ নেই, স্বার্থের নেই দ্বন্দ্ব। রতি আর

উল্লাসে প্রীতির জন্ম। প্রীতি থেকে প্রেম। প্রেম আর আত্মবিশ্বাসেই প্রণয়। প্রণয় ও অধিকারজ্ঞান মিলিত হলেই জন্ম নেয় মান অভিমান। প্রেম আর আত্মবিলুপ্তিতে স্নেহ। স্নেহ আর কামনা থেকে রাগের জন্ম। রাগের রম্যতা অনুরাগ। এই রাগই উন্মাদনার স্পর্শে রূপান্তরিত হয় মহাভাবে। সঙ্গীতের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার করে এই মহাভাব লাভ করতে চায় কৃষ্ণমোহন, সাধনায় সিদ্ধি পেতে চায়। বিদায় নিয়ে চলে যায় কৃষ্ণমোহন।

আর চন্দ্রপ্রভা নিজেকে হঠাৎ যেন নিঃস্ব বোধ করে। যেন জীবনের শেষ আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে সুরঞ্জাক্ষীর কাছে রাধামাধব-প্রাঙ্গণের দৈববাণীর কথা প্রকাশ করে চন্দ্রপ্রভা।

সুরঞ্জাক্ষী উত্তর দেয়, দৈববাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। দেবতার প্রত্যাদেশই মানুষকে পথ দেখায় চন্দ্রপ্রভা।

এই প্রত্যাদেশ পাবার জন্যেই বুঝি পরিব্রাজক কৃষ্ণমোহন অন্ধকার পথ হেঁটে চলে। দেশ থেকে দেশান্তরে, সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে চলে নিরুদ্দেশের পথে।

মানুষকে জানতে হবে, হৃদয়ে অনুভব করতে হবে প্রেম।

তাল মাত্রা, রাগরাগিণী, সপ্তসুরের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে সঙ্গীতকে। সত্য দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণমোহন, বুঝতে পেরেছে সঙ্গীত-শাস্ত্রই সাধনার সিদ্ধির পথ নয়। সঙ্গীতকে ভারতবর্ষে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রাণের সঞ্জীবনী-স্পর্শ দিতে হবে। অনুরাগের ব্যথা ব্যর্থতা আনন্দ উল্লাস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সুর হয়ে প্রকাশ হলেই সঙ্গীতের সার্থকতা ; জানতে পেরেছে কৃষ্ণমোহন, মনকে প্রকাশ করতে হলে মানুষকে জানতে হবে। রাজসিক জলসামহলে মানুষ নেই, আছে শুধু বিলাস।

নারীর প্রতি অনুরাগ নয়। জীবনের প্রতি। মানুষের ওপর প্রীতির স্নেহাশিস না নামলে মুক্তির উপায় নেই। শান্তি চাই, শান্তির বারিধারাই সুখ আর সমৃদ্ধি দিতে পারে। তাই প্রীতির প্রয়োজন। ধর্মে ধর্মে হানাহানি নয়, ক্ষমা আর সখ্যসন্ধি। হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করতে হয় প্রেম আর ক্ষমা দিয়ে। তাই মানুষকে খুঁজতে বেরিয়েছে কৃষ্ণমোহন। মানুষকে জানতে, জানাতে।

অন্ধকার পথ অতিক্রম করে চলে কৃষ্ণমোহন।

চতুর্দিকে শুধু দুঃখ আর দুর্দশা। দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখতে পায় চতুষ্পার্শে। কপটাচার আর আত্মাবমাননা। সত্যকার মানুষ নেই যেন সারা ভারতে। মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে মানুষ ধর্মের হানাহানিতে। কুসংস্কারের মোহে।

দূরে হঠাৎ একসারি মশালের আলো দেখতে পায় কৃষ্ণমোহন।

পান্থশালায় আশ্রয় পাবার আশায় দ্রুত সেদিকে এগিয়ে চলে। মনের মধ্যে গুঞ্জরন তোলে একটি সুর।

পথ চলতে চলতেই কৃষ্ণমোহন গুনগুন করে গাইতে শুরু করে :

সাঁই তো ন আবে আজ, আঁধিরাত মাঝ মাঝ,
সিংহিনী জগাবে সিংহ কানন পুকার—

তন্ময় হয়ে গান গাইতে গাইতে পান্থশালার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণমোহন। মশালের আলোয় দেখতে পায় পান্থশালার সামনে একটি তরুণীকে ঘিরে একদল ফিরিঙ্গি দস্যু সুরাপানে উন্মত্ত। দেখে বুঝতে পারে, বিদেশী দস্যুদের আদেশে বিষণ্ণ মুখে তাউস বাজিয়ে চলেছে তরুণী।

মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে দস্যুদল। আবার সুরাপাত্র ভরে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে উল্লাসে।

এ-দৃশ্য দেখে ঘৃণায় সর্বশরীর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহনের। কিন্তু মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিরে যেতে ভরসা হয় না।

ধীরে ধীরে পান্থশালার কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করে।

কৃষ্ণমোহনের কণ্ঠস্বর শুনে চোখ তুলে তাকায় তরুণী। তার করুণ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় কৃষ্ণমোহন।

তরুণী ইশারায় একটি কক্ষ দেখিয়ে দেয়।

ক্লান্তিতে পান্থশালার শয্যায় শুয়ে পড়ে কৃষ্ণমোহন। শ্রান্ত চোখে ঘুম নেমে আসে। তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পায় ফিরিঙ্গিদের অট্টহাস। আর তাউস-বাদ্যের মধুর ধ্বনি। এক সময় নিদ্রায় চেতনা লুপ্ত হয়ে যায় কৃষ্ণমোহনের।

তারপর নিস্তব্ধ রাত্রিতে হঠাৎ একসময় ঘুম ভেঙে যায়।

অনুভবে বুঝতে পারে, কে যেন তার শিয়রের কাছে বসে আছে!

কৃষ্ণমোহন বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে, কে?

একটি কোমল হাত এসে মুখ চাপা দেয় কৃষ্ণমোহনের।

তারপর ধীরে ধীরে নারীকণ্ঠের অনুরোধ আসে, দস্যুদের হাত থেকে বাঁচান দরবেশ, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

তার পরিচয় জানতে চায় কৃষ্ণমোহন।

—প্রয়োজন কি পরিচয়ের চেয়ে বড়ো নয়, দরবেশ!

বিস্ময়ে বিমূঢ় কৃষ্ণমোহন শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলো।

দু'জনে নিঃশব্দে পান্থশালা ত্যাগ করে ছুটে চলে অন্ধকার পথ ধরে। বহুদূর এসে থমকে দাঁড়ায় মেয়েটি। বলে, আমি ক্লান্ত দরবেশ, বিশ্রাম করতে দিন আমাকে।

ভোর হয়ে আসছে তখন। কৃষ্ণমোহন বলে, কিন্তু দস্যুর দল যে এখনই তোমার সন্ধানে বের হবে মা, এখন তো বিশ্রাম করা চলে না।

—আমি ক্লান্ত, দরবেশ! অনুনয়ের কাতর স্বরে উত্তর দেয় মেয়েটি। বলে, দস্যুদের কাছে বন্দীজীবন কাটানোই হয়তো আমার নসীব...

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বলে, দুঃসময়ে সাহায্য চেয়ে আমাকে সত্যে আবদ্ধ করেছো, তোমাকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।

নিরাপদ দূরত্বে তাকে পৌঁছে দেয় কৃষ্ণমোহন। প্রশ্ন করে, কে তুমি, কি তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে হয়।

উত্তর আসে, আমি জুলেখা। বাংলার ভূতপূর্ব নবাব ইব্রাহিম খাঁর আত্মীয়কন্যা আমি, বেগমসাহেবা দিল্‌রস বেগমের কন্যা।

তিরিশ

শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে আলমগীরের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলো ইব্রাহিম খাঁ।

বিলাসব্যসনে আসক্ত অলস আর অকর্মণ্য ইব্রাহিম খাঁর কোনো যুক্তিতেই কান দিলেন না আওরঙ্গজেব।

বললেন, বৃদ্ধ হয়েছো ইব্রাহিম। জীবনে অনেক পাপ করেছো, মক্কায় গিয়ে বেহেস্তে যাবার আরজি দেবে, যাও।

বলে আদেশ দিলেন সপরিবারে মক্কা যাবার।

সুরাট থেকে মক্কাযাত্রী সমুদ্র-জাহাজের অধিনায়ক করে ইব্রাহিম খাঁকে আদেশ দিলেন যাত্রীদের তীর্থে নিয়ে যাওয়ার।

ফিরে আসার পথে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এলো ইব্রাহিম খাঁর।

প্রত্যাবর্তনের পথে মক্কাযাত্রীদের কাছে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার হীরে জহরত থাকে এ সংবাদ অজানা ছিলো না জলদস্যুদের!

সমুদ্রপথে ইব্রাহিম খাঁর জাহাজ আক্রমণ করলো ইংরেজ জলদস্যু।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে ডিহি কলিকাতায় যখন ইংরেজ বণিকের দল বাণিজ্যের আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে, তখন পশ্চিম প্রান্তে সুরাট অঞ্চলে, আরব সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে দস্যুর শক্তি নিয়ে বিচরণ করছে আরেকদল ইংরেজ।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ শক্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন। স্বাধীন রাজ্যের মতোই বন্দর-সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম স্থাপন করেছে তারা, কাজী নিয়োগ করে শাসন আর বিচারের ভার গ্রহণ করেছে নিজেদের হাতে। একদিকে আরবী জাহাজ লুণ্ঠন কিংবা বাণিজ্য, অন্যদিকে পাদ্রী নিয়োগ করে হিন্দু ও মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি—দু'টি মাত্র লক্ষ্য তখন পর্তুগীজদের !

পূর্বভারতে পর্তুগীজ ছিলো দস্যু, পশ্চিম উপকূলে ইংরেজ বোম্বেটের উৎপাত।

কিন্তু পশ্চিম উপকূলের পর্তুগীজদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; সৈয়দ হোক বা ব্রাহ্মণ হোক, পিতৃমাতৃহীন শিশুদের গির্জায় নিয়ে গিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়োগ করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। সুরাটের পনেরো ক্রোশ দূরে ছিলো পর্তুগীজ-পত্তন, সুদূর বোম্বাই দ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ছিলো তাদের অধিকৃত এলাকা। তার পাশেই হাবশী-রাজ্য নিজামশাহী কোকান, অন্যদিকে ইংরেজ।

বাংলা দেশে যখন বণিকের বা দস্যুর ছদ্মবেশে বিদেশী শক্তির আগমন ঘটছে, তার বহু পূর্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদেশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ভারতের পশ্চিম উপকূলে। দমন বাসি এবং আরও দু'টি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছে তখন পর্তুগীজরা। 'আসরফি' রৌপ্য মুদ্রার, 'বুজুর্গ' আর 'ফুলুস' মুদ্রার প্রচলন শুরু করেছে পর্তুগীজ বন্দর।

প্রবলপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের আইনের কোনো মূল্যই ছিলো না এই অঞ্চলে। ইংরেজ জলদস্যুর দলও তাই সমুদ্রজাহাজ লুণ্ঠন করতো, চেষ্টা করতো পর্তুগীজদের মতোই একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার।

আরব সাগরে পণ্য-জাহাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইংরেজ বোম্বেটেরা খবর পেলো, সুরাট বন্দরের সর্ববৃহৎ শাহী জাহাজ গঞ্জ-ই-সাওয়াই তীর্থযাত্রীদের নিয়ে মক্কা থেকে ফিরে আসছে। খবর শুনে লোভ জেগে উঠলো তাদের। প্রধান তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে আসে বহুমূল্য ধনরত্ন, নিখাদ স্বর্ণের তাল এবং অসংখ্য রূপসী বাঁদী—এ সংবাদ অজ্ঞাত ছিলো না বোম্বেটেদের কাছে।

সম্রাট-আদেশে অধিনায়ক হয়ে ইব্রাহিম খাঁ মক্কা থেকে ফিরে আসছিলো এই জাহাজে। সঙ্গে শত শত তীর্থযাত্রী এবং ইব্রাহিম খাঁর আত্মীয়স্বজন। সাকিনা, দিলরস্ বেগম, দিলরস্-কন্যা জুলেখা।

ইংরেজ জলদস্যুদের কাছে খবর এসে পৌঁছলো—প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যের সোনা আর রুপা নিয়ে আসছে ইব্রাহিম খাঁ। আর অসংখ্য রূপসী তুরানী বাঁদী। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে দস্যুপোতের সারি ছুটে এলো তীব্র গতিতে, ঘিরে ফেললো গঞ্জ-ই-সাওয়াই।

সমুদ্রপথেই ইব্রাহিম খাঁ দেখতে পেলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যুপোত এগিয়ে আসছে। রক্তলাল পতাকা উড়ছে দস্যুদের জাহাজে।

গঞ্জ-ই-সাওয়াইয়ের নাবিকরা আদেশ চাইলো দস্যুপোত আক্রমণ করার। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ কর্তব্য ঠিক করতে পারলো না। ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো আকস্মিক আক্রমণে। চারশত দুঃসাহসী ধর্মসৈন্য আর আশিটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও চুপ করে রইলো ইব্রাহিম খাঁ। আক্রমণ করলে জলদস্যুদের আক্রোশ বাড়তে পারে এই ভয়ে।

ধর্মসৈন্যরা বললে, হুকুম দিন খাঁ বাহাদুর! এখনও সময় আছে, তোপের মুখে উড়িয়ে দিই কাফের ইংরেজকে।

বিব্রত ইব্রাহিম খাঁ সারা জাহাজ ছুটে বেড়াতে বেড়াতে বললে, না, না। হয়তো তীর্থযাত্রী বলে নির্বিবাদে ছেড়ে দেবে দস্যুরা, কিন্তু আক্রমণ করলে···

সুরাট তখন মাত্র এক সপ্তাহের পথ।

দস্যুপোত কাছে এগিয়ে এলো।

ইব্রাহিম খাঁ আদেশ দিলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইব্রাহিম খাঁর। সাহস এবং বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন ধর্মসৈন্যরা। শাহী বন্দুকের গুলিতে স্বপক্ষেরই সৈন্যহানি ঘটলো। আর্ত চিৎকারে কলরব তুললো তীর্থযাত্রী বৃদ্ধা আর নারীর দল।

এদিকে দস্যুপোতের আগুন এসে ধ্বংস করলো গঞ্জ-ই-সাওয়াইয়ের প্রধান মাস্তুল।

আর বুঝি পথ নেই রক্ষা পাবার, সম্মান বাঁচাবার উপায় নেই। তাই দিল্‌রস বললে, চলো সাকিনা, দরিয়ায় ঝাঁপ দিই। মৃত্যুই এখন ইজ্জত বাঁচাতে পারে।

সাকিনা হাসলো। বললে, এতো স্বার্থপর তুমি দিল্‌রস বেগম? মালিকের ইজ্জত আমার ইজ্জত। তাকে ফেলে পালাতে চাও?

দিল্‌রস উপহাসের স্বরে বললে, বুঝেছি সাকিনা। মৃত্যুর ভয়ে নিজেকে বেচে দিতে চাও কাফের ইংরেজের কাছে?

—হ্যাঁ দিল্‌রস। বেচে দিতে চাই। বলে হঠাৎ একজন ধর্মসৈন্যের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেলো সাকিনা।

উন্মুক্ত তরবারি হাতে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ইংরেজ দস্যুরা। সে-দৃশ্য দেখে আতঙ্কে জাহাজের একটি কক্ষের ভেতর আত্মগোপন করলো ইব্রাহিম খাঁ।

তুরানী ক্রীতদাসীদের মাথায় পাগড়ি আর হাতে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য পিছন থেকে উৎসাহ দিলো তাদের।

অতি সহজেই জাহাজ দখল করলো বোম্বেটের দল, বন্দী করলো রূপসী বাঁদী আর বেগমদের।

তারপর তন্নতন্ন করে ইব্রাহিম খাঁকে খুজলো তারা। গোপন কক্ষের হদিস পেয়ে তরবারি হাতে তারা উল্লাসধ্বনি করতে করতে এগিয়ে এলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেলো তাদের চীৎকার।

বীরাঙ্গনার মতো তরবারি হাতে দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। সাকিনা বেগম।

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ নয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইব্রাহিম খাঁকে রক্ষা করতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। বাঁদী থেকে তাকে বেগমের আসনে বসিয়েছিলো ইব্রাহিম খাঁ। তবু যৌবনের ভ্রান্ত মোহে পথভ্রষ্ট হয়েছিলো সাকিনা।

কিন্তু তার প্রতি যে বিশ্বাস, যে নিঃসন্দিগ্ধ ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়েছে ইব্রাহিম খাঁ, তার প্রতিদান দেবে না সে ?

যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হলো শরীর। মৃত্যুবরণ করলো সাকিনা, ইব্রাহিম খাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে।

আশ্চর্য নারীচরিত্র! স্বামীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে যে অসতী নারী, কোন্ মহান কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে সে আত্মবিসর্জন দিয়ে!

বন্দী হবার ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলো বহু নারী, আত্মহত্যা করলো দিল্‌রস বেগম। কিন্তু সাকিনা, অসতী সাকিনা বেগম একদিন কৌতুকে হাসতে হাসতে যেভাবে গোপন প্রণয়পাত্র জাফর খাঁকে কোতলঘরে পাঠিয়ে নিজের সম্মান বাঁচিয়েছিলো, তেমনি হাসতে হাসতেই প্রাণ বিসর্জন দিলো ইব্রাহিম খাঁকে বাঁচাবার জন্যে।

আর ষোড়শী জুলেখা ?

সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপদেশ দিয়ে নিজেই ঝাঁপ দিলো দিল্‌রস।

কিন্তু জুলেখার সাহস হলো না।

মৃত্যু ? ভয়ে শিউরে উঠলো জুলেখা সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। না। বাঁচতে চায় জুলেখা, জীবন তার কাছে মনে হলো ইজ্জতের চেয়ে বড়ো। ইংরেজ দস্যুদের হাতে বন্দী হলো সে।

যথাসময়ে দুর্ঘটনার সংবাদ এসে পৌঁছলো সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে। সংবাদ এলো, শুধু দস্যুবৃত্তি করেই ক্ষান্ত নেই ইংরেজরা। সুরাট বন্দরে ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ামের নামাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন শুরু করেছে তারা। বোম্বাইয়ের ইংরেজ দুর্গকে সুদৃঢ় করে তুলেছে রাজ্য বিস্তারের লোভে।

ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব।

তীর্থযাত্রী জাহাজ লুণ্ঠনের খবর শুনেই আদেশ দিলেন বোম্বাইয়ের ইংরেজ দুর্গ অধিকার করতে।

কিন্তু পূর্বাহ্নেই তার গোপন সংবাদ এসে পৌঁছলো ইংরেজ দুর্গে। দস্যুর দল লুণ্ঠিত ধনরত্ন আর নারীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের চতুর্দিকে আত্মগোপন করলো, গঞ্জ-ই-সাওয়াই লুণ্ঠনের দায়িত্ব অস্বীকার করলো দুর্গের ইংরেজসৈন্যেরা।

সুদূর উড়িষ্যায় আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই গভীর অরণ্যের পান্থশালায় আশ্রয় নিয়েছিলো ফিরিঙ্গি দস্যুদল। আর দিল্‌রস বেগমের কন্যা জুলেখাকে নিয়ে এসেছিলো বাঁদী হিসেবে।

সেই জুলেখাকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করে পান্থশালা থেকে বহু ক্রোশ হেঁটে অরণ্য পার হলো কৃষ্ণমোহন। ক্লান্ত জুলেখাকে বিপন্মুক্ত করলো। নগরের প্রান্তে পৌঁছে দিলো তাকে।

অদূরে মসজিদের চূড়া দেখতে পেলো কৃষ্ণমোহন, আজান শুনতে পেলো সেখান থেকেই।

পথ-নির্দেশ করে কৃষ্ণমোহন বললে, এই পথে যাও জুলেখা, মসজিদে আশ্রয় পাবে।

কিন্তু ধর্মের আশ্রয় চায় না জুলেখা। ধর্মের বীভৎস হানাহানি দেখতে পেয়েছে সে ইব্রাহিম খাঁ নবাবী তক্ত হারাবার পর।

তাই সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো জুলেখা।—আপনি?

কৃষ্ণমোহন মৃদু হেসে বললে, আমি ভিন্ন পথের যাত্রী জুলেখা। সঙ্গীতের সাধনায়, জীবনের সাধনায় পথ খুঁজে চলেছি আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো জুলেখা, বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সে কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে। বললে, আমাকেও সঙ্গে নিন দরবেশ, আমাকেও সেই সাধনার পথে নিয়ে চলুন।

একত্রিশ

বিষ্ণুপুরের বিষাক্ত বাতাস থেকে মুক্তি পাবার আগ্রহেই হয়তো পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিলো কৃষ্ণমোহন। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গোপন চক্রান্তের বিষনিঃশ্বাস কলুষিত করে তুলছিলো প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ, বিদ্বেষের গরলে নীল হয়ে উঠছিলো কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, গণ্টনবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, লালবাঁধের জলস্রোত। মুক্তির আলোবাতাস পাবার জন্যেই হয়তো বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে গেলো কৃষ্ণমোহন।

কিন্তু দিনের পর দিন চোখের সামনে রঘুনাথের হঠকারিতা আর লালবাঈয়ের লুব্ধতা দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না জ্যোতিষাচার্য।

অথচ উপায় নেই। ধীরে ধীরে রাজকার্যে মোগল কর্মচারী নিয়োগ করে বিষ্ণুপুরের একতায় বিভেদের প্রাচীর গেঁথে তুলেছে লালবাঈ। সে জানে, কাঞ্চনীর সন্তানকে সিংহাসন দেবে না রাজ্যের পুরাতন কর্মচারীর দল। তাই ধীরে ধীরে তার অনুরোধে ফৌজদার, থানাদার, রিসাল্‌হা, নাওয়ারা সবক্ষেত্রেই ভিনদেশী মোগল এবং আফগান নিযুক্ত হয়েছে। আমিন, কানুনগো, রাহাদার, ঘাটোয়ালদের মধ্যেও বিধর্মীর সংখ্যা কম নয়।

সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে দু'টি দল গড়ে উঠেছে তখন। একদিকে লালবাঈ-নিযুক্ত ফৌজ আর কর্মচারী, অন্যদিকে হিন্দু প্রজা, হিন্দু সৈন্য, জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, মুখ্য অমাত্য, দেওয়ানজী।

খাজাঞ্চীর গোপন কক্ষে পরামর্শ করেন জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, দেওয়ানজী এবং অন্যান্য কর্মচারীর দল।

চন্দ্রপ্রভার বিশ্বস্ত সখী সুরঙ্গাক্ষীও এসে যোগ দেয় চক্রান্তে।

বলে, রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গীত

নয়, লালবাঈয়ের প্রতি লালসায় মত্ত বিষ্ণুপুররাজ। লালবাঈকে খুশী করার জন্যে চন্দ্রপ্রভাকে পদাঘাত করতেও লজ্জা বোধ করেননি তিনি।

চন্দ্রপ্রভাকে, রানী চন্দ্রপ্রভাকে পদাঘাত করেছে রঘুনাথ!

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যোতিষাচার্য। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সভাপণ্ডিত। এ তো চন্দ্রপ্রভার অপমান নয়, সমগ্র বিষ্ণুপুরের অপমান।

দেওয়ানজী প্রশ্ন করলেন, উপায়?

পরস্পর চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন জ্যোতিষাচার্য আর দেওয়ানজী। সত্যই তো, উপায় কি? কি পথ আছে রঘুনাথের এই ম্লেচ্ছ অনাচার বন্ধ করার?

সুরঞ্জাক্ষী ধীরে ধীরে বললে, উপায় আছে। গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে লালবাঈকে হত্যা করতে হবে।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, না, না। সে-পথ বড়ো সাংঘাতিক।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সুরঞ্জাক্ষী! উষ্মার স্বরে বললে, সাংঘাতিক সমস্যার সমাধানও সাংঘাতিক হতে বাধ্য গুরুদেব। বৈষ্ণবধর্মের নামে বিষ্ণুপুর আজ সাহস হারিয়েছে, শক্তি হারিয়েছে, ভীরু কাপুরুষতাকে তাই ধর্ম বলে চালাতে চাইছেন, জ্যোতিষাচার্য। চন্দ্রপ্রভা চিতোয়া-বরদার কন্যা, খড়্গেশ্বরীর উপাসক। সেও আজ এই বৈষ্ণবধর্মের কাপুরুষতায় সাহস হারিয়েছে। আজ আর কোনো পথ নেই, শান্তি আর শৃঙ্খলাই যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে লালবাঈ আর রঘুনাথের অবৈধ সন্তানের অধিকারই স্বীকার করে নিন।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন, কৌতুকের হাসি!

বললেন, পাপপুণ্যের বিচার নয় সুরঞ্জাক্ষী। সৈন্যবিভাগে আজ লালবাঈয়েরই আধিপত্য, লালবাঈয়ের পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চায় তারা। এ ক্ষেত্রে লালবাঈকে হত্যা করলে, তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে!

জ্যোতিষাচার্যের যুক্তি সমর্থন করলেন দেওয়ানজী। বললেন, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মনসবদার সুলেমান খাঁ এখন বিষ্ণুপুরের অতিথি হয়ে রয়েছেন। এ সময় লালবাঈকে হত্যা করলে বিধর্মী সৈন্যরা

তাঁর সাহায্য পাবে, হয়তো এই বিভেদের সুযোগ নিয়েই বিষ্ণুপুরকে গ্রাস করবে মুর্শিদকুলি।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, তবে কি কোনো পথ নেই?

—আছে। দৃঢ় গলায় উত্তর দিলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, প্রজার শক্তিই রাজশক্তি। কিন্তু আমাদের নির্দেশ হয়তো তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। বিষ্ণুপুরের রানী চন্দ্রপ্রভার নির্দেশ পেলে এই প্রজাশক্তিই বিদ্রোহী সৈন্যদের ধ্বংস করতে পারবে, সিংহাসনে বসাতে পারবে গোপালকে, সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে।

সুরঞ্জাক্ষী সন্দেহের স্বরে বলে, কিন্তু চন্দ্রপ্রভা কি এই নির্দেশ দিতে পারবে? বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছে চন্দ্রপ্রভা, কৃষ্ণপ্রেমের গান তার কণ্ঠে, লালবাঈকে হত্যা করার নির্দেশ কি চন্দ্রপ্রভা কোনো-দিন উচ্চারণ করতে পারবে?

—পারবে। জ্যোতিষাচার্য উত্তর দেন, সে ভার তোমার ওপর সুরঞ্জাক্ষী। তুমি তার আশৈশব সখী, তার সবচেয়ে বড়ো আস্থা তোমার ওপর, তাকে শক্তি আর সাহস যোগাবার দায়িত্ব তোমার।

উপদেশ শুনে ফিরে এলো সুরঞ্জাক্ষী।

প্রাসাদে ফিরে এলো। নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভার কক্ষদ্বারে।

মিষ্টি মধুর একটি সুরের গুঞ্জন শুনতে পেলো সুরঞ্জাক্ষী। দেখলে, স্বর্ণপালঙ্কের কোমল শয্যায় শুয়ে আছে কিশোর গোপাল, আর ধীর-স্বরে গান গাইছে চন্দ্রপ্রভা তার চোখে ঘুম নামাবার চেষ্টায়।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে সুরঞ্জাক্ষী, দেখলে তৃপ্তির আবেশ চন্দ্রপ্রভার চোখে, মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য ঠিক করে নিলো সুরঞ্জাক্ষী, যেন হঠাৎ তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো চন্দ্রপ্রভার দুর্বলতা।

দ্রুত এগিয়ে এলো সে চন্দ্রপ্রভার কাছে। বললে, গোপন সংবাদ আছে চন্দ্রপ্রভা।

ভীতত্রস্ত ভাবে চোখ তুলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, বিস্ময়ের উৎকণ্ঠার প্রশ্ন ফুটে উঠলো তার চোখে। প্রশ্ন করলে, কি সংবাদ সুরঞ্জাক্ষী?

সুরঞ্জাক্ষী কাছে এগিয়ে এলো। ফিসফিস করে বললে, বড়ো আতঙ্কের সংবাদ চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈ গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেছে গোপালের জীবননাশ করবার জন্যে। লালবাঈয়ের সন্তানের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যে।

উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, পরক্ষণেই গোপালকে বুকে চেপে ধরলো। বললে, না না সুরঞ্জাক্ষী, এ কি অভিশাপ নিয়ে এসেছে লালবাঈ। আমার প্রাণের গোপালকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে প্রাণ দিয়ে। আমি ঐশ্বর্য চাই না সুরঞ্জাক্ষী, রাজ্য চাই না। চলো, গোপালকে নিয়ে এ অভিশপ্ত রাজ্য থেকে চলে চাই আমরা!

চন্দ্রপ্রভার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। গোপালকে আরো গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরলো সে।

সুরঞ্জাক্ষী বললে, না চন্দ্রপ্রভা, লালবাঈয়ের বিষদৃষ্টি থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে না। ভীরুতা দিয়ে পাপকে জয় করতে চাও তুমি? শক্ত হয়ে দাঁড়াও চন্দ্রপ্রভা, তার এই অন্যায়কে রোধ করো।

—আমি? আমি রোধ করবো লালবাঈয়ের অন্যায়, কতোটুকু শক্তি আমার সুরঞ্জাক্ষী? স্বামীর পদাঘাত যার জীবনের একমাত্র সম্বল, তার যে নিজেরই দাঁড়াবার স্থান নেই সুরঞ্জাক্ষী। দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রপ্রভা বললে।

সুরঞ্জাক্ষী হেসে বললে, তোমার চেয়ে বেশি শক্তি আজ আর কারও নেই চন্দ্রপ্রভা। খড়োশ্বরীর উপাসক তুমি, বিশালাক্ষীর উপাসক, তাঁর শক্তি লুকিয়ে আছে তোমার শরীরে। তাঁরই আশীর্বাদে একদিন তরবারি হাতে হার্মাদদের আক্রমণ প্রতিহত করার সাহস জুটেছিলো তোমার, সেই সাহস আজ কোথায় চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা হতাশার চোখ চেয়ে বললে, কিন্তু আজ যে আমার সব শক্তি হারিয়ে গেছে সুরঞ্জাক্ষী।

সুরঞ্জাক্ষী মৃদু হেসে বললে, না চন্দ্রপ্রভা। তোমার প্রজারাই তোমার শক্তি। একবার তোমার বিপদের কথা নিজের মুখে তাদের শুনিয়ে দাও তুমি, দেখবে লালবাঈয়ের সব চক্রান্ত মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা। বললে, তাই হবে সুরঞ্জাক্ষী, তাই হবে। দরবার আহ্বান করার ব্যবস্থা করো, আমার গোপালকে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরে আমার বিপদের কথা জানাবো তাদের। গোপালের মঙ্গলের জন্যে যদি স্বামীর অমঙ্গল ডেকে আনতে হয় তবু ভয় পাবো না আমি।

খবর অজ্ঞাত রইলো না লালবাঈয়ের কাছে।

শুনলো সে, দরবারে হিন্দুপ্রজা আর রাজকর্মচারীদের কাছে চন্দ্রপ্রভা নিজেই দর্শন দিয়েছে, জানিয়েছে তার বিপদ-সম্ভাবনার কথা। শুনলো, হিংস্র উত্তেজনায় প্রজারা চন্দ্রপ্রভার জয়ধ্বনি তুলে, গোপালের জয়ধ্বনি তুলে প্রতিজ্ঞা করেছে লালবাঈকে হত্যা করে বিষ্ণুপুরকে নিষ্কণ্টক করবে।

একবার মনে হলো, নিজেই গিয়ে সে সাক্ষাৎ করবে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে। জানিয়ে আসবে, এ গুজব মিথ্যা। গোপালের জীবন তো সে চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, মিথ্যা চেষ্টা। চন্দ্রপ্রভা কি তার ওপর আস্থা রাখবে? কখনোই না।

নিঃশব্দে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লালবাঈ। ফিরে তাকালো রঘুনাথের দিকে। দেখলে, সুরার নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ। ঘৃণার দৃষ্টিতে রঘুনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেলো লালবাঈয়ের চোখে।

ধীরে ধীরে জাফরির পাশে ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়ালো লালবাঈ। আকাশে দু'একটি তারার ঝিকিমিকি। লালবাঁধের জলে রাজহংসের মতো জলবিহার-নৌকার সারি। আর অদূরের বিষ্ণুপুর-রাজের অতিথিশালার কক্ষে স্তিমিত আলো। কি করবে সে? কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে কি যেন চিন্তা করলো।

স্থলেমান! হাবশী স্থলেমানের কথা চকিতে মনে পড়লো লালবাঈয়ের।

আজীবন যাকে ঘৃণা করে এসেছে, জীবনের অদম্য উচ্চাশাকে সার্থক করে তুলতে হলে তার কাছেই ছুটে যেতে হবে।

স্থলেমান খাঁ আজ তার একমাত্র ভরসা। ছলে বলে, যে কোনো উপায়ে তাকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করতে হবে। প্রণয়পাত্র আজ ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে, কার্যসিদ্ধির জন্যে ঘৃণার পাত্রকে আজ প্রণয়পাত্রে রূপান্তরিত করতে হবে। স্থলেমানকে জয় করতে পারলে বিষ্ণুপুরের সৈন্যসামন্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে সে। একটি রাজ্যকে হাতের মুঠোয় পাবে, রাজ্যপরিচালনা করবে সে নিজে। আর তার সন্তানকে বসাবে রাজ্যের সিংহাসনে।

নিজের মনেই হাসলো লালবাঈ। দুর্বলচিত্ত কামগ্রস্ত রঘুনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলে। প্রেম? না, রঘুনাথকে কোনোদিনই বোধ হয় মনেপ্রাণে ভালোবাসেনি সে। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সোপান ভেবেছে তাকে।

ঘৃণা নয়, স্থলেমান খাঁর সঙ্গে আজ প্রেমের অভিনয় করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় আত্মদানেও লজ্জা বোধ করবে না।

মনে মনে উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে তোশাখানায় বেশ বদল করতে ঢুকলো লালবাঈ।

রক্তলাল রেশমী ঘাগরায় নূতন করে সাজালে সে নিজেকে। বুকের উল্লাস প্রলুব্ধি জাগালো লাল মখমলের কাঁচুলির বন্ধনে। সোনালী জরি আর হীরে-জহরতে ফুলদার লাল কাঁচুলির আগুন

ঠিকরে পড়লো দেওয়ালের আয়নায়। সলমা আর চুম্‌কি চমক দিলো আবরোয়ানের ওড়নায়। বেণীতে বাঁধলে চম্পা চামেলী। সুর্মা টানলে চোখের কোণে। সিঁথি বেয়ে কপালে নামলো হীরের টায়রা। অধরে ওষ্ঠে কুঙ্কুম। কানে কস্তুরীর সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে, বেশবাসে উগ্র আতর। নাকে পরলে বেশর, বাহুতে গজদন্তের বাজুবন্ধ। মণিবন্ধে নীলাচুড়ি, গণ্ডার শৃঙ্গের কঙ্কণ। গলায় দুলিয়ে দিলে মুক্তার কণ্ঠমালা। পায়ে পাসুলি পাঁয়জোড়।

আলপাকার বোরখায় সারা শরীর ঢেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো লালবাঈ।

সমস্ত পৃথিবী নিঃঝুম। দু'একটা রাত-পাখির ডাক। লালবাঁধের পাড়ে ঝিঁঝির ঝিল্লিরব।

অতিথিশালার সামনে এসে দাঁড়ালো লালবাঈ, একটা থামের আড়ালে। দ্বাররক্ষী মোগল বরকন্দাজ ঘুমে ঢুলছে তখন সিদ্ধির নেশায়।

এক ফাঁকে তাকে দ্রুত অতিক্রম করে গেলো লালবাঈ। দেখলে, ভিতরের প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে আরেকজন রক্ষী।

হঠাৎ যেন চমকে ফিরে তাকালো রক্ষী, টহল দিতে দিতে।

এপাশ ওপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজলে। তারপর নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে এগিয়ে গেলো।

সুযোগ পেয়েই কিংখাবের পর্দা সরিয়ে সুলেমান খাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো লালবাঈ।

শ্বেতশুভ্র শয্যায় অর্ধশয়ান অবস্থায় বসে বসে একমনে তলোয়ার পরিষ্কার করছিলো হাবশী সুলেমান।

লালবাঈয়ের মনে হলো বিরাটকায় একটা দৈত্য যেন পালঙ্কের গির্দায় পিঠ আর মর্মরের মেঝেতে পা রেখে আয়েশে বসে আছে। মসিকৃষ্ণ অসুরের হাতে ধারালো তরবারি।

মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠলো লালবাঈয়ের।

মনে পড়লো, বিবিবাজারের সেই ঘটনা।

ফকির সাহেবের চবুতরা থেকে নসীব জেনে ফিরে আসছিলো লালী। বাঁদী তল্লাটের তাঁবুতে প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্তে আসুরিক শক্তিতে দু'টি হাত সেদিন এই জিনের বুকে বন্দী করেছিলো লালীকে, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলো লালী।

নিলামদার মনিবের আদেশে সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিলো হাবশীর পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিলো।

তারপর নিলামদারের আদেশেই খোজা বান্দার দল বাঁধন খুলে দিয়েছিলো তার। আর অদ্ভুত এক বিকৃত কুটিল হাসি হেসে তর্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিলো হাবশী সুলেমান।

নিয়তির বিচিত্র পথ সেই সুলেমানকেই বারংবার এনে দিয়েছে লালীর জীবনে।

রহিম খাঁর মজলিসের দৃশ্যটা মনে পড়লো লালীর।

হঠাৎ নাচ থেমে গিয়েছিলো সেদিন, তাল কেটে গিয়েছিলো এই হাবশী সুলেমান পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই।

ভীরু কবুতরের মতো সেদিন নাচ থামিয়ে ধীরে ধীরে হীরাবাঈয়ের কাছে এসে বসে পড়েছিলো লালী। আর তার চোখে আতঙ্ক দেখে হাবশী সুলেমানের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিলো রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ।

আশ্চর্য! নিয়তির নির্দেশেই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড়ো আতঙ্কটা আজ জীবনের সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো লালবাঈ।

এক ফালি আলো এসে ঠিকরে পড়লো সুলেমানের তরবারিতে।

চমকে চোখ তুললো সুলেমান। আলপাকার বোরখায় ঢাকা রহস্যের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কে?

উত্তর দিলো না লালবাঈ। ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে বোরখার আবরণ তুলে ধরলো।

বিস্ময় ফুটলো স্থলেমানের কণ্ঠে। অস্ফুটে বললে, লালবাঈ!

দু'টি ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে লালবাঈ ইশারায় চুপ করতে বললে স্থলেমানকে। তারপর বোরখা খুলে রেখে কাছে এগিয়ে গেলো।

স্থলেমান চাপাগলায় বললে, লালবাঈ, তুমি?

দ্বাররক্ষী টহল দিতে দিতে স্থলেমানের গলা শুনতে পেলো। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেলো তার।

পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে চঞ্চল ভাবে টহল দিতে শুরু করলো সে আবার।

লালবাঈ স্থলেমান খাঁর শরীর স্পর্শ করে বসলো পালঙ্কের বাজুতে ঠেস দিয়ে।

সুর্মাটানা চোখের কটাক্ষ হেনে কামনার মৃদু হাসি দোলালে সে ঠোঁটের কোণে। বললে, আরজি আছে খাঁ বাহাদুর।

—আরজি?

উত্তর এলো, বিষ্ণুপুরের তক্তে আমার সন্তানকে বসাতে চাই খাঁ বাহাদুর।

হেসে উঠলো স্থলেমান। বললে, আর রঘুনাথের ভ্রাতা গোপালকে গোপনে হত্যা করতে চাও, এই তো?

লালবাঈ ঢলে পড়লো স্থলেমানের বুকে। ফিসফিস করে বললে, না, খাঁ সাহেব। গোপালকে হত্যা করলেও বাঈজীর ছেলেকে সিংহাসন দেবে না হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর।

—তবে?

হাসলো লালবাঈ। মোহময় দৃষ্টিতে স্থলেমানের দিকে তাকিয়ে দু'টি কোমল বাহুর আলিঙ্গনে হাবশী মনসবদারের কণ্ঠলগ্না হলো।

নেশা জেগে উঠলো বুঝি সুলেমানের রক্তে। কিন্তু লালবাঈয়ের এই আকস্মিক ব্যবহার কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয় সুলেমানের। কেমন যেন রহস্যময়।

লালবাঈয়ের কামনামদির উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে অবশ হয়ে আসে সুলেমানের সব চেতনা।

কুহকিনীর সহস্রবাহু মরীচিকার বন্ধনে যেন সুলেমানকে নিস্তেজ করে দিতে চায় লালবাঈ।

অস্ফুটে সুলেমান প্রশ্ন করে, কি চাও তুমি লালবাঈ, কি চাও আমার কাছে?

কৌতুকের মৃদু কটাক্ষ হেনে লালবাঈ ফিসফিস করে বলে, তোমাকে! তোমাকে সুলেমান খাঁ।

নিঃশ্বাসরোধ করে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায় সুলেমান।

লালবাঈ তার দেহের যৌবনছন্দের লোভানি জ্বেলে আরো কাছে এগিয়ে আসে। বলে, শুধু সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়েই তৃপ্ত হতে চাই না খাঁ বাহাদুর, বিষ্ণুপুরের রানীর ইজ্জত চাই আমি, বেগম হতে চাই।

চুপ করে থাকে সুলেমান। এ কি অসম্ভব বাসনা? এ কি অসম্ভব উচ্চাশা এক তুচ্ছ কাঞ্চনীর?

লালবাঈ ফিসফিস করে বলে, রঘুনাথ আমার খেলার পুতুল খাঁ বাহাদুর, আমার হুকুমের গোলাম বানিয়েছি তাকে। কিন্তু তার প্রজাদের বশ করবার মতো শক্তি নেই আমার। আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনে রাজ্যের সব প্রজা, সব কর্মচারী আর ফৌজ ভোজন-তলায় আসবে আমার নফর রঘুনাথের হুকুমে।

—তারপর?

সুলেমানের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনে লালবাঈ। বলে, সেই সময় তোমার রিসাল্‌হা সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করবে তুমি, জয় করে নেবে বিষ্ণুপুর রাজ্য।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায় সুলেমান। উত্তর দিতে পারে না লালবাঈয়ের কথার।

লালবাঈ আবার ফিসফিস করে বলে, বাদশাহ হতে চাও না তুমি, রাজত্ব চাও না? ভেবে দেখো মেহের, তুমি হবে বিষ্ণুপুরের বাদশাহ, আর আমি···আমি তোমার বেগম।

সুলেমানের দিকে কামমদির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে লালবাঈ।

মনে মনে যেন শিউরে ওঠে সুলেমান। বেহেস্তের হুরীর মতো এই রূপের আড়ালে এ কি নৃশংসতা, এ কি অচিন্ত্যনীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা!

ধীরে ধীরে লালবাঈয়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ায় সুলেমান।

বলে, ফিরে যাও তুমি, লালবাঈ। ফিরে যাও। আমাকে ভাবতে দাও, আমাকে ভাবতে দাও।

বারে বারে নিজের মূল্য যাচাই করেছে লালবাঈ। অনুরোধে অনুরাগে যা কিছু কামনা জানিয়েছে সে, রঘুনাথ আদেশ বলেই গ্রহণ করেছে।

রঘুনাথ-অনুজ গোপাল সিংহের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমস্ত বিষ্ণুপুর-অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো ভোজনতলায়। উৎসবের অনুষ্ঠানে সপ্তাহব্যাপী উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিলো। দেওদার পাতায়, আমের শাখায়, লতায় কুসুমে সাজানো হয়েছিলো সারা নগর। সিংহদরজার রোশনচৌকি নানা বর্ণের রেশম বস্ত্রে, রঙিন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো সেদিন। নহবত সুর ধরেছিলো সুখের, আনন্দের।

আর, এই দৃশ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেছিলো লালবাঈ।

আদরে ঢলে পড়ে অভিমানের সুরে বলেছিলো, চন্দ্রপ্রভাকেই তুমি ভালোবাসো রাজাবাহাদুর, আর গোপালকে। তোমার কাছে কানাকড়িরও কিম্মত নেই লালবাঈয়ের।

সোহাগের স্পর্শে লালবাঈকে কাছে টেনে নিয়ে রঘুনাথ মৃদু হেসে বলেছিলো, কেন লালী ?

—আমার পুত্রের জন্যও কি এমনি উৎসবের ব্যবস্থা হবে ? প্রশ্ন করেছিলো লালবাঈ।

—হবে, এর চেয়েও অনেকগুণ বেশী হবে লালী।

—কিন্তু আজ তোমার প্রজারা যে উৎসাহ নিয়ে এসে জমা হয়েছে ভোজনতলায়, কাঞ্চনীর নিমন্ত্রণও কি তারা সেদিন এভাবে রক্ষা করবে ?

রঘুনাথ ক্রোধের স্বরে বলেছিলো, লালবাঈয়ের অসম্মান ঘটলে কোনো প্রজা রঘুনাথের কাছে ক্ষমা পাবে না লালী, তোমার অপমানে আমার অপমান। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখালে প্রাণদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হবো না আমি।

সেইদিনের এই প্রতিশ্রুতিই স্মরণ করিয়ে দিলো লালবাঈ। আর রঘুনাথ বললে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা লালী।

নিজের মনকে যুক্তির সাহায্যে প্রবোধ দিতে চায় রঘুনাথ। লালবাঈয়ের সন্তানই তার একমাত্র সন্তান। কাঞ্চনী হোক, বিধর্মী হোক, এই শিশুর দেহে রঘুনাথের রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তা হলে সিংহাসনের মর্যাদা কেন পাবে না সে! শুধু তাদের প্রণয়ে মন্ত্রোচ্চারণের স্বাক্ষর নেই বলে!

ক্রুদ্ধ স্বরে হুকুম জানিয়ে দিলো রঘুনাথ।

ঢোলশোহরত খবর ছড়িয়ে দিলো চতুর্দিকে। হিন্দু রাজকর্মচারী আর বিশিষ্ট প্রজাদের নামে নিমন্ত্রণ পাঠালো রঘুনাথ।

লালবাঈয়ের পুত্র-সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে ভোজনতলায় আমন্ত্রণ জানালো। আমন্ত্রণ নয়, হুকুমনামা! নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে, শাস্তি প্রাণদণ্ড। ঢোলশোহরত ছড়িয়ে দিলো এই আদেশ।

প্রজারা অসন্তুষ্ট হলো, রাজকর্মচারীরা ক্রুদ্ধ হলো। মল্লবংশ কোনোদিন উপপত্নীর সন্তানের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করেনি এ-ভাবে, প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানায়নি প্রজাবর্গকে। আর রঘুনাথ বিষ্ণুপুর রাজ্যের সব সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায় এক যবনী উপপত্নীর নির্দেশে।

তবু নিমন্ত্রণ অস্বীকার করার সাহস হলো না কারও। সুরাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজা রঘুনাথের অত্যাচার বড়ো নৃশংস, যুক্তিহীন নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

কেউই জানলো না রাজপ্রাসাদের নিমন্ত্রণের পিছনে লালবাঈয়ের কি অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে।

জ্যোতিষাচার্য ভাবলেন, ভোজনতলায় কাঞ্চনীর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা, কর্মচারী, সৈন্যদের নিমন্ত্রণ করার পিছনে কি কোনো উদ্দেশ্য নেই?

নিশ্চয় কোনো অভিসন্ধি আছে এর পিছনে।

দেওয়ানজীকে গোপনে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছি দেওয়ানজী, এই নিমন্ত্রণের আড়ালে।

—কি ষড়যন্ত্র গুরুদেব?—প্রশ্ন করলেন দেওয়ানজী।

জ্যোতিষাচার্য হাসলেন।—হিন্দু বিষ্ণুপুররাজ্যকে বিধর্মীর রাজ্যে পরিণত করতে চায় লালবাঈ। ভোজনতলায় সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করাতে চায়। কাঞ্চনী জানে ধর্মই হিন্দুর মেরুদণ্ড, তাই ধর্মনাশ করতে চায় যবনী।

চমকে উঠলেন দেওয়ানজী। দেওয়ানজীর কাছ থেকে এ সংবাদ শুনে চমকে উঠলেন সভাপণ্ডিত।

বললেন, এর প্রতিকার?

মনে মনে হাসলেন জ্যোতিষাচার্য।

জ্যোতিষাচার্য জানেন, চন্দ্রপ্রভার কাছে ধর্মের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই, ধর্মের স্বার্থে নিজের স্বার্থকেও বলি দিতে পারে চন্দ্রপ্রভা।

শুধু এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা পৌঁছে দিতে হবে চন্দ্রপ্রভার কানে।

লালবাঈ বিদায় নিতেই সারা ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিলো সুলেমান।

ঢোলশোহরতের খবর শুনে চিন্তিত হয়ে উঠলো।

জরিয়ার হাতে গোপন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো চন্দ্রপ্রভার। যে লালবাঈকে পাবার বাসনায় সারা জীবন ছুটে চলেছিলো সুলেমান, আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও বুঝিবা ছুঁড়ে ফেলতে চায়।

সুলেমান নিজেই বুঝতে পারে না, কেন এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেলো তার মনে। বাসনা চরিতার্থ করার আগ্রহেই বড়ো হতে চেয়েছে বাঁদীবাজারের হাবশী প্রহরী; ঐশ্বর্যের পুরস্কারকে তুচ্ছ করেছে, রহিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে, নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এই যত্নলালিত কামনা পূরণের আশাতেই মুর্শিদকুলির পরোয়ানা নিয়ে ছুটে এসেছে সে।

কিন্তু এমন অযাচিত ভাবে উপযাচিকার অর্ঘ্য নিয়ে লালবাঈ নিজেই ধরা দিতে চাইবে তার লালসার বন্ধনে, কোনোদিন কল্পনাও করেনি সুলেমান।

আপন শক্তিতে অধিকার করা নয়, যেন আপন আত্মাকে শয়তানের হাতে বেচে দেওয়া। এমনভাবে তো লালবাঈকে চায়নি সে!

উপযাচিকা লালবাঈ যেন তার অহঙ্কারের গায়ে আঘাত হেনে দিয়ে গেছে। যেন তাচ্ছিল্যের হাসিতে বলে গেছে, লালবাঈ আপন ইচ্ছায় ধরা না দিলে কোনো শক্তি দিয়েই তাকে অধিকার করা যায় না, কেনা যায় না তাকে রাজৈশ্বর্য দিয়েও।

হতাশা দেখা দিলো সুলেমানের চোখে। এই মিথ্যা মরীচিকার

পিছনেই কি সারাজীবন ছুটে চলেছে সে! এই নৃশংস, হীন, অবিশ্বাসিনীর রূপের পিছনে?

নিজের মনেই হাসলো সুলেমান। নারীর সুন্দর মুখের আড়ালে অবিশ্বাসিনীর মূর্তি এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে জানতো না। কল্পনাও করেনি, আকাঙ্ক্ষার সর্পিল দৃষ্টিতে এভাবে প্রণয়পাত্রের জীবন বিষাক্ত করে তুলতে চাইবে রঘুনাথের প্রণয়িনী।

হঠাৎ তাই কর্তব্য বড়ো হয়ে দেখা দিলো সুলেমানের চোখে।

গোপনে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে সুলেমান।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নত হয়ে তরবারি রাখলে সে চন্দ্রপ্রভার পদপ্রান্তে। লালবাঈয়ের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো সুলেমান, আর স্বচ্ছ পর্দার আবরণের ওপারে এই ভিন্ন রূপ দেখে শ্রদ্ধায় নত হলো সে।

বীরাঙ্গনার মূর্তি যেন! মুখে মাতৃস্নেহের অপূর্ব হাস্য, সুধাবর্ষী চোখে কমনীয় রূপ।

সুলেমান বললে, মুর্শিদকুলি খাঁর যে পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলাম রাজমহিষী, সে পরোয়ানা ফিরে নিয়ে চলেছি। যে স্বাধীনতা হরণ করতে এসেছিলাম, বিষ্ণুপুর সে স্বাধীনতা হারিয়ে বসে আছে এক তুচ্ছ কাঞ্চনীর কাছে।

চুপ করে রইলো চন্দ্রপ্রভা। কি উত্তর দেবে সে এ সত্য উক্তির!

সুলেমান বললে, কাঞ্চনীর চক্রান্ত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করুন রানী সাহেবা। রক্ষা করুন আপনার সন্তানতুল্য গোপালের ভবিষ্যৎ সিংহাসন।

লালবাঈয়ের চক্রান্তের আভাস পেয়ে ক্রোধের দৃষ্টি ফুটে উঠলো চন্দ্রপ্রভার চোখে।

দৃঢ় গলায় জ্যোতিষাচার্যকে উদ্দেশ করে বললে, আর নয়, অনেক সহ্য করেছি আমি। বিহিত করুন গুরুদেব।

চন্দ্রপ্রভাকে কুর্নিশ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো সুলেমান। না, রঘুনাথকেও লালবাঈয়ের কুটিলতার আভাস দিয়ে যাবে সে। যে

রূপের কাছে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়েছে তার মাথা, তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করে যাবে।

বিদায় নিয়ে স্থলেমান চলে যেতেই জ্যোতিষাচার্য বললেন, মিথ্যা নয় মা স্থলেমান খাঁর কথা। কিন্তু শত্রু আজ লালবাঈ নয়, শত্রু রঘুনাথ। প্রবঞ্চনা করে সমগ্র বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের ধর্মনাশ করতে চান রঘুনাথ।

চুপ করে রইলো চন্দ্রপ্রভা, উত্তর দিতে পারলো না জ্যোতিষাচার্যের অনুচ্চারিত প্রশ্নের। ধর্মনাশ? ধর্মের জন্যেই তো জীবন, মনে হলো চন্দ্রপ্রভার। সেই ধর্ম হারাবে বিষ্ণুপুর?

জ্যোতিষাচার্য পুনরায় বললেন, স্বহস্তে বিষপ্রয়োগ করে রঘুনাথ গোপালকে হত্যা করতে চান, গুপ্তচরের কাছে এ-সংবাদ পেয়েছি মা!

উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি তুলে জ্যোতিষাচার্যের মুখের দিকে তাকালো চন্দ্রপ্রভা, হু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার চোখ বেয়ে।

পরমুহূর্তেই ছুটে পালিয়ে এলো চন্দ্রপ্রভা।

কক্ষে ফিরে এসে নিদ্রিত গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। না, না, সব অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে তাকে ভ্রাতৃহন্তার হাত থেকে।

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদের প্রতিটি পাথরে যেন সেই পুরনো দিনের অভিশাপ বিষনিঃশ্বাস ফেলছে। বীর সিংহের অভিশপ্ত বংশে পুনরায় বুঝি সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

নৃশংস বীর সিংহ আপন ভ্রাতাকে বিষপ্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়নি। একটির পর একটি সন্তানকে হত্যা করেছিলো রাজসিক অহঙ্কারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র হুর্জন সিংহকেও হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলো সামান্য কারণে। রানী শিরোমণির কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করেনি সেদিন।

জল্লাদের মায়া-মমতাই গোপনে রক্ষা করেছিলো হুর্জন সিংহকে। সেই হুর্জন সিংহের পুত্র রঘুনাথের জীবনেও আজ বীর সিংহের

নৃশংসতা নেমে এসেছে। কিন্তু গোপাল তো শুধু একটি কিশোর নয়, সে আজ বিষ্ণুপুরের ধর্মের প্রতীক।

কিশোর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সজল চোখে গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা।

দেখলে, নবাবী রিসাল্‌হা সৈন্যের দল নগরদ্বার অতিক্রম করার জন্য তৈরী হচ্ছে বিদায়-নহবত বাজিয়ে। ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে বাতাসে।

উদাসভাবে রাজোদ্যানের দিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা। দেখলে, প্রাসাদের শবরী দেহরক্ষী নারীর দল তীর-ধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছে।

অসহ্য এ দুশ্চিন্তা। হঠাৎ যেন দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার পথ খুঁজে পেলো চন্দ্রপ্রভা।

সুরঞ্জাক্ষীকে ডেকে তার হাতে গোপালের ভার দিয়ে শয্যাকক্ষ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে চন্দ্রপ্রভাও উদ্যানে নেমে এলো। শবরী দেহ-রক্ষীদের সঙ্গে লক্ষ্যভেদ ক্রীড়ায় নিজেও মেতে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মনের মধ্যে তবু একটি কথাই বারংবার ঘুরে বেড়ায়।

ক্লান্তদেহে উদ্যানের খেলা সাঙ্গ করে ফিরে এলো চন্দ্রপ্রভা, হাতে তীর-ধনুক। কিন্তু শয্যাকক্ষে প্রবেশ করার পূর্বেই দূরের অলিন্দে থমকে দাঁড়ালো।

দেখলে, সুরঞ্জাক্ষী অদূরে অপেক্ষা করছে, আর রঘুনাথ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শয্যায় জাগ্রত গোপালের দিকে। কিশোর গোপালও সহাস্যমুখে তাকিয়ে আছে রঘুনাথের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রঘুনাথের দিকে হঠাৎ দু'টি হাত বাড়ালো গোপাল।

রঘুনাথের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিলো। গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ভুল বুঝতে পেরেছে রঘুনাথ।

এ কি করতে চলেছে সে! এমন দেবতুল্য ভ্রাতাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে উপপত্নীর সন্তানকে উত্তরাধিকার দিতে চলেছে?

অনুশোচনা দেখা দিলো রঘুনাথের মনে।

বললে, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সুরঞ্জাক্ষী! চন্দ্রপ্রভার ওপর, অনুজের ওপর যে অবিচার করেছি তার কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই?

ভুল, ভুল।

দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো রঘুনাথ, গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরার আগ্রহে। আর আশঙ্কায় শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা বুঝলো না। দূর থেকে রঘুনাথকে লক্ষ্য করতে করতে শিউরে উঠলো, ভাবলে, দু'হাতে কণ্ঠরোধ করে গোপালকে হত্যা করতে চলেছে রঘুনাথ।

সেই মুহূর্তেই লক্ষ্যস্থির করে তীর ছুঁড়লো চন্দ্রপ্রভা।

বিষাক্ত তীর এসে বিঁধলো রঘুনাথের বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লো রঘুনাথ।

ছুটে এলো চন্দ্রপ্রভা।

বিষের যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতে করতে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে, চন্দ্রা, তুমি! তুমি হত্যা করলে আমাকে?

বিচিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চন্দ্রপ্রভার মুখ। বললে, যে ভ্রাতা সহোদরের জীবননাশ করতে উদ্যত হয় তাকে হত্যা করা পাপ নয়।

অস্ফুটে কি যেন বলতে গিয়ে বিষের যন্ত্রণায় নিশ্চুপ হলো রঘুনাথের কণ্ঠ।

সুরঞ্জাক্ষীর চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিলো।

বললে, ভুল করেছো চন্দ্রা, ভুল। রাজা রঘুনাথ ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন তোমার কাছে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপন সহোদর গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিলেন।

বিস্ময়ের চোখে উদাসভাবে সুরঞ্জাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো।

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠে চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

বত্রিশ

বার্তা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।

ধর্মের জন্য পতিঘাতিনী হয়েছে চন্দ্রপ্রভা, প্রজার স্বার্থের জন্য আপন হাতে মুছে ফেলেছে তার সীমন্তের সিঁদুর। ধর্ম রক্ষা পেয়েছে, রাজ্য রক্ষা পেয়েছে রাজা রঘুনাথের অনাচারের হাত থেকে।

উল্লাসের ধ্বনি তুলে ছুটে এলো বিষ্ণুপুর অধিবাসীরা। ভিড় করে এলো। রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশে জয়ধ্বনি উঠলো রানী চন্দ্রপ্রভার।

জনতার আনন্দের উন্মত্ত চিৎকারে চন্দ্রপ্রভার দর্শন পাবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো।

দর্শন-গবাক্ষে অশ্রুসিক্ত চোখে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা।

প্রত্যূষে রাজদর্শন অতীব শুভকর বলেই প্রজারা ভিড় করে আসতো এই দর্শন-ঝরোকার নীচে। বীর হাম্বীর আর রানী সুদক্ষিণা, বীর সিংহ আর রানী শিরোমণি, দুর্জন সিংহ আর তাঁর পত্নী প্রতিদিন এসে দাঁড়াতো এই গবাক্ষে, এসে দাঁড়াতো রাজা রঘুনাথ আর রানী চন্দ্রপ্রভা। রাজদর্শন লাভ করে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যেতো প্রজারা।

কিন্তু এই প্রাচীন রীতিকেও বিনষ্ট করেছিলো রঘুনাথ। লালবাঈয়ের প্রমোদভবনে সুরার নেশায় ডুবে থেকে ভুলে গিয়েছিলো কতো আন্তরিক আগ্রহে প্রজার দল এসে ভিড় করে রাজদর্শনের লোভে!

বহুদিন পরে আজ আবার নতুন করে দর্শন-গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা, সঙ্গে গোপাল।

চন্দ্রপ্রভার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে, গোপালের মুখ-চন্দ্রিমায় মুগ্ধ হয়ে হিংস্র উত্তেজনায় লালবাঈয়ের মৃত্যুকামনা করে

চিৎকার করে উঠলো জনতা। পরমুহূর্তে হাতের সড়কি, বর্শা, বিষাক্ত তীর আর ধনুক তুলে ধরে ছুটে গেলো তারা লালবাঁধের দিকে। লালবাঈয়ের অট্টালিকা নূতন মহলের দিকে।

লালবাঁধের নামকরণ সার্থক করে তুলতে চায় তারা। লালবাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে চায় লালবাঁধের স্ফটিকস্বচ্ছ জল।

আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো লালবাঈ।

রাজা রঘুনাথকে হত্যা করেছে রানী চন্দ্রপ্রভা—এ খবর শুনে লালবাঈ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

মণিবানু ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো, উন্মত্ত আক্রোশে জনতা ছুটে আসছে লালবাঈকে হত্যা করবার জন্যে, লালবাঁধের জলধারা লালবাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে।

আপন শিশুকে হু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো লালবাঈ। ভয়ে কেঁপে উঠলো উচ্ছৃঙ্খল জনতার হিংস্র উত্তেজনার দিকে তাকিয়ে।

তার বিমূঢ় বিভ্রান্ত চোখের সামনে যেন পথ নেই, উপায় নেই।

তবু বাঁচতে চায় লালবাঈ, বাঁচাতে চায় তার আপন সন্তানকে।

হঠাৎ যেন ভরসার স্থল খুঁজে পেলো লালী।

রিসাল্‌হা সৈন্যদের বিদায় দিয়ে রাজ-অতিথিশালায় অপেক্ষা করছে সুলেমান খাঁ। দরবারের কাছে বিদায় নেবার জন্যে।

বিষ্ণুপুরের গৃহবিদ্রোহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায়নি সুলেমান। কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে রঘুনাথের মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছবে কল্পনাও করেনি।

সুলেমান দেখতে পেলো সমগ্র জনতা ছুটে আসছে লালবাঈয়ের প্রমোদভবনের দিকে।

জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিলো লালবাঈ। বিবিবাজারের একশো মোহর কিম্মতের এই বাঁদীকে বেগম করার দুঃস্বপ্নে সারা জীবন ছুটে বেরিয়েছে হাবশী সুলেমান। প্রতিবারেই লালবাঈয়ের চোখে দেখেছে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

কাঞ্চনী লালবাঈয়ের প্রেম চেয়েছে সুলেমান। ভালোবাসতে চেয়েছে তাকে। পরিবর্তে উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লালবাঈ। ভালোবাসা নয়, তার দেহরূপ উপঢৌকন দিতে চেয়েছে চক্রান্তের বিনিময়ে। তাই সারাজীবনের অন্ধ কামনায় যাকে স্বপ্ন দেখেছিলো সুলেমান, তাকেই ঘৃণা করেছে সে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসে।

চন্দ্রপ্রভার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই রাজা রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে সে। বলেছে, অবিশ্বাসিনী এই তুচ্ছ তয়ফার হাত থেকে নিজেকে বাঁচান রাজাবাহাদুর। রাজ্য রক্ষা করুন।

আর লালবাঈয়ের চক্রান্তের কথা শুনে চমকে উঠেছে রঘুনাথ। জীবনের সব ভুল ভেঙে গেছে তার। তাই ছুটে গেছে সে চন্দ্রপ্রভার কাছে। তার শেষ সান্ত্বনার কাছে।

সে-কথা ভাবতে ভাবতেই অতিথিশালার ঝরোকায় এসে দাঁড়ালো সুলেমান। সশস্ত্র জনতার আক্রোশধ্বনি শুনে হঠাৎ উল্লাসে সশব্দে হেসে উঠলো। মসিকৃষ্ণ দৈত্য-চেহারার হাবশী সুলেমান খুশীতে হেসে উঠলো সাদা সাদা দাঁত বের করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যথায় ম্লান হয়ে গেলো তার সারা মুখ। একি বিশ্বাসঘাতকতা, একি অন্যায় করেছে সে। একটি অবলা নারীকে কেন সে নৃশংস জল্লাদের মতো হত্যা করতে চলেছে। সুলেমান বুঝতে পারলো, চন্দ্রপ্রভার কাছে চক্রান্তের আভাস দিয়ে এসেছে বলেই লালবাঈকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসছে জনতা। গোপন বিশ্বাসে যে তার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো তাকেই এভাবে যূপকাষ্ঠে তুলে দিলো সুলেমান? অনুশোচনায় দগ্ধ হলো হাবশী সুলেমানের মন। চন্দ্রপ্রভাকে বাঁচাতে চেয়েছে সে, বাঁচাতে চেয়েছে বিষ্ণুপুর রাজ্যকে।

কিন্তু লালবাঈয়ের মৃত্যু তো সে চায়নি। কোনো প্রতিহিংসার আগুন আজ আর তার বুকে জ্বলছে না। তবে? পদধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়ালো সে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো লালবাঈয়ের দিকে।

যাকে আজীবন ঘৃণা করেছে লালবাঈ, যে তার চক্রান্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রেখে তার রূপযৌবনকে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে, বেদনার অশ্রুসিক্ত চোখে তারই কাছে আজ সে ছুটে এসেছে শেষ ভরসাস্থল ভেবে।

হাবশী সুলেমান একদিন লালবাঈকে ইনাম চেয়ে তাকে অপমানিত করেছিলো রহিম খাঁর জলসামহলে। আর সেই অপমানের প্রতিশোধ চেয়ে লালবাঈ কোতল করতে চেয়েছিলো হাবশী সুলেমানকে।

যার জীবন নিতে চেয়েছিলো একদিন রহিম খাঁর আসরে, তারই কাছে জীবন ফিরে পাবার আগ্রহে ছুটে এসেছে লালবাঈ।

দু'হাতে শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে লালবাঈ কান্নার স্বরে ভেঙে পড়লো। কথা নয়, শুধু দৃষ্টি দিয়েই যেন জীবন ভিক্ষা চাইলে।

মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেলো হাবশী সুলেমানের মনের গভীরে। দু'টি মসিকৃষ্ণ সবল হাত বাড়িয়ে লালবাঈয়ের সন্তানকে কোলে তুলে নিলো সুলেমান।

বললে, ভয় নেই, ভয় নেই লালবাঈ। নিজের জীবন দিয়েও তোমাকে রক্ষা করবো।

দ্রুত নেমে এলো সুলেমান, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলো। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সুলেমানের বিস্তৃত পিঠের আড়ালে ভয়ে মুখ লুকালো লালবাঈ।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো সুলেমান।

কিন্তু তার আগেই খবর পৌঁছে গেলো জনতার কাছে।

দামামার সঙ্কেত বেজে উঠলো। নগরদ্বার সিংহদরজা বন্ধ হয়ে গেলো সুলেমানের ঘোড়ার সামনে। জনতা ছুটে এলো পলাতকা লালবাঈয়ের দিকে!

তলোয়ার উঁচিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সুলেমান। জীবন থাকতে লালবাঈয়ের অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না সে জনতাকে।

কিন্তু তীরের বিরুদ্ধে তরবারি অসহায়।

ঝাঁক ঝাঁক বিষাক্ত তীর এসে পড়ে চতুষ্পার্শ্বে। বুক দিয়ে লালবাঈকে রক্ষা করতে চায় সুলেমান।

হঠাৎ একটি তীর এসে বিঁধলো সুলেমানের বুকে।

লালবাঈয়ের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ দিলো সুলেমান। রক্তাক্ত একটি অসুরের শরীর লুটিয়ে পড়লো রূপময়ী লালবাঈয়ের পায়ের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষাচার্য ইশারায় তীর ছুঁড়তে নিষেধ করলেন জনতাকে। এভাবে দ্রুত মৃত্যুর আশীর্বাদ দিতে চান না তিনি কাঞ্চনীকে। তিল তিল করে যেভাবে দুঃখ দারিদ্র্য অনাচার অত্যাচারে বিষ্ণুপুরকে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছিলো লালবাঈ, তেমনি তিল তিল করেই মৃত্যু বরণ করতে হবে তাকে।

তবু শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে রইলো কাঞ্চনী। তার প্রাণ না নিয়ে তার সন্তানের প্রাণ নিতে পারবে না কেউ। কিন্তু লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হলো লালবাঈ। জনতার আক্রমণে তার বুকের শিশুপুত্র ছিটকে পড়লো মাটিতে।

লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন জ্যোতিষাচার্য।

প্রজার রক্ত শোষণ করে তৈরী হয়েছে এই লালবাঁধ, এক কাঞ্চনীর নৌবিলাসের ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে আজীবন দারিদ্র্য-অনাহার-মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে শত শত অধিবাসীকে। ঘাতকের অস্ত্র নয়, তিল তিল করে যেভাবে বন-বিষ্ণুপুর অত্যাচারিত হয়েছে লালবাঈয়ের অদম্য উচ্চাশা আর রাজসিক বিলাসব্যসন চরিতার্থ করে, তেমনি তিল তিল করে দুঃসহ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হবে লালবাঈকে।

যে সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীতে রঘুনাথের সঙ্গে নৌকাবিহারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতো লালবাঈয়ের, সেই সুখস্মৃতি বিজড়িত ময়ূরপঙ্খীতে নিয়ে যাওয়া হলো বন্দিনী লালবাঈকে।

সন্তানের জন্যেই একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ চেয়েছিলো লালবাঈ। নিঃসন্তান নয় রঘুনাথ, তার সন্তানই রঘুনাথের সন্তান। তবু তাকে বঞ্চিত করে কেন গোপাল সিংহাসন পাবে বুঝতে পারে না সে। এ কেমন যুক্তি! একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহই কি পরম সত্য? শুধু ধর্ম? জীবনের সত্য কি প্রকৃত সত্য নয়?

লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা রূপময়ী যবনীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। অদূরে মাটিতে লুটিয়ে পড়া শিশু সন্তানকে দেখে, শিশু সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিতে চাইলো লালবাঈ। তার আকুল কান্না দেখে হেসে উঠলো কয়েকজন প্রজা।

জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো গরবিনীর লাঞ্ছনায়।

ধীরে ধীরে ময়ূরপঙ্খী এসে থামলো লালবাঁধের মাঝ দরিয়ায়।

পাটাতনের নির্দিষ্ট ছিদ্র খুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ আক্রোশে যেন লালবাঁধের জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়লো লালবাঈয়ের দিকে।

শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো লালবাঈ। অনুনয়ের কাতরোক্তি ভেসে এলো—আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও মাথা পেতে নেবো। নিরপরাধ ঐ শিশুকে বাঁচাও।

কেউ কর্ণপাত করলো না তার অনুরোধে। সহানুভূতি দেখালো না কেউ।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নিমজ্জমান বজরা ত্যাগ করে চলে গেলো তারা।

জ্যোতিষাচার্য তখনও দাঁড়িয়ে আছেন পথের একপাশে। সস্নেহে তুলে নিলেন তিনি লালবাঈয়ের সন্তানকে। স্থিরদৃষ্টিতে রোরুদ্যমান শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুঃখে ব্যথায় সমবেদনায় মুখের ভাব বদলে গেলো তাঁর। দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু

নামলো। মাতার অপরাধে শিশুকে শাস্তি দিতে চান না তিনি। যে যবনকন্যার প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণা, যাকে স্পর্শ করলেও ধর্মচ্যুত হবার ভয় করেন, তারই শিশু সন্তানকে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন তিনি।

ওদিকে ধীরে ধীরে লালবাঁধের গভীরতায় ডুবে গেলো শৃঙ্খলিত লালবাঈয়ের যৌবন রূপ, তার উদ্ধত কামনা, বিষাক্ত বিলাস।

অদৃশ্য হলো বহুমূল্য ময়ূরপঙ্খী। লালবাঁধের অতলে তলিয়ে গেলো একটি অসামান্যা নারীর দেহ। এক অতি সামান্যা নারীর অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

তেত্রিশ

নৃশংস উল্লাসে আত্মহারা জনতা ফিরে এলো দরবারভবনে!

শান্তি-স্তোত্র গাইলেন সভাপণ্ডিত—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

সর্বভূতই যখন আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?

রঘুনাথের মৃত্যুশোক আর ধর্মরক্ষার আনন্দ—হু'টি অনুভূতির সমন্বয়ে সমাহিত হবার জন্যে জনতাকে উপদেশ দিলেন সভাপণ্ডিত।

নিষ্কণ্টক হয়েছে বিষ্ণুপুর, শান্তি ফিরে পেয়েছে। শূন্য সিংহাসনে বসাতে হবে রঘুনাথ-অনুজ গোপাল সিংহকে। তৈরি হতে হবে অভিষেক উৎসবের জন্যে।

তাই তৎপর হয়ে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, কিশোর গোপাল সিংহের আড়ালে থেকে শাসনকার্য চালাবেন রানী চন্দ্রপ্রভা—যিনি বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছেন যবনাচারের হাত থেকে।

দেওয়ানজী এবং অমাত্যের দল সম্মতি জানালেন জোতিষাচার্যের অভিমত শুনে। উল্লসিত হলো প্রজাবর্গ।

অভিষেকের সুর বেজে উঠলো নহবতখানায়।

প্রজারা ছুটে গেলো রাজপ্রাসাদে রানী চন্দ্রপ্রভার কাছে, শুভ সংবাদ জানিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে।

কিন্তু প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে চিৎকার থেমে গেলো তাদের।

হরিনাম-সংকীর্তনে আকাশ বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

শ্যামবাঁধের পাড়ের শ্মশানভূমিতে রঘুনাথের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এলো প্রজারা। পিছনে পিছনে সম্রাজ্ঞীর রত্নভূষণে

অলঙ্কৃতা চন্দ্রপ্রভা। চোখের কোণে অশ্রু নেই, অনুশোচনার চিহ্ন নেই মুখে।

চন্দন কাঠে চিতা সাজানো হলো। জরিয়া দাসীর দল সুগন্ধি আতর অগুরু অঙ্গরাগ ঢেলে দিলো চন্দনের শয্যায়।

ক্রমে ক্রমে মৃদু মধুর তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো চন্দ্রপ্রভার মুখে। সম্রাজ্ঞীর বসনভূষণে সজ্জিতা রানী চন্দ্রপ্রভা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা রানী চন্দ্রপ্রভা। সীমন্তে সিন্দূর, হাতে শঙ্খবলয়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেশমবস্ত্রের ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখচন্দ্রমায় হঠাৎ যেন তৃপ্তির হাসি দেখা দিলো।

সুরঞ্জাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে অপাঙ্গের ইশারায় হাতছানি দিলো চন্দ্রপ্রভা।

গোপালকে চুম্বন করে সুরঞ্জাক্ষীর হাতে তুলে দিলো তাকে। বললে, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম সখী।

দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো সুরঞ্জাক্ষীর। বললে, কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে যেতে চাই চন্দ্রপ্রভা!

—না না, তা হয় না সুরঞ্জাক্ষী। বাধা দিয়ে উঠলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রঘুনাথের চিতাশয্যার সামনে।

ভিড় ভেঙে পড়লো শ্মশানভূমিতে। মুহূর্তের মধ্যে খবর রটে গেলো চতুর্দিকে। বালবৃদ্ধবনিতার দল ছুটে এলো এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার লোভে।

সতী হবে চন্দ্রপ্রভা। সহমৃতা হবে পতিঘাতিনী এক নারী।

সতীদাহ নয়, সহমরণ নয়। জন্মজন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পতি আর পত্নীর পুনর্বিবাহ যেন। তাই নববধূর বেশে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে চন্দ্রপ্রভা, মুখে টেনেছে লাজনম্র তৃপ্তির আবেশ।

জ্যোতিষাচার্য বাধা দিতে এগিয়ে এলেন।—এ কি ভুল করতে

চলেছো মা! বিষ্ণুপুরের শাসনভার হাতে নিতে হবে তোমাকে, মানুষ করে তুলতে হবে তোমার গোপালকে।

হাসলো চন্দ্রপ্রভা। বললে, আপনারা তো রইলেন গুরুদেব, সে ভার আপনাদের ওপরই দিয়ে গেলাম।

বিস্ময়ে নিশ্চুপ হলেন জ্যোতিষাচার্য, নিশ্চুপ হলেন সভাপণ্ডিত আর দেওয়ানজী। যে নারী নিজের হাতে পতি-হত্যা করতে পারে, স্বেচ্ছায় সে এগিয়ে যেতে পারে স্বামীর চিতায়?

বোঝাবার চেষ্টা করলো প্রজারা, দাসদাসীর দল।

তবু সঙ্কল্পে দৃঢ় চন্দ্রপ্রভা। কৌতুকের হাসিতে যেন স্তব্ধ করে দিতে চায় সব অনুরোধ, সব বাধা-নিষেধ।

হরিদ্রা চন্দনের প্রলেপ দিলো চন্দ্রপ্রভা নিজের কপালে। মন্ত্রপাঠ করতে করতে চক্র দিতে শুরু করলে রঘুনাথের চিতার চতুষ্পার্শে। দু'হাতের ধীর স্থির মুষ্টিতে ফুলমালা।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করে চন্দ্রপ্রভা—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হোক। হে চিন্তাশীল মন, তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় স্মরণ করো।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥

হে অগ্নি, তুমি আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। হে দেব, তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জানো। আমাদের পাপ বিদূরণ করো। তোমাকে নমস্কার।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

মন্ত্রপাঠ শেষ করে ধীরে ধীরে করধৃত ফুলমালা রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর যজ্ঞকুণ্ডে ফিরে এলো।

যজ্ঞপুরোহিতের হাত থেকে আম্রশাখা নিয়ে দৃঢ় সংযত পায়ে চিতায় আরোহণ করলো চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথের মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় শয়ন করলো সহাস্য মুখে।

যজ্ঞপুরোহিতের নির্দেশে অগ্নি সংযোগ করা হলো। চন্দনকাঠের চিতাশয্যা দাউ দাউ করে শত শিখায় জ্বলে উঠলো। উচ্চনিনাদে বেজে উঠলো সতীশঙ্খ, বাদ্যধ্বনি হলো চতুর্দিকে।

চন্দ্রপ্রভার প্রিয় জরিয়া দাসীর দল পরস্পরের হাত ধরে চিতার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি পরিক্রমা শুরু করলো নৃত্যের তালে তালে।

ঘৃত হরিদ্রা চন্দন আহুতি দিলো প্রজারা। লেলিহান শিখার আগুনে নিষ্প্রভ হয়ে গেলো রূপবতী চন্দ্রপ্রভার হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো কিশোর গোপাল।

অনিমেষ দৃষ্টিতে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সুরঞ্জাক্ষী।

তার শরীরেও যেন এক বিচিত্র উন্মাদনা জেগে উঠেছে। আজ আর বুঝি সুরঞ্জাক্ষীর জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কর্তব্য নেই কোনো। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো সুরঞ্জাক্ষী। অন্য এক দাসীর কোলে গোপালকে রেখে অকস্মাৎ সে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে গেলো।

চিৎকার হট্টগোল করে উঠলো বিভ্রান্ত জনতা। সুরঞ্জাক্ষীকে বাধা দিলো তারা।

সুরঞ্জাক্ষী নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে, ভস্মীভূত হলো চন্দ্রপ্রভার জীবন্ত দেহ, ভস্মীভূত হলো পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভার যৌবনশরীর।

যজ্ঞপুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে তখনও বেজে চলেছে :

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

উপসংহার

মুঠো মুঠো করে সেদিন সতীকুণ্ডের ছাই নিয়ে গিয়েছিলো পুরাঙ্গনার দল। পতিঘাতিনী সতীর ভস্মাবশেষ দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কোথাও তা রূপ নিয়েছিলো দেববিগ্রহের, কোথাও বা ধর্মঠাকুর হয়ে বেঁচে আছে তা আজও।

কে জানে, বহু অতীতে হয়তো এমনই কোনো গরীয়সী সতীর ভস্মাবশেষই ছড়িয়ে পড়েছিলো ভারতের দিকে দিকে, দক্ষকন্যা সতীর পীঠস্থান হয়ে তা আজও বেঁচে আছে। ভক্তের কল্পনা এমনই কোনো পতিপ্রাণা নারীকে গড়ে তুলেছে দেবীর মহিমায়।

শ্যামবাঁধের জোয়ার-জলে, বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সেই সতীকুণ্ডের চিতাবশেষ। কিন্তু মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে তার স্মৃতি।

বহু বছর পরে একদিন বুঝি কৃষ্ণমোহনের বজরাও এসে থেমেছিলো বন-বিষ্ণুপুরের বিড়াই নদীর ঘাটে। সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধির গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছিলো কৃষ্ণমোহন।

এই সতীকুণ্ডের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেই গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষকান্তি। আকাশে ছিলো জ্যোৎস্নার প্লাবন, শ্যামবাঁধের নিথর কালো জলে চাঁদের ছায়া।

আর কৃষ্ণমোহনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো এক রহস্যময়ী। কণ্ঠে তার সুমধুর সঙ্গীত, হৃদয়ে উজ্জ্বল সাধনা।

তার মুখের দিকে বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিলো কৃষ্ণমোহন।

প্রশ্ন করেছিলো, কে তুমি ?

—আপনার শিষ্যা, সঙ্গীতগুরু। উত্তর দিয়েছিলো সেই ছায়াশরীর।

—তোমার ধর্ম ?

—সঙ্গীত।

মৃদুহাস্যে কৃষ্ণমোহন বলেছিলো, না শিষ্যা, সঙ্গীত নয়। রাগ-রাগিণী শুধুই পথ দেখায়। ধর্ম এক, ধর্ম মানবতা—প্রেম প্রীতি অনুরাগ।

তারপর উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলো ঃ

মূঢ়ানামেষ ভবতি ক্রোধা জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥

হায় মূঢ়, যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে তার শরীরে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ নেই। কেউ কাউকে হত্যা করে না, হিংসা করে না অন্যকে। সকলেই কৃতকর্ম ভোগ করে চলেছে।

কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেক মানুষের মন। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ অকারণ জন্ম নেয়নি, আর হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষও অকারণ নয়। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে ভেদবিভেদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আগুন ছড়িয়েছে চতুর্দিকে, বঞ্চিতা নারী সম্মান খুঁজেছে ধর্মের আড়ালে, বিধর্মীর অন্যায়কে মানুষ বিচার করেছে সমাজনীতির নিয়মে নয়, ধর্মের যূপকাষ্ঠে।

ধর্ম নেই ধনীর, দরিদ্রের ধর্ম শুধুই ন্যায়বোধ। মোগল শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, অজ্ঞানতা তাকে পরিণত করেছিলো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষে। মুসলমান প্রজা পরিণত হয়েছিলো মোগল শাসকের ক্রীড়নকে।

ভুল বুঝেছে মানুষ। ভুলে গেছে, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম।

রঘুনাথ বুঝি সে-সত্য দেখতে পেয়েছিলো। সমাজের সঙ্কীর্ণতা তুচ্ছ করে তাই সঙ্গীতকেই সাধনা করেছিলো সে। সঙ্গীতের জন্যই লালবাঈকে ভালোবেসেছিলো রঘুনাথ, তারপর একদিন লালবাঈয়ের মোহেই ডুবে রইলো, ভুলে গেলো সঙ্গীতকে। সন্ন্যাসী যেমন গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালোবাসে, সমাজ যেমন মানুষকে ভুলে আঁকড়ে ধরে ধর্মকে, প্রেম যেমন অনুরাগকে ভুলে যায় ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণে।

আর চন্দ্রপ্রভা? নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ রেখে গেছে, ত্যাগের মহিমার জন্যে ত্যাগ নয়, বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে যে ত্যাগ তার মূল্য আছে মানুষের সমাজে। উপায়হীনের আত্মত্যাগ সেও চরম স্বার্থপরতা!

সতীকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণমোহন বললে, রঘুনাথ ভুল করেছিলেন, আর এই ভুলটাই হয়তো বেঁচে থাকবে মানুষের মনে। কিন্তু ভগীরথের মতোই যে গঙ্গাকে তিনি ডেকে এনেছেন বাংলার মাটিতে, একদিন এই গঙ্গার স্রোতধারায় সারা ভারতের পাপ ধুয়ে যাবে। নতুন করে বেঁচে উঠবে ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলাকে গৌরবান্বিত করবে বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা। আর এই ঐতিহ্যময় বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব গীতধারা। যা শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর মনে জাগিয়ে তুলবে উপনিষদের আলো আর পদাবলীর প্রেমমাধুর্য।

রহস্যময়ী বললে, কে আনবে সেই সার্থকতা, কার প্রতিভা সফল করে তুলবে রঘুনাথের ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সার্থক সাধনাকে?

হাসলো কৃষ্ণমোহন। বললে, সাফল্য তো একজনের কৃতিত্ব নয়, সে যতো বড় প্রতিভাই হোক। প্রত্যেকটি সিদ্ধির পিছনে আছে যুগযুগসঞ্চিত বহু সাধকের কর্মফল। এক দীপ থেকে আরেক দীপে আলোকসঞ্চার হয়। এক প্রতিভার হাত থেকে আরেক প্রতিভা

সেই যোগসূত্র তুলে নেয়। তেমনি এক প্রতিভাকেই খুঁজে চলেছি সারা জীবন, সেই সাধনা গ্রহণ করার যোগ্য প্রতিভাকেই খুঁজে চলেছি।

ইতিহাস সেই প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছে।

সার্থক হয়েছিলো কৃষ্ণমোহনের অনুসন্ধান, সার্থক হয়েছিলো রঘুনাথের সঙ্গীত সাধনার আদর্শ।

বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার জন্মকাহিনী জানতে হলে ফিরে যেতে হয় সেই অজ্ঞাত অধ্যায়ে। তানসেন-বংশধর বাহাদুর খাঁর তানের ঝলক গদাধর চক্রবর্তীর মনে সঙ্গীতের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। গদাধর চক্রবর্তীর দীপ থেকে সঙ্গীতের আলোক জ্বালিয়ে নিয়েছিলো কৃষ্ণমোহন, কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর দীপশিখা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিভায়। কবি রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সাধনায় গৌরবান্বিত হয়েছিলো বাংলার সঙ্গীত।

বিষ্ণুপুর রাজ্যের সভাপণ্ডিত দেশবিখ্যাত শাস্ত্রবিশারদ্। তাঁরই পুত্র রামশঙ্কর একদিন সঙ্গীতকে শতহস্ত দূরে রেখে চলেছিলো। আর ধর্মকর্ম ভুলে গানের আবেগে ডুবে ছিলো গীতরসিক কৃষ্ণমোহন।

সেদিন রামশঙ্কর ভেবেছে, সঙ্গীত জীবনের বিঘ্ন শুধু, নেশার ঘোরে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখাই তার কাজ। তাই, গানকে ঘৃণার চোখে দেখেছে রামশঙ্কর। নিজেকে সংযত রেখেছে শুধু পুঁথিপত্রের আবেষ্টনে, একাগ্র মনে শুধুই দিন কাটিয়েছে নীরস শাস্ত্রপাঠে, তত্ত্বের তর্কে।

তারপর একদিন শাস্ত্রালোচনার জন্যেই রাজদরবারে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে তার। পুঁথিপত্রেই পেয়েছে আনন্দ, কোনোদিন সঙ্গীতের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তার সমগ্র মনের পটে আলোড়ন দেখা

দিলো। গভীর নিশীথে রাজসভার অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ফিরে চলেছিলো রামশঙ্কর। পরজন্ম, মনুর অনুশাসন, দেবতার অস্তিত্ব—নানান অমীমাংসিত প্রশ্নের রহস্যচিন্তায় মন ডুবে ছিলো। নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রিতে ফিরে চলেছিলো রামশঙ্কর। তারপর কালিন্দী বাঁধের কালোজলের পাড়ে হঠাৎ কখন নিজেরই অজান্তে থেমে পড়তে হলো।

রাজপ্রাসাদ থেকে তখন একটি করুণ সুর ভেসে আসছে। বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রাসাদ গবাক্ষের দিকে উৎসুক দু'টি চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো রামশঙ্কর। হৃদয় মন্থন করে যেন একটি নৈসর্গিক সুরের প্রবাহ এসে রামশঙ্করের প্রতিটি রোমকূপে এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেলো। নিস্পলক চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইলো রামশঙ্কর। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা উন্মুখ আগ্রহে এক অজানা রোমাঞ্চের আস্বাদ নিলো সেই প্রথম।

সঙ্গীতের মূর্ছনায় যেন সেই অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান পেলো রামশঙ্কর, খুঁজে পেলো তার নিরুদ্দেশ আত্মাকে। দুঃসহ সাধনার মধ্য দিয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির যে কল্পনাতীত মাধুর্যের স্বপ্ন দেখে এসেছে সে, সঙ্গীতের মধ্যে সেই অপার্থিব পুলকের আস্বাদ পেলো। ঈশ্বর নয়, রামশঙ্কর বুঝলো, পৃথিবী ভুলিয়ে, জাগতিক সব সুখদুঃখের ওপরে যে মুক্ত হৃদয়ের মূক বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে থাকে, তাকে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র সঙ্গীত। মানুষকে মহৎ করে তুলতে পারে! সব ক্ষুদ্রতা নীচতা ভেদবিভেদের উর্ধ্বে পৌঁছে দিতে পারে মানুষের মনকে।

শাস্ত্রচর্চা ভুলে গেলো রামশঙ্কর। অনুশোচনা হলো, এতোদিন সঙ্গীতপ্রিয়তাকে অর্থহীন আলস্য মনে করেছিলো বলে।

ধীরে ধীরে একদিন কৃষ্ণমোহনের নির্জন সঙ্গীতকক্ষে এসে ঢুকলো রামশঙ্কর, ভীত লজ্জিত পায়ে।

নিতান্ত ঔৎসুক্যের বশেই গোপনে কৃষ্ণমোহনের তানপুরা তুলে নিয়েছিলো সে, অনভিজ্ঞ হাতে তানপুরার তারে সুরের রেশ তুলেছিলো।

কৃষ্ণমোহন সে-শব্দ শুনে ছুটে এসেছিলো সেদিন, বিস্মিত চোখ চেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলো রামশঙ্করকে।

কৃষ্ণমোহনের জীবনের খেদ মিটে গিয়েছিলো সেদিন, মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলো।—আমি জানতাম রামশঙ্কর, আমি জানতাম। আর কোনো দুঃখ নেই আমার, সঙ্গীত তার শত্রুকে জয় করেছে। সঙ্গীতকে কোনো মর্যাদাই দাওনি রামশঙ্কর, কিন্তু তোমার কণ্ঠে একদিন বাংলার সঙ্গীত মর্যাদা ফিরে পাবে।

ঠিক এই কথাই একদিন কৃষ্ণমোহনকে বলেছিলেন রঘুনাথ, বলেছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। সেদিনের সে-দৃশ্য মনের পটে ভেসে ওঠে, অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণমোহনের দু'চোখ।

কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, সুরকে আয়ত্তে আনাই তোমার একমাত্র আদর্শ নয় রামশঙ্কর। বিষ্ণুপুর তোমার মুখ চেয়ে আছে, সারা ভারতবর্ষ তোমার কাছে এক নতুন ঘরোয়ানা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

সেদিন থেকেই নতুন এক জীবন শুরু হলো রামশঙ্করের।

এক নতুন আদর্শ খুঁজে পেয়েছে রামশঙ্কর, হদিস পেয়েছে সাধনার, সিদ্ধির! স্বার্থপরের মতো ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা নয়, নিজের আত্মার মুক্তি নয়। সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে যায় রামশঙ্কর। অর্জন নয়, বিসর্জন। নিজের উপলব্ধিকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ব্রত।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে যায় সঙ্গীত সাধনায়।

কৃষ্ণমোহনের উৎসাহ পেয়ে মৃদু মৃদু লজ্জার হাসি হাসে রামশঙ্কর, কুণ্ঠিত স্বরে ধীরে ধীরে বলে, একটি নতুন গীত রচনা করেছি আচার্য।

—শোনাও কবি রামশঙ্কর, শোনাও তোমার গান। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠে গুরু কৃষ্ণমোহন।

গান শুরু করে রামশঙ্কর। ধ্রুপদের পদ গুনগুন করে—মাতঃ স্থরেশি ত্রিপথগামিনী ভব-ভয়-হারিণী-গঙ্গে। ত্রিদশ-বন্দিনী অঘনাশিনী পতিতপাবনী ভীষ্মজননী, হের পতিত অপাঙ্গে॥

ভৈরব চৌতাল, বাহার গীতাঙ্গী, রাজবিজয় তেওরা, ভূপালী ব্রহ্মতাল, সরফর্দা ঝাঁফতাল, ইমন আড়াঠেকা, শঙ্করাভরণ চৌতাল—গানের পর গান রচনা করে রামশঙ্কর, তালিম দেয় কৃষ্ণমোহনের সামনে।

সাবাস দিয়ে ওঠে আচার্য কৃষ্ণমোহন। বলে, আর আমি আচার্য নই রামশঙ্কর, তুমিই এখন বিষ্ণুপুর-সঙ্গীতের আচার্য হয়ে গিয়েছো।

সত্যই সফল হয়েছিলো কৃষ্ণমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী।

পৃথিবীর মাটি থেকে তখন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, চলে গেছেন গদাধর চক্রবর্তী। কৃষ্ণমোহনও একদিন চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁদের সাধনার সূত্র হারিয়ে গেলো না। প্রদীপের শিখা অম্লান রইলো চিরতরে। কৃষ্ণমোহনের তানপুরার তারে নতুন গৎ ফুটে উঠলো রামশঙ্করের অঙ্গুলিস্পর্শে।

বাংলা দেশকে এক নিজস্ব ঘরোয়ানার অধিকারী করে গেলেন রামশঙ্কর। কবি রামশঙ্কর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে উত্তর ভারতীয় ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, দিয়ে গেলেন বাংলার আপন ভাষার স্থরমাধুর্য।

আজও বুঝি সঙ্গীত-মহলের আশেপাশে রামশঙ্করের স্থর ভাসে ঃ 'তারিণী-তনয়-ত্রাসে কম্পিত কলেবর...'

রামশঙ্করের স্বরচিত ধ্রুপদ-গাম্ভীর্যে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।— কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেষ, বৃন্দা বিপিন পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ। মাধব মুকুন্দ মধু মথন যজ্ঞেশ, রাধিকা-রমণ রসরাজ নটবেশ॥

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে বঙ্গভাষার বন্ধনে বন্দী করে ভবিষ্যতের বঙ্গবাসীকে নতুন এক সম্পদ দিয়ে গেলেন রামশঙ্কর।—'নন্দ-সুত নীল-নলিনাভ ভুবনেশ। কেশী-মুর কংসহা যাদব মহেশ। তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ, রামশঙ্কর সুদীনে কুরু কৃপালেশ॥

যুগের পর যুগ কেটে গেছে। সঙ্গীতের সুর তবু কাটেনি।

এদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতো না উত্থান-পতন।

মৃত্যু হলো দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের। দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন সম্রাট ফেরোকসায়ের। বিবাহ স্থির হলো তাঁর রাজসিংহ-কন্যা রাজপুতনন্দিনীর সঙ্গে।

ইতিহাসই বুঝি বারে বারে সুযোগ এনে দিয়েছে বণিক ইংরেজের কাছে। বাণিজ্য নয়, বাহুবল নয়, নয় কোনো রাজনীতির কৌশল।

সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যে ইংরেজের আধিপত্য এনেছে ইংরেজের চিকিৎসাশাস্ত্র, আওরঙ্গজেবের জেহাদ, আর হিন্দু ভূস্বামীদের গৃহবিদ্রোহ।

সম্রাট ফেরোকসায়েরের বিবাহ-উৎসবে নহবত বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হতে হলো তাঁকে। অস্ত্রোপচার করে সম্রাটকে বাঁচিয়ে তুললো ডাক্তার হ্যামিলটন।

খুশী হয়ে সম্রাট বললেন, কি চাও তুমি ইংরেজ বন্ধু, তোমার প্রার্থনাই আমার মঞ্জুরী।

হ্যামিলটন টুপি খুলে কুর্নিশ করে বললে, ইংরেজ কোম্পানীকে

বাণিজ্যশুল্ক থেকে রেহাই দিন সম্রাট, আর ডিহি কলিকাতার সংলগ্ন আটত্রিশটি নগর কেনবার অধিকার দিন।

সাজাহান-কন্যাকে সারিয়ে তুলে স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি পেয়েছিলো গ্যাব্রিয়েল বাউটন ; কেল্লা প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলেছিলো শোভা সিংহের বিদ্রোহের সুযোগে, ইব্রাহিম খাঁ আর আজিমুশ্বানের ব্যর্থতায় ; শক্তিবৃদ্ধি ঘটলো সম্রাট ফেরোকসায়েরের বাদশাহী উপঢৌকনে।

ভিন্নধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ আর অত্যাচার, নারীর প্রতি অসম্মান—দু'টি মাত্র অভিশাপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এলো।

মোগল নবাবের দল জানতো না, বাইরের ব্যভিচারের বিষাক্ত নিঃশ্বাস অন্দর-মহলে প্রবেশের পথ খুঁজে নেয়। জানতো না, ইতিহাসের গতিকে আওরঙ্গজেব যে পথে চালিত করে গেছেন সেই আত্মহত্যার পথ থেকে ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করতে হলে প্রয়োজন ছিলো ত্যাগের, মহত্বের, দৃঢ়তার।

দুর্বলচরিত্র বিলাসলুব্ধ সিরাজের শক্তি ছিলো না ইতিহাসের গতিকে ভিন্নপথে নিয়ে যাওয়ার। তাই অনাচারের প্লাবনগতিতেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

তারপরও বহু যুগ কেটে গেছে। নির্বিষ হয়েছে মোগল শক্তি, থেমে গেছে বর্গী দস্যুর নৃশংসতা। কালের কলঙ্ক থেকে সরে থাকতে পারেনি হিন্দু ভূস্বামীরা।

ধীরে ধীরে রাজ্যবিস্তার করেছে ইংরেজ। প্রজাপালনের পরিবর্তে শুরু হয়েছে প্রজাশাসন। শোষণের অভিশাপ নিয়ে এসেছে, নতুন করে বুনে দিয়েছে বিভেদের বীজ। কিন্তু জ্ঞানকে নিষেধের অন্ধকারে ঠেলে দেয়নি।

তাই সুদূর বন-বিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশেষেও একদিন ইতিহাস খুঁজে বের করতে এসেছে ইংরেজ প্রত্নতাত্বিক।

এসে থেমেছে লালবাঁধের পাড়ে।

১৮৯৬ সাল।

লালবাঁধ দীঘি খনন করে পাওয়া গেলো কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দু'শো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ-কাহিনী।

পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আজও বোধ হয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্ন-প্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন যবনকন্যার প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।
